আবদুস শহীদ নাসিম

আল কুরআন আত তাফসির

আল কুরআন আত তাফসির

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

আল কুরআন আত তাফসির
আবদুস শহীদ নাসিম

© author

ISBN: 978-984-645-054-5
শ. প্র: ৬২

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
চতুর্থ সংস্করণ : মে ২০০৯ ঈসায়ী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন : ০১৫৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭।

দাম : ১২০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Al-Quran At-Tafseer by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292.
1st Edition 1984 and 4th Edition May 2009.

Price : Tk. 120.00 only.

বিষয়	সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

ভূমিকা ৭

প্রথম অধ্যায় : আল কুরআন ৯

১. আল কুরআন : ঐহিক জ্ঞানসূত্র ১১
   ১. জ্ঞান সূত্র ও অহি ১১
   ২. ইসলামি কালচার ও বস্তুবাদী কালচারের ভিত্তি ১৪
   ৩. ঐহিক জ্ঞানের অনিবার্যতা ১৬
   ৪. দীনের পূর্ণতা এবং অহির সংরক্ষণ ১৭

২. অহি : সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও অহিয়ে মুহাম্মদ ১৯
   ১. অহির আভিধানিক ও পারিভার্ষিক অর্থ ১৯
   ২. অহির প্রকার ভেদ ১৯
   ৩. অহি নাযিলের পদ্ধতি ২১
   ৪. কুরআন মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি করা হয়েছে ২২
   ৫. মুহাম্মদ সা. কি অহি তথা নবুয়্যত লাভের আকাংখী ছিলেন? ২৩
   ৬. কুরআন সুন্নাহ হাদিস ২৫
   ৭. কুরআন এবং সুন্নাহই ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞানের মূলসূত্র ২৬
   ৮. কুরআনের অহি ও হাদিসের অহির মধ্যে পার্থক্য ২৭

৩. আল কুরআনের পরিচয় ২৯
   ১. আল কুরআনের আভিধানিক অর্থ ২৯
   ২. আল কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা ৩০
   ৩. আল কুরআন কাদের জন্যে এবং কী উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে? ৩১
   ৪. আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য ৩২
   ৫. আল কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ৩৬
   ৬. আল কুরআনের মর্যাদা ৩৬

৪. উম্মুল কিতাব থেকে নাযিল হয়েছে আল কুরআন ৩৮
   ১. উম্মুল কিতাব কী? ৩৮
   ২. কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হবার কারণ ৪০
   ৩. উম্মুল কিতাব থেকে পৃথিবীর আকাশে আল কুরআন ৪০
   ৪. কুরআন নাযিলের সূচনাকাল প্রসঙ্গে কুরআন ৪১
   ৫. কুরআন নাযিলের সেই মহাসম্মানিত রাত কোন্‌টি? ৪২
   ৬. কুরআন নাযিল হয় কোন্ সনে? ৪৩

৫. আল কুরআন নাযিলের শুভ সূচনা ৪৪
   ১. মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিলের পূর্ব ঘটনা ৪৪
   ২. নির্জনপ্রিয়তা ও ধ্যান ৪৪
   ৩. হেরা গুহায় ৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪. সত্য স্বপ্ন	৪৬
৫. পড়ো তোমার প্রভুর নামে	৪৭
৬. বুদ্ধিমতী খাদিজার অনন্য কৌশল	৫০
৭. কুরআন নাযিল : বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য ঘটনা	৫১
৬. আল কুরআন : প্রথম ও শেষ অহি কোন্‌টি?	৫৫
১. প্রথম অহি কোন্‌টি	৫৫
২. প্রথম অহির বক্তব্য কী?	৫৫
৩. সর্বশেষ অহি (আয়াত) কোন্‌টি?	৫৭
৭. আল কুরআনের হিফাযত ও সংরক্ষণ ব্যসস্থা	৫৯
১. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ	৫৯
২. কুরআন সংরক্ষণে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিখুঁত ব্যবস্থা	৫৯
৩. প্রথম পর্যায় : কুরআন নাযিলের যুগে কুরআন সংরক্ষণ	৬১
৪. দ্বিতীয় পর্যায় : আবু বকর রা.-এর সময় কুরআন সংকলন	৬৪
৫. তৃতীয় অধ্যায় : খলিফা উসমান কর্তৃক কপি করে সম্প্রচার	৬৮
৮. আল কুরআনের নাম	৭৩
৯. আল কুরআনের সূরা ও আয়াত	৮৮
১. মক্কী ও মাদানি সূরা	৮৮
২. মক্কী ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য	৮৯
৩. সূরা ও আয়াত : সংখ্যা, তালিকা, মক্কী মাদানি	৯০
১০. আল কুরআন : ঈমান ও ইত্তেবা	৯৫
১. ঈমান বিল কুরআন	৯৫
২. আল কুরআনের ইত্তেবা	৯৭
৩. কুরআনের প্রতি সামগ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য	৯৮
১১. কুরআন প্রসঙ্গে কিছু তথ্য	১০১
দ্বিতীয় অধ্যায় : তাফসিরুল কুরআন	১০৩
১. কুরআন অনুধাবনের অপরিহার্যতা ও তফসির	১০৪
১. অনুধাবন ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে	১০৪
২. অনুধাবন ছাড়া আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য করা যায়না	১০৫
৩. অনুধাবনের জন্যেই আল্লাহ রসূলের জাতির ভাষায় কিতাব পাঠান	১০৬
৪. কুরআন বুঝা এবং বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই তফসির	১০৭
২. রসূলুল্লাহ সা. নিজেই ছিলেন কুরআনের তফসির এবং মুফাস্‌সির	১০৮
১. রসূল সা. কুরআন পরিষ্কার করে উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন	১০৮
২. রসূল সা. ছিলেন কুরআনের তফসির ও মুফাস্‌সির	১১০
৩. রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে তফসির হস্তান্তরিত হয়ে আসছে	১১১
৩. তফসির কী?	১১৩
১. তফসির	১১৩
২. তফসির-এর আভিধানিক অর্থ	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

৩. তফসির-এর পারিভাষিক অর্থ ১১৪
৪. তা'বিল ১১৫
৫. তফসির ও তা'বিলের মধ্যে পার্থক্য ১১৫
৬. তফসির ও তা'বিলের মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নয় ১১৬
৭. তফসির-এর বিষয়বস্তু ১১৭
৮. তফসির শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১১৭
৯. তফসির শাস্ত্রের গুরুত্ব ১১৭
১০. তফসির-এর উপাদান ও আলোচ্য বিষয় ১১৮
১১. এতো তফসির-এর প্রয়োজন কী? ১১৯
১২. তফসির-এর ক্ষেত্রে ইখতেলাফ বা মতপার্থক্য ১২০
১৩. ব্যাখ্যার বিভিন্নতার কারণ এবং এর অবকাশ ১২০
১৪. ব্যাখ্যা গ্রহণে অগ্রাধিকার ১২২
৪. কুরআন তফসির-এর মূলনীতি ১২৪
১. কুরআন তফসির-এর ভিত্তি ও উৎস ১২৪
২. ভিত্তি সমূহের দলিল ও যুক্তি ১২৪
৫. কুরআন ব্যাখ্যার ভিত্তিসমূহের প্রয়োগ ১৩০
১. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়ে ১৩০
২. কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাহ বা হাদিস ১৩৪
৬. কুরআন তফসির-এর বাতিল ভিত্তি ১৩৭
১. ইসরায়িলি সূত্রের বর্ণনা ভিত্তিক তফসির ১৩৭
২. সুফিবাদ ভিত্তিক তফসির ১৩৮
৩. স্বাধীন বিবেক বুদ্ধি প্রসূত মনগড়া তফসির ১৩৮
৪. ভ্রান্ত মতবাদ ভিত্তিক তফসির ১৩৯
৭. মুফাসসির : তফসির করার যোগ্যতা ১৪০
১. মুফাসসির কে? ১৪০
২. বক্তা মুফাসসির ১৪০
৩. পূর্ণাঙ্গ মুফাসসির এবং আংশিক মুফাসসির ১৪১
৪. তফসির করার বা মুফাসসির হবার শর্ত ১৪১
৫. তফসির করার নৈতিক যোগ্যতা ১৪২
৬. তফসির করার ইলমি যোগ্যতা ১৪৩
৭. শর্ত ও যোগ্যতাসমূহের ভিত্তি ও গুরুত্ব ১৪৫
৮. কুরআন তফসির-এর জন্যে সব যোগ্যতাই কি জরুরি? ১৪৬
৮. কুরআন তফসির-এর পদ্ধতি ১৪৭
১. অনারবি ভাষায় তফসির করলে অনুবাদ করতে হবে ১৪৭
২. শানে নুযূল বা অবতীর্ণের পটভূমি উপস্থাপন ১৪৭
৩. ব্যাখ্যা উপস্থাপন ১৪৭
৪. উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি আহ্বান ১৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

৯. কুরআন তফসির-এ সমকালকে ধারণ	১৪৯
১০. একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ	১৫২
হুদা, সালাত, রহমত, যিক্‌র, রূহ, সূ, তিলাওয়াত	১৫২-১৬৪
১১. শানে নুযূল	১৬৫
১২. মুহকাম ও মুহতাশাবেহ আয়াত	১৬৮
১. মুহকাম আয়াত	১৬৮
২. মুতাশাবেহ আয়াত	১৬৯
৩. মুতাশাবেহ আয়াত কোন্‌গুলো	১৬৯
৪. কতিপয় মুতাশাবেহ আয়াত	১৭০
১৩. তফসির-এর প্রকারভেদ	১৭২
১. বিভিন্ন প্রকারের তফসির	১৭২
২. তাফসির বির রেওয়ায়াত	১৭২
৩. তাফসির বির রায়	১৭৪
৪. তাফসির বিদ্‌ দিরায়াত	১৭৫
৫. তাফসিরে ইশারি	১৭৭
৬. তাফসিরুল আহকাম	১৭৮
১৪. কুরআনের অনুবাদ	১৭৯
১. অনারবি ভাষায় কুরআন অনুবাদের গুরুত্ব	১৭৯
২. অনুবাদের প্রকারভেদ	১৭৯
৩. অনুবাদের শর্ত	১৮৪
৪. অনুবাদ কুরআন নয়	১৮৪
১৫. তফসির শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণী	১৮৫
১. সাহাবায়ে কিরাম	১৮৫
২. শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী মুফাসসিরগণ	১৮৬
৩. শ্রেষ্ঠ তাবে তাবেয়ী মুফাসসিরগণ	১৮৭
৪. তাফসিরুল কুরআনের ক্রমবিকাশ ধারা	১৮৮
৫. আধুনিককালে লেখা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ তফসির	১৮৯
৬. উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তফসির সংক্রান্ত মশহুর গ্রন্থাবলী	১৯০
৭. বাংলাদেশে আল কুরআনের চর্চা	১৯১
১৬. কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত	১৯২
১. কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের গুরুত্ব	১৯২
২. কুরআন তিলাওয়াত	১৯৩
৩. কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি	১৯৫
৪. তাজবিদ	১৯৯
১৭. সহায়ক গ্রন্থাবলী	২০০

❖❖❖

ভূমিকা চতুর্থ সংস্করণ উপলক্ষে লেখা ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে 'আল কুরআন আত তাফসির' বইটির শিরোনাম ছিলো 'আল কুরআন আত তাফসির আল মুফাসসির'। নামের কলেবর কমানোর জন্যে পরবর্তী সংস্করণে নামটি সংক্ষেপ করা হয়েছে। তবে গ্রন্থের বিষয়বস্তু ঠিকই আছে।

বইটি লেখা হলো কিভাবে?-এর একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৮৩ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন, এমন কয়েকজন আলেমকে নিয়ে একটি কুরআন স্টাডি ক্লাস পরিচালনা করার দায়িত্ব এসে পড়ে আমার উপর। প্রতিটি ক্লাসের জন্যে বিভিন্ন রেফারেন্স গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কিছুটা গবেষণামূলক নোট তৈরি করি। এভাবে বারটি ক্লাস পরিচালনা করা হয় এবং লেখাগুলো মাসিক পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়। তাতে লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশের প্রবল দাবি আসে। সে কারণেই ১৯৮৪ সালের শেষ দিকে লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করা হয়। অতপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মুদ্রণে বইটিতে কিছু কিছু সংযোজন করা হয়।

এবার চতুর্থ মুদ্রণে এসে বইটির নতুনভাবে সংস্করণ করা হলো। এ সংস্করণে বইটিতে ব্যাপক পরিবর্ধন করা হয়েছে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নতুন বিষয় ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছে। নতুনভাবে তথ্য সূত্র ও টীকা টিপ্পনি সংযোজন করা হয়েছে। আর শুচিতার জন্যে সূচি সাজানো হয়েছে নতুন করে।

মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা 'উলূমুল কুরআন' এবং 'উসূলুত তাফসির' পড়ে, বাংলা ভাষায় তাদের চাহিদা মেটানোর মতো গ্রন্থাবলীর স্বল্পতা রয়েছে। তাদের চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করা হয়েছে। আশা করা যায়, কুরআনিক সাইন্স-এর ছাত্ররা এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবে।

তাছাড়া গ্রন্থটিকে তথ্যবহুল করার ক্ষেত্রে পাঠক হিসেবে আরেকটি টারগেট গ্রুপ আমাদের চিন্তায় সক্রিয় ছিলো। তাঁরা হলেন কুরআনের প্রতি আগ্রহী আধুনিক শিক্ষিত সমাজ। আধুনিক

শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞান এবং কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কুরআন জানার জন্যে অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে আমরা যে প্রবল তৃষ্ণা এবং দুর্নিবার আকাংখা লক্ষ্য করেছি, অপরদিকে আমাদের ভাষায় তাদের চাহিদা মেটানোর মতো গ্রন্থাবলীর যে দারিদ্র লক্ষ্য করেছি, তা থেকে আমাদের মধ্যে একটা তাড়না সৃষ্টি হয়। এ গ্রন্থটি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার ক্ষেত্রে সে তাড়নাও প্রবলভাবে কাজ করেছে। আশা করি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কুরআনে প্রবেশের পাথেয় এ গ্রন্থে পেয়ে যাবেন এবং কুরআন ও কুরআনের তফসির সম্পর্কে একটি প্রশস্ত ধারণা লাভ করবেন।

আরেকটি কথা না বললেই নয়। সেটি হলো, বাংলা ভাষা ও বানানরীতির বিষয়। বাংলা ভাষার ছাত্র হিসেবে বাংলা ভাষার রীতিনীতিকে বিসর্জন দেয়াটা সঠিক মনে করি না। আরবি ভাষার যেমন একটি নিয়মরীতি আছে, তেমনি বাংলা ভাষারও আছে। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি যে কোনো বিদেশি ভাষার কোনো শব্দ যখন বাংলা ভাষা নিজের মধ্যে ধারণ করে নেয় এবং তা যখন বাংলা ভাষায় চালু ও প্রচলিত হয়ে যায়, তখন সেটি বাংলা শব্দ হিসেবেই স্বীকৃত হয় এবং সেটির উপর বাংলা ভাষার রীতিনীতির প্রভাব পড়বেই। প্রভাব না পড়লে ধীরে ধীরে তা বাংলা ভাষা থেকে পরিত্যাক্ত হবার আশংকাই থেকে যাবে। এ কারণে অনেকের মনোকষ্টের কারণ হলেও আমরা বাংলা বাক্যে আরবি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

বইটিকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে : 'আল কুরআন' অধ্যায় এবং 'তাফসিরুল কুরআন' অধ্যায়। দুটি অধ্যায়ই প্রধানত উপরোল্লিখিত দুই শ্রেণীর পাঠকের কথা চিন্তায় রেখে লেখা হয়েছে। তাঁরা উপকৃত হলেই আমরা উপকৃত হবো।

দয়াময় মহান আল্লাহ গ্রন্থটিকে কুরআনের আলো বিতরণে কবুল করুন এবং কুরআনকে আমাদের জন্যে সুপারিশকারী বানান।

আবদুস শহীদ নাসিম
ঢাকা ৩ মে ২০০৯ ঈসায়ী

প্রথম অধ্যায়

আল কুরআন

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ○

অর্থ: এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানব সমাজকে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার রাশি থেকে আলোর দিকে স্বপ্রশংসিত সর্বশক্তিমানের পথে। (আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ০১)

অনুচ্ছেদ ১

আল কুরআন : ঐহিক জ্ঞানসূত্র

১. জ্ঞানসূত্র ও অহি

জ্ঞান মানে-জানা। জ্ঞান হলো information বা collection of information। মানুষ জন্মসূত্রে বা প্রাকৃতিকভাবে তার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ এবং মেধাশক্তির সাহায্যে জ্ঞান আহরণ করে। মানুষ জ্ঞানার্জন করে ১. অভিজ্ঞতা ২. শিক্ষা ও ৩. চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে। মানুষ জ্ঞানার্জন করে সমাজ, পরিবেশ, বিশ্ব ও মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থেকে। জ্ঞানের কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন: ক. সন্দেহ, খ. ধারণা-অনুমান, গ. নিশ্চিত জ্ঞান।

নিশ্চিত জ্ঞান যে কোনো মাধ্যমেই অর্জিত হোক, তাতে কোনো প্রকার বিরোধ থাকেনা, থাকে ঐক্য এবং একমুখিতা। নিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হবার উপায় :

১. যুক্তি (reason, cause)।

২. প্রমাণ (evidence, sign, proof)।

৩. বিবেক-বুদ্ধি (judgement, intellcet)।

৪. নিশ্চিন্ত বিশ্বাস (faith, belief with certainty)।

এর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে ভুলও হতে পারে, নির্ভুলও হতে পারে। কিন্তু সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব।

নিরীক্ষার এই চারটি উপকরণ প্রয়োগ করে সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞানে পৌছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও আছে। প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো :

১. অনুরাগ > আবেগ > সীমালংঘন।

২. বিরাগ > অনীহা > সীমালংঘন।

৩. শয়তান > অস্‌অসা > অনুরাগ/বিরাগ > আবেগ/অনীহা > সীমালংঘন।

অনুরাগ, বিরাগ এবং অস্‌অসা থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তি, প্রমাণ, বিবেক-বুদ্ধি ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিবেচনা করার মাধ্যমে মানুষ সত্যজ্ঞানে উপনীত হতে পারে।

অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে এই চারটি উপকরণ দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তখনই সিদ্ধান্ত সঠিক বা নির্ভুল হওয়া সম্ভব। তবে সকল ক্ষেত্রে সবগুলো উপকরণ একত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কখনো কখনো একটি দুটি উপকরণ দিয়ে বিচার করেই সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব। কিন্তু সত্যে উপনীত হবার জন্যে এই সবগুলো উপকরণ অথবা কোনো কোনোটির সাহায্য আপনাকে নিতেই হবে।

এভাবে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর সেটাকে সঠিক, নির্ভুল ও প্রমাণিত ধরে নিতে হবে। অতপর সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আচরণ করতে হবে এবং সিদ্ধান্তের বিপরীত আচরণ করা নিষিদ্ধ মনে করতে হবে।

যেমন কষ্টি পাথর। নিরীক্ষার উপকরণসমূহ দ্বারা যাচাই করার পর আপনি কোনো পাথরকে যদি কষ্টি পাথর হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে অবশ্যি তার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ সোনাকেই খাঁটি সোনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, এর বিপরীত কোনো সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ।

যেমন ড্রাগ। ডাক্তার যদি প্যারাসিটামলকে ব্যথানাশক ঔষধ বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন, তবে তাকে রোগীর ব্যথা নিরাময়ের জন্যেই এ ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, ডাইরিয়া নিরাময়ের জন্যে নয়।

যেমন, আপনার পিতা কে? সে বিষয়ে আপনার কাছে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রমাণ নেই। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, যুক্তি এবং বিবেক-বুদ্ধিই আপনার সত্যে উপনীত হবার নির্ভুল মানদন্ড। অতপর আপনার পিতার সাথে অপিতা সুলভ আচরণ করা আপনার জন্যে নিষিদ্ধ।

এসব উপকরণ দিয়ে বিচার করেই আমরা ইবরাহিম, মূসা, যীশু, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতমবুদ্ধ ও মুহাম্মদের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এগুলোর ভিত্তিতেই আমরা আমেরিকায় আব্রাহাম লিংকনের শাসন, ভারতবর্ষে বাবরের রাজত্ব, বাংলায় শায়েস্তা খানের শাসন ছিলো বলে মেনে নিই। এসব মানদণ্ডের ভিত্তিতেই সাধারণ চোখে না দেখেও আমরা পরমাণু, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব স্বীকার করি। মানদণ্ডে উত্তীর্ণ এই সত্য বিষয়গুলো যদি আমরা মেনে না নিই তাহলে মানব সমাজের শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রুদ্ধ হয়ে যাবে জ্ঞান এবং সত্য-ন্যায় চর্চা ও উন্নতির দুয়ার।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানব মনে অনেক অনেক অপ্রতিরোধ্য প্রশ্নের জবাব মানুষ কোথায় পাবে? মানুষের নিজের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম প্রতিটি বস্তু ও জীবের সৃষ্টির সীমাহীন কৌশল সম্পর্কে মানুষের কৌতুহলের জবাব সে কোথায় পাবে? মানুষ তার মৃত্যু পরবর্তীকাল সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্নের জবাব কোথায় পাবে? মানুষ তার জীবন যাপন ও সমাজ পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ভুল শাশ্বত বিধান কোথায় পাবে? মানুষ তার ব্যাপারে তার স্রষ্টার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা জানবে কিভাবে? এসব বিষয়ে তো মানুষ মানুষের ধারণা কল্পনা আর চিন্তা গবেষণার অনিশ্চিত অলি গলিতে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে পারেনা। এসব বিষয়ে অবশ্যি মানুষের জন্যে প্রয়োজন নিশ্চিত জ্ঞান যা তাকে নিশ্চিন্ত করবে।

সকল নবী রসূলই নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্তির দাবি করেছেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের সমাজের সবচে' বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা সকলেই উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে একই তথ্য দিয়েছেন। একই পথের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা সবাই বলেছেন, 'মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁদের কাছে অহি (বার্তা) পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা শুধু তাঁর নির্দেশিত বার্তার (অহির) ভিত্তিতে মানুষকে মুক্তির ও সাফল্যের পথে চলার আহ্বান জানাচ্ছেন।'

তারা সবাই বলেছেন : আল্লাহ (ঈশ্বর, God) এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক ও প্রতিপালক। সবকিছু সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর অনুগত দাস।

তিনি মানুষকে মেধা, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করার জন্যে। তাঁর দাসত্বের জীবন যাপন করার জন্যে।

তাঁরা জানিয়েছেন, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। মানুষ পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করেছে কী-না, সেখানে প্রথমে সেই বিচার অনুষ্ঠিত হবে। বিচারের জন্যে মানুষের কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। বিচার করে মানুষকে হয় পুরস্কৃত করা হবে, নয়তো শাস্তি প্রদান করা হবে। পরকালের সেই জীবন হবে চিরন্তন।

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি মানুষের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত এবং রসূলগণের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করলেই মানুষ সফল হবে।

সকল নবী রসূল এই একই তথ্য প্রদান করেছেন। সত্যে উপনীত হবার চারটি মানদণ্ডে বিচার করলে মানুষ অবশ্যি নবীগণের প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ মহাসত্য হিসেবে দেখতে পাবে। এর বিপরীত সবই অসম্ভব, অনুমান এবং সংশয়।

নবীগণ যে পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন, সে পদ্ধতির নামই 'অহি'।

আধুনিককালের বিভিন্ন আবিষ্কার নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ অহি উপলব্ধির বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছে। যেমন : magnetic communication, tele communication, wireless communication. এ ছাড়াও mobile message, e-mail message, web site ইত্যাদি অহি উপলব্ধির বিষয়কে সহজ করে দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য, অহির সত্যতা ও অকাট্যতা সম্পর্কে সকল যুগের সুস্থ মেধা ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী সত্যনিষ্ঠ মানুষেরা একমত হয়েছেন। অহি জ্ঞান ও তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের

সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নির্ভুল, নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞানসূত্র। অহির প্রতি বিশ্বাস নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাস।

অহি যখন সত্য ও শাশ্বত জ্ঞান সূত্র হিসেবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন অহিই হতে হবে সমস্ত ধরনের জ্ঞান ও জ্ঞান সূত্রের সত্যাসত্য নির্ণয়ের নির্দেশক মানদণ্ড। অহির জ্ঞানকে যুক্তি, বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা গবেষণালব্ধ ধারণা দ্বারা যাচাই করা যাবেনা। কারণ, মানুষের সীমাবদ্ধ যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা অহির জ্ঞানের সবকিছুই উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে 'নিশ্চিন্ত বিশ্বাস' নামক জ্ঞান সূত্রটির উপর নির্ভর করতে হবে। এটাই সত্যে উপনীত হবার অনিবার্য (ultimate) পথ।

কেউ কেউ জানতে চান, ঐহিক সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান যদি কোনো প্রমাণিত সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সে ক্ষেত্রে কী করা হবে? এর জবাব একটাই। তাহলো, ঐহিক সূত্রের জ্ঞান কখনো প্রমাণিত সত্যের বিপরীত হতে পারেনা, কখনো হয়নি এবং হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। কারণ সত্য একটাই। সত্য কখনো সত্যের বিপরীত হয়না। সত্যের সাথে সত্যের কখনো সংঘর্ষ হয়না, হয় সত্যের সাথে অসত্যের। বাস্তবের সাথে অবাস্তবের, সংগতের সাথে অসংগতের। সুতরাং অহি প্রমাণিত সত্যের সাথে নয়, অপ্রমাণিত জ্ঞান বা অনুমানের সাথেই সাংঘর্ষিক হতে পারে।

এখন এ বিষয়টি অনিবার্য হলো যে, সকল জ্ঞান, তথ্য ও জ্ঞান যাচাইয়ের উপকরণসমূহের নির্ভরযোগ্যতা অবশ্যি সর্বজ্ঞানী প্রদত্ত অহির জ্ঞানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই সেটি খাঁটি ও নিখাঁদ বলে প্রমাণিত হবে।

যেমন সাধারণ কষ্টিপাথর। কোনো পাথরকে কষ্টি পাথর হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে সত্য যাচাইয়ের চারটি উপকরণ প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে কোনো পাথর কষ্টি পাথর হিসেবে প্রমাণিত হবার পর সেটিকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে সে পাথর দিয়েই সোনার খাঁটিত্ব যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্য কোনো বিবেচনা প্রযোজ্য নয়।

যেমন রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের কেমিক্যাল। এই কেমিক্যাল তৈরি ও নির্ণয়ের জন্যে অবশ্যি মানদণ্ডসমূহ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মানদন্ড হবে এ কেমিক্যাল, কেমিক্যালটি তৈরির মানদণ্ডসমূহ নয়।

২. ইসলামি কালচার ও বস্তুবাদী কালচারের ভিত্তি

ইসলামি কালচার এবং বস্তুবাদী কালচার প্রসঙ্গে আধুনিক কালের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ প্রফেসর আনিস আহমদ বলেন :

"বস্তুবাদী অনৈসলামি সমাজের আইন, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও কর্মপ্রক্রিয়া গড়ে উঠে আঞ্চলিক ও গোত্রীয় প্রথা প্রচলন, ঐতিহ্য ও রেওয়াজের ভিত্তিতে। অপরদিকে ইসলামি সমাজের সামগ্রিক ব্যবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভংগি, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রথা-প্রচলন ও রেওয়াজসমূহ গড়ে উঠে ঐহিক নির্দেশনার ভিত্তিতে।

চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন :

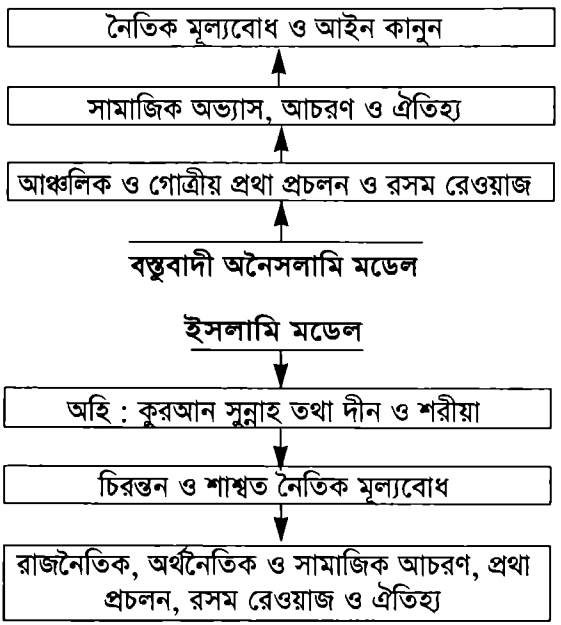

মূলত ইসলামি সমাজের সামগ্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে আদর্শ তথা ঐহিক জ্ঞানের উপর। অপরদিকে বস্তুবাদী অনৈসলামি সমাজের ভিত রচিত হয় জনগণের অভ্যাস ও ইচ্ছা আকাংখার ঐতিহ্যের উপর।"[১]

ইসলামি কালচারের ভিত্তি ঐহিক সূত্রের জ্ঞান। আর এ জ্ঞানের মূল কথা হলো :

১. মহাবিশ্বের স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং

২. সেই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ মাফিক কর্ম সম্পাদন।

ইসলামি কালচার বলে, বিশ্বের সকল জ্ঞান ও জ্ঞান সূত্রকে যাচাই করতে হবে অহির মানদণ্ডে বা অহির ভিত্তিতে। তবেই খাঁটি ও নিখাঁদ জ্ঞান ও জ্ঞানসূত্র লাভ করা সম্ভব। এ যাচাই বাছাইয়ের রেজাল্ট হবে তিন প্রকার :

১. প্রফেসর ড. আনিস আহমদ : 'ইসলামি ফিক্‌র ও সাকাফাত কী কুরআনি বুনির্দে : অহি' মাসিক তরজমানুল কুরআন, ভলিউম ১৩৬, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

১. অহি দ্বারা সমর্থিত,
২. অহির সাথে সাংঘর্ষিক নয়,
৩. অহির সাথে সাংঘর্ষিক।

এ ক্ষেত্রে অহির নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম দুটি গ্রহণযোগ্য। শেষোক্তটি বর্জনীয়। এটাই অহির জ্ঞানের বিশালতা। এতে রয়েছে সকল সত্য, প্রমাণিত ও নিশ্চিত নির্ভুল জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা। এটিই হলো ইসলামের পথ। এর প্রতিপক্ষে রয়েছে বস্তুবাদী কালচার। এ কালচারের ভিত্তি হলো :

১. ঐহিক জ্ঞানসূত্র বর্জিত অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান।
২. ব্যক্তি স্বার্থ এবং সমগোত্রীয় সামষ্টিক স্বার্থ।
৩. ভোগবাদ।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি হলো এই তিন বৈশিষ্ট্যধারী বস্তুবাদী সভ্যতা। তাদের কাছে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সাথে বা এর কোনোটির সাথে যা কিছুই সাংঘর্ষিক হবে, তা অবশ্যি বর্জনীয় এবং স্বয়ং ইশ্বরও যদি এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হন, তবে তিনিও বর্জনীয়। এরূপ প্রসংগেই মহান আল্লাহ বলেন :

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ
الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ○ وَالَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

অর্থ: যারা পৃথিবীতে অহংকার ও দাম্ভিকতায় নিমজ্জিত হবে, আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। (ফলে) তারা আমার প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবেনা। তারা সঠিক পথ দেখলেও সেটিকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এর কারণ, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং সে ব্যাপারে অচেতন। আর যারা আমার আয়াত এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে, তাদের সমস্ত কর্মই নিষ্ফল। তাদের কর্ম অনুসারেই তাদের প্রতিফল দেয়া হবে।[২]

৩. ঐহিক জ্ঞানের অনিবার্যতা

আমরা আলোচনা করে এসেছি, সাধারণত মানুষ জ্ঞান আহরণ করে থাকে তিনটি মাধ্যমে। অর্থাৎ ১. অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ২. শিক্ষার মাধ্যমে ৩. মেধাশক্তি বা চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে। জ্ঞানের এই তিনটি সূত্রের কমপক্ষে দুটি বড় বড় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেগুলো হলো :

---

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৪৬-১৪৭

প্রথমত: এ সূত্রগুলোর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে নিশ্চিত কল্যাণের কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে ঐ জ্ঞান সব সময় নিশ্চিত নির্দেশনা প্রদান করতে পারেনা। অর্থাৎ ঐ জ্ঞান সর্বোত্তম কল্যাণকর ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে কোনো সর্বজ্ঞানীর নির্দেশনা থাকেনা। ফলে জ্ঞানের সত্যতা ও সঠিকত্ব এবং তা সর্বাংগীন কল্যাণকর খাতে প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ণয়ের বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকতে বাধ্য এবং তার ফল মঙ্গলজনক হওয়াটাও অনিশ্চিত। যেমন অর্থশাস্ত্র। মানুষ এ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছে। অর্থ কব্জা করা এবং তা ব্যয়-ভোগ করার জ্ঞানে মানুষ বিরাট পারদর্শিতা অর্জন করেছে। কিন্তু গোটা মানব সমাজের সর্বাংগীন মঙ্গলের বিষয়কে সামনে রেখে অর্থ উপার্জন এবং তা ব্যয় বণ্টন ও ভোগের ন্যায়সংগত ও সুষম (just and balanced) উপায় সম্পর্কে মানুষের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান নেই। নারী পুরুষের সম্পর্ক, সমাজ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রসহ অন্যান্য সকল বিষয়ের ব্যাপারেও এই একই কথা।

দ্বিতীয়ত: মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জ্ঞানার্জনের যে মাধ্যমগুলো লাভ করেছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রশস্ত হলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই সীমাবদ্ধ। ফলে অনেক বিষয়ে সে নিশ্চিত ও প্রমাণিত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারলেও আবার অনেক বিষয়েই সে ধারণা ও অনুমানকে অতিক্রম করতে পারে না এবং পারাটা সম্ভবও নয়। যেমন, মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্ব, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের ব্যাপারে স্রষ্টার ইচ্ছা অনিচ্ছা, জীবন মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অস্তিত্ব বা পুনরুত্থান, মানুষের ভালো মন্দ কর্মের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের জন্যে বিচার অনুষ্ঠান, পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কার, মানুষের নিশ্চিত কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ কোনো অবস্থাতেই তার জন্মগত জ্ঞানার্জন মাধ্যমসমূহ দ্বারা নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

এই দুইটি প্রধান কারণে মানুষের জন্যে জ্ঞানার্জনের আরেকটি সূত্র অনিবার্য হয়ে পড়ে। মানুষের পরম দয়াময় স্রষ্টা মহান আল্লাহ মানুষকে নবীগণের মাধ্যমে সেই জ্ঞান সূত্রটিও দান করেছেন। আর সেই জ্ঞান সূত্রটির নামই 'অহি'।

৪. দীনের পূর্ণতা এবং অহির সংরক্ষণ

অহি স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির নিকট বার্তা প্রেরণের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। অপরদিকে সেই প্রেরিত বার্তাকেও অহি বলা হয়। অর্থাৎ বার্তা প্রেরণের প্রক্রিয়া এবং বার্তা দুটোই অহি। অহির বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। সেগুলো পরে আলোচনায় আসবে।

মানুষের সঠিক, সুন্দর ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকর জীবন যাপন করার জন্যে মহান আল্লাহ উপদেশ ও নির্দেশনামূলক যে জ্ঞান (guidance) পাঠান, পারিভাষিক দিক থেকে সেটাকেই বলা হয় 'অহি'।

এ ধরণের অহি পাঠানোর জন্যে মহান আল্লাহ সকল যুগ ও সমাজ থেকেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের কাছে অহি প্রেরণ করেছেন। এঁরাই হলেন নবী ও রসূল। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অনেক নবী রসূল মনোনীত করেছেন। প্রথম নবী ছিলেন প্রথম মানুষ আদম এবং শেষ নবী ছিলেন মুহাম্মদ। মাঝখানে ছিলেন বিভিন্ন কালে অসংখ্য নবী ও রসূল (আলাইহিমুস সালাম)।

নবীদের কাছেই মহান আল্লাহ সাধারণভাবে বার্তা পাঠিয়েছেন। তবে কিছু কিছু নবীর কাছে তিনি সাধারণ বার্তাও পাঠিয়েছেন এবং সেই সাথে কিতাবও পাঠিয়েছেন। যেসব নবীর কাছে কিতাবও পাঠিয়েছেন তাঁদের বলা হয় রসূল।

মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী ও রসূল। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করে দিয়েছেন এবং সে কারণে :

১. তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব 'আল কুরআন'কে সুরক্ষিত করেছেন।
২. আল কুরআনের ভাষাকে জীবন্ত ও গতিশীল করে রেখেছেন।
৩. কুরআন ছাড়া তাঁর প্রতি আরো যেসব বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোও তাঁর সুন্নাহ আকারে হাদিস গ্রন্থাবলিতে সুসংরক্ষিত করা হয়েছে।
৪. তাঁকে বিশেষ কোনো গোত্র বা অঞ্চল নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির রসূল মনোনীত করা হয়েছে।
৫. তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআনে শাশ্বত এবং সর্বকালের মানুষের উপযোগী 'জীবন বিধান' প্রদান করা হয়েছে।

অতএব, শেষ নবীর মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবী রসূল আগমনের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা প্রদান করেছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণতা দান করেছি তোমাদের দীনকে এবং সম্পূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (অহি) এবং তোমাদের জন্যে দীন মনোনীত করেছি ইসলামকে।[৩]

ফলে মানব জীবনকে সত্য, শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথে পরিচালিত করার জন্যে মানুষের স্রষ্টা মহাবিশ্বের মালিক ও পরিচালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মহাসত্য ঐহিক জ্ঞান (আল কুরআন) সুসংরক্ষিত হয়ে আছে এবং পৃথিবীতে যতোদিন মানুষর বসবাস থাকবে ততোদিন তা সুরক্ষিত থাকবে।

❖❖❖

৩. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াতাংশ ৩।

অনুচ্ছেদ ২

অহি : সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও অহিয়ে মুহাম্মদ

১. অহির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

অহির আভিধানিক অর্থ হলো: গোপন, সূক্ষ্ম ও তড়িৎ ইংগিত। গোপন ইংগিত ও তড়িৎ ইংগিত। গোপনে কোনো কথা বলা বা বাণী পাঠানো। সূক্ষ্মভাবে মনের মধ্যে কোনো কথা তড়িৎ নিক্ষেপ করা। সূক্ষ্ম, গোপন ও তড়িৎ বেগে ইংগিত করা, যা কেবল ইশারাকারি ও যার প্রতি ইশারা করা হয় তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ অনুভব করে না। অহি শব্দটি 'ইলকা' (মনের মধ্যে কথা নিক্ষেপ করা) এবং 'ইলহাম' (গোপন শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদান) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কুরআন মজিদে অহি, ইলকা এবং ইলহাম শব্দগুলো একই (আভিধানিক) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

পারিভাষিক অর্থে "অহি জ্ঞান লাভের এমন একটি মাধ্যম বা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দেশাবলী তাঁর মনোনীত বান্দা বা নবী রসূলদের প্রতি প্রেরন করেন এবং তাঁরা তা মানব সমাজের কাছে পৌঁছে দেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ত্রুটিমুক্ত পবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা। কেবল আম্বিয়ায়ে কিরামই এটা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।"[২]

মূলত অহি মহান আল্লাহর সেই হিদায়াতকে বুঝানো হয়, যা তিনি পথনির্দেশিকা হিসেবে তাঁর কোনো বান্দার অন্তরে গোপন ও সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তড়িৎ নিক্ষেপ করে থাকেন। অহির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং সহীহ বুখারির ব্যাখ্যাতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি লিখেছেন, অহি হলো :

كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ .

"আল্লাহ তায়ালার সেই বাণী, যা তাঁর কোনো নবীর প্রতি নাযিল করা হয়।"[৩]

২. অহির প্রকার ভেদ

মৌলিক দিক থেকে অহি তিন প্রকার।[৪] যেমন :

১. প্রাকৃতিক অহি (وَحِيْ طَبْعِى)।
২. আংশিক অহি (وَحِيْ جُزْءِى)।
৩. নবীগণের প্রতি প্রেরিত অহি (وَحِيْ الْاَنْبِيَاءْ)।

অহির এই প্রকারভেদগুলো কুরআনেই উল্লেখ রয়েছে।

---

১. আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড, ইদারায়ে তরজমানুল কুরআন, লাহোর।
২. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, প্রথম অধ্যায়।
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি : উমাদাতুল কারী, ১ম খণ্ড।
৪. আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড।

প্রাকৃতিক অহি (وَحِىْ طَبْعِى) :

এ অহির মাধ্যমে সকল সৃষ্ট জীবকে তাদের 'জীবন যাপন পদ্ধতি' শিখিয়ে দেয়া হয়। এ অহি সকল সৃষ্ট জীব এবং জড় পদার্থের উপর অবতীর্ণ হয়। কুরআনে প্রাকৃতিক অহির একাধিক উল্লেখ রয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রতি অহি করেন। মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মাফিক চলে এবং আল্লাহ পাক যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেন সেভাবে কার্য সম্পাদন করে। আসমান-যমিন সবকিছুর প্রতিই মহান আল্লাহ অহি করেন। তিনি বলেন :

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا .

অর্থ: অতপর তিনি সপ্ত আকাশে সেগুলোর সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন দুই দিনে (দুটি কালে) এবং প্রত্যেক আকাশে সেটির দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অহি করেন।[৫]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ○ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ○

অর্থ: সেদিন সে (পৃথিবী) বলে দেবে তার (বুকে সংঘটিত) সমস্ত খবর। কারণ, তোমার প্রভু তাকে অহি করবেন।[৬]

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক, তিনি জীব জন্তুকেও তাদের জীবন যাপন পদ্ধতির বিষয়ে অহির মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মধুমাছির প্রতিও অহি করেন :

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○

অর্থ: এবং অহি করেছেন তোমার প্রভু মধুমাছির প্রতি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, বাসা (মৌচাক) বানাও পাহাড়ে পাহাড়ে, গাছে গাছে এবং উঁচু জিনিসে।[৭]

আংশিক অহি (وَحِىْ جُزْءِى) :

এ অহি সাধারণত সব মানুষের প্রতিই অবতীর্ণ হয়। যে কোনো মানুষ এ অহি লাভ করতে পারে। এটি মূলত আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও উদঘাটনের অহি। এ অহির দৃষ্টান্ত হলো মূসার মায়ের প্রতি অহি। কুরআন বলছে :

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ .

অর্থ: এবং আমরা অহি করেছি মূসার আম্মার কাছে (এই নির্দেশ দিয়ে) যে : তাকে (মূসাকে) দুধ পান করাতে থাকো। তবে যখনই তার জীবনের আশংকা অনুভব করবে, তখন তাকে ইলকা (নিক্ষেপ) করবে নদীতে।[৮]

---

৫. আল কুরআন, সূরা ৪১ হামিম আস সাজদা : আয়াত ১২

৬. আল কুরআন, সূরা ৯৯ যিলযাল : আয়াত ৪-৫।

৭. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৬৮।

৮. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ০৭

নবীগণের প্রতি প্রেরিত অহি (وَحِىْ الْاَنْبِيَاءُ) :

এ অহি শুধুমাত্র নবী রসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়। পারিভাষিক অর্থে এ অহিকেই মূলত অহি বলা হয়। নবীগণের প্রতি প্রেরিত অহি তিন প্রকার। যেমন :

১. হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত অহি,

২. অন্তরাল থেকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ অহি এবং

৩. ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত অহি।[৯]

সকল নবী রসূল এবং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অহি অবতীর্ণ হয়েছে এ পদ্ধতিতেই। এ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাকের ঘোষণা হলো:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَآءُ ط اِنَّهٗ عَلِىٌّ حَكِيْمٌ ○ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ○

অর্থ: কোনো মানুষকে এ মর্যাদা দেয়া হয়নি যে, আল্লাহ (সরাসরি) তার সাথে কালাম করবেন। তবে (তিনি মানুষের সাথে কালাম করে থাকেন) অহির (গোপন ইংগিত-এর) মাধ্যমে, অথবা হিজাবের পেছন থেকে, নতুবা (তাঁর কালাম পৌঁছে দেয়ার জন্যে) তিনি পাঠিয়ে দেন একজন রসূল। সে এসে অহি করে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান। তিনি অতি উচ্চ এবং মহাজ্ঞানী। এ পদ্ধতিতেই (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রতি আমরা অহি করেছি আমাদের নির্দেশের একটি রূহ।[১০]

কুরআন থেকেই পরিষ্কার হলো নবীগণের প্রতি অহির তিনটি পদ্ধতি।

৩. অহি নাযিলের পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অহির মাধ্যমে আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল কুরআন ছাড়াও তাঁর কাছে অন্য অহি আসতো। তবে সে সব অহি ছিলো ইশারা ইংগিত এবং ভাব ও বক্তব্য বিষয়। কিন্তু আল কুরআন হলো সেই অহি, যা আগা গোড়া অক্ষরে অক্ষরে হুবহু আল্লাহর বাণী। কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য দু'টিই আল্লাহর। কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অহি আল কুরআন? নবীদের কাছে নিজের বক্তব্য ও বাণী পৌঁছাবার পদ্ধতি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। তাতে তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ হয়েছে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি তাঁর ফয়জুল বারি গ্রন্থে এই তিন প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

নবী রসূলগণের কাছে অহি আসার মৌলিক পদ্ধতি ঐ তিনটিই। মুহাম্মদ সা.-এর কাছেও এই তিন পদ্ধতিতেই অহি আসতো। তবে হাদিসে এই তিন প্রকারের বাস্তব রূপ চিত্রিত হয়েছে এভাবে :

---

৯. আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি : ফয়জুল বারি, ১ম খণ্ড।

১০. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশ্‌শূরা : আয়াত ৫১-৫২।

১. সত্য স্বপ্ন। নবুয়্যতের সূচনাকালে এ পন্থাই অনুসৃত হয়েছিল। তখন তিনি যা কিছুই স্বপ্নে দেখতেন, তা দিবালোকের মতোই সত্য হয়ে দেখা দিতো।

২. প্রেরণা, অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা.-এর অন্তরে কোনো কথা বদ্ধমূল করে দেয়া হতো।

৩. ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে তাঁর কাছে এসে বাণী পৌঁছে দিতো। তাঁর অন্তরে বাণী পুরোপুরি গেঁথে যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা তাঁর সাথে কথা বলতে থাকতো। রসূল সা. বলেন, অহির এ পদ্ধতি আমার জন্য সবচে' সহজ ও হাল্কা।

৪. তাঁর কানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো বাজতে থাকতো। সাথে সাথেই ভেসে আসতো ফেরেশতার আওয়ায। প্রিয় নবী সা. বলেন, অহি অবতীর্ণের এ পদ্ধতি খুবই ভারি ও কষ্টসাধ্য। এ পদ্ধতিতে যখনই অহি আসতে থাকতো, তিনি ঘেমে যেতেন। সোয়ারির উপর বসা থাকলে সোয়ারি মাটিতে চেপে বসে পড়তো। কারো উরুতে শুইয়ে পড়লে তার উরু গুড়ো হয়ে যাবার উপক্রম হতো।

৫. তিনি ফেরেশতা (জিবরিল)কে তার আসল আকৃতিতেই দেখতে পেতেন। এভাবে ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতো। এ পন্থায় তিনি দু'বার অহি লাভ করেছেন।

৬. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই অন্তরাল থেকে তাঁর সাথে কথা বলতেন। এ পন্থায় তিনি মি'রাজে গিয়ে অহি লাভ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হবার অহিও এ পন্থায়ই লাভ করেন। মূসা আলাইহিস সালামের সাথেও আল্লাহ পাক এ পন্থায় কথা বলেছেন।[১১]

কেউ কেউ মনে করেন রসূল সা. (মেরাজে) আল্লাহকে দেখেছিলেন। তাদের মতে সরাসরি অন্তরালবিহীন অবস্থায় তাঁর সাথে আল্লাহর কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু এ ধারনা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

৪. কুরআন মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি করা হয়েছে

কুরআন মুহাম্মদ সা.-এর রচিত গ্রন্থও নয়, তাঁর মনগড়া বাণীও নয়। আল কুরআন তাঁর প্রতি অহি করা হয়েছে। সেই অহিই তিনি প্রচার করেছেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ○

অর্থ: মুহাম্মদ নিজের মনগড়া কথা বলে না। সে যা বলে, তা তার প্রতি নাযিলকৃত অহি।[১২]

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤءِ نَفْسِىْ .

অর্থ: বলো (হে মুহাম্মদ) : আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনো প্রকার রদবদলের অধিকার আমার নেই। আমিতো কেবলমাত্র সে অহিরই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি প্রেরণ করা হয়।[১৩]

---

১১. ইবনুল কায়্যিম : যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড।

১২. আল কুরআন, সূরা ৫৩ আল নাজম : আয়াত ৩-৪।

১৩. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ১৫।

আল কুরআন তাঁর প্রতি অহি করা হয়েছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা কুরআনের মর্যাদা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত অহির মর্যাদা :

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ قف وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ.

অর্থ: বলো (হে মুহাম্মদ!): কোন্ জিনিস সাক্ষ্যতে সবচেয়ে বড়? বলো: আল্লাহই (সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য) আমার এবং তোমাদের মধ্যে এ কুরআন অহির মাধ্যমে আমার নিকট পাঠানো হয়েছে, যাতে তোমাদেরকে আর যাদের নিকট এটা পৌঁছে, তাদেরকে আমি সতর্ক করে দিতে পারি।[১৪]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ .

অর্থ: এ কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি অহি করে অতি উত্তম ও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপারসমূহ তোমার নিকট বর্ণনা করছি।[১৫]

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ○

অর্থ: অকাট্য সত্যসহ আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং তুমি শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করে যাও তোমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তার জন্যে নির্দিষ্ট করে।[১৬]

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ .

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি মানব সমাজের জন্যে সত্যসহ তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে এর থেকে হিদায়াত গ্রহণ করবে, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ হবে।[১৭]

এ আয়াতগুলো থেকে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, কুরআন মুহাম্মদ সা.-এর রচিত বাণী নয়, অন্য কারো শিখিয়ে দেয়া কথাও নয়। বরং আল কুরআন মহান আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অহি করেছেন, নাযিল করেছেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহির মাধ্যমে নাযিল হবার বিষয়টি মহাসত্য। এতে সামান্যতম রদবদল করার অধিকারও মুহাম্মদ সা.-এর ছিলো না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার বিষয়ে আল্লাহ নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী।

৫. মুহাম্মদ সা. কি অহি তথা নবুয়্যত লাভের আকাংখী ছিলেন?

অহি বা কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে মুহাম্মদ সা. নবুয়্যত লাভ করেন। কিন্তু তিনি কি পূর্ব থেকেই নবুয়্যত লাভের আকাংখা করতেন? এ প্রশ্নের সহজ ও সুস্পষ্ট জবাব হলো 'না'। না, কখনো নয়। বিশ্বজগতের মালিক পরম দয়াময় আল্লাহ

---

১৪. আল কুরআন, সূরা ০৬ আল আনআম : আয়াত ১৯।
১৫. আল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ০৩।
১৬. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ০২।
১৭. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১।

তায়ালাই তাঁকে নবুয়্যত দান করেন। তাঁকে মনোনীত ও নিযুক্ত করেন নিজের আখেরি রসূল খা-তামুন নাবীয়্যীন।

১. আল্লাহ তায়ালা যে তাঁকে নবী নিযুক্ত করবেন, এ ব্যাপারে মুহাম্মদ সা. কিছুই জানতেন না। এমনকি ঈমান, কিতাব, অহি এসব সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাও ছিলো না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই বলেন :

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَالْكِتٰبُ وَلَاالْاِيْمَانُ.

অর্থ: এমনি করে আমরা তোমার প্রতি অহি করেছি আমাদের নির্দেশের একটি রূহ। হে মুহাম্মদ! তুমি তো কিছুই জানতে না কিতাব কী? ঈমান কী? [১৮]

২. প্রথম যেদিন ফেরেশতা তাঁর কাছে অহি নিয়ে আসেন, সেদিন হেরা গুহায় তিনি ফেরেশতাকে দেখে হতভম্ব ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়েন।[১৯] আগে থেকেই নবুয়্যত লাভের আকাংখী হয়ে থাকলে তাঁর মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হতো না, বরং ফেরেশতাকে দেখে তিনি আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন।

৩. প্রথম অহি অবতীর্ণের পর তিনি ভীত ও আতংকগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরেন। তাঁর জ্বর এসে যায়, তিনি কম্বল চেয়ে নেন। অতপর ভীতি ও আতংক কিছুটা দূর হলে তিনি স্ত্রী খাদিজাকে বলেন : 'খাশীতু আ'লা নাফসী-খাদিজা! আমার জীবন নিয়ে ভয় হচ্ছে।'[২০]

কোনো কাংখিত জিনিস পেয়ে গেলে জীবনের ভয় হওয়া তো দূরের কথা, বরং মানুষ তখন খুশিতে বাগবাগ হয়ে নব জীবন লাভ করে।

৪. মুহাম্মদ সা. যদি পূর্ব থেকেই নবুয়্যতের অভিলাষী হয়ে থাকতেন, তবে নবুয়্যত লাভের পূর্বে বিগত চল্লিশ বছরে অবশ্যি তা স্পষ্টভাবে, কিংবা আকারে ইংগিতে কারো না কারো কাছে প্রকাশ করতেন। কিন্তু না এমন কোনো আকাংখা, অভিলাষ কিংবা ধারণাই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি। তাঁর বিরোধীরা পর্যন্ত কখনো তাঁর সম্পর্কে এ ধরণের কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেনি যে, আগে থেকেই বুঝা যাচ্ছিল তুমি এ ধরনের কিছু দাবি করবে!

৫. তিনি যদি নবুয়্যতের অভিলাষীই থাকতেন, তবে তাঁর এ অভিলাষ সম্পর্কে আর কেউ না জানুক, অন্তত তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজা অবশ্যি জানতেন। যদি তাই হতো তবে মুহাম্মদ সা. যখন খাজিদাকে হেরা গুহার ঘটনাবলী অবহিত করে তাঁর কাছে নিজের জীবনের আশংকা প্রকাশ করেন, তখন খাদিজা অবশ্যি বলে উঠতেন, এতে ভয়ের কি আছে, আপনি তো আপনার কাংখিত জিনিসই পেয়ে গেছেন!

---

১৮. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত ৫২।
১৯. সহীহ আল বুখারি : ১ম খন্ড, অহির সূচনা অধ্যায়।
২০. সহীহ আল বুখারি : ১ম খন্ড, অহির সূচনা অধ্যায়।

কিন্তু এ ধরনের অভিলাষ ছিলো বলে খাদিজারও কিছু জানা ছিলো না। তাইতো জীবনের আশংকা প্রকাশ করার পর খাদিজা প্রাণপ্রিয় স্বামীকে তাঁর জীবনের পুত পবিত্রতা, সদাচার ও মহানুভবতার দোহাই দিয়ে বলেছিলেন, আপনি ভয় পাবেন না, আল্লাহ কখনো আপনার মতো মহানুভব মানুষের ক্ষতি করবেন না।

এখন একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, মুহাম্মদ সা. নবুয়্যতের অভিলাষী ছিলেন না, বরং আল্লাহ তায়ালাই মেহেরবানি করে তাঁকে নবুয়্যত দান করেন, কুরআন নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন :

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

অর্থ: হে মুহাম্মদ! লোকদের বলে দাও: আল্লাহর সে রকম ইচ্ছা থাকলে এ কুরআন আমি তোমাদের শুনাতে পারতাম না এবং এর সম্পর্কে তোমাদের অবহিতও করতে পারতাম না। নবুয়্যত লাভের আগে আমি তো জীবনের একটা অংশ (চল্লিশ বৎসর) তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি। কেন তোমরা বিবেক খাটিয়ে দেখনা (যে এ বাণী আমার রচনা নয়)? [২১]

৬.কুরআন সুন্নাহ হাদিস

কুরআন আল্লাহর কিতাব। সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি আল্লাহ এ কিতাব অহি করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাব সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে 'আল্লাহর কিতাব' বলে প্রমাণিত।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল হিসেবে যেসব কথা বলেছেন, মানুষকে যে দাওয়াত এবং যে পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, ইবাদত করেছেন, পরিবার-সমাজ-সংগঠন, আন্দোলন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন, যা যা নির্দেশ দিয়েছেন, যা যা নিষেধ করেছেন এবং যেসব কথা, কাজ ও প্রথা অনুমোদন করেছেন সেগুলোকেই বলা হয় 'সুন্নাহ' বা সুন্নতে রসূল'। রসূল হিসেবে তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিও সুন্নাহ বা সুন্নতে রসূল।

'হাদিস' একটি পরিভাষা। হাদিস হচ্ছে বিশ্বনবী, নবী মুহাম্মদ সা. এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত কাল ও ঘটনাবলীর বর্ণনা। হাদিসে মুহাম্মদ সা.-এর যাবতীয় কথা, আচরণ, তাঁর সুন্নাহ এবং তাঁর সময়কালের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যেই ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সংকলিত সহীহ বুখারির নাম দিয়েছেন :

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ ·

('আল জামে আস্ সহীহ আল মুসনাদ আল মুখতাসার মিন উমূরে রাসূলিল্লাহে ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি।') অর্থ:'রসূলুল্লাহর যাবতীয় কার্যক্রম, তাঁর সুন্নাহ এবং তাঁর সময়কালের সূত্রযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ সংকলন।'

২১. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ১৬।

সহীহ বুখারির এই শিরোনাম থেকেই বুঝা যায় হাদিস কাকে বলে এবং হাদিসের আলোচ্য বিষয় ও উপাদানসমূহ কি কি?

সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা হাদিস ও সুন্নাহর পরিচয় জানতে পারলাম। এ দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাও জানতে পারলাম। হাদিস একটি ব্যাপক বিষয়। সুন্নাহ নির্দিষ্ট ধরনের বিষয়।

'সুন্নাহর' আলোচ্য বিষয় হলো মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। কিন্তু হাদিস-এর আলোচ্য বিষয় হলো : ক. ব্যক্তি মুহাম্মদের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়; খ. রসূল মুহাম্মদ-এর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়; গ. তাঁর প্রতিপক্ষ এবং যুগ ও কালের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু। প্রশ্ন হতে পারে, সুন্নাহ কোথায় পাওয়া যাবে? এর জবাব খুবই সহজ। তাহলো, সুন্নাহ পাওয়া যাবে হাদিসে, হাদিসের গ্রন্থাবলীতে। সব হাদিসই সুন্নাহ নয়, তবে সুন্নাহ পাওয়া যাবে হাদিসের মাঝে।

আরেকটি কথা ভালোভাবে জানা থাকা দরকার। তাহলো হাদিসের গ্রন্থাবলীতে যতো হাদিস আছে, সবই কিন্তু সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিস নয়। বিভিন্ন কারণে হাদিসের গ্রন্থাবলীতে 'হাদিস' নামে অনেক ভেজাল কথাও ঢুকে পড়েছে।

হাদিস বিশেষজ্ঞগণ হাদিস নামের ভেজাল ও বানানো কথাসমূহ চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো দিয়ে তাঁরা আলাদা গ্রন্থাবলীও রচনা করেছেন, যেনো লোকেরা সেগুলোকে হাদিস মনে না করে। জ্ঞানী লোকদের উচিত হাদিস নামের এসব জাল ও বানানো কথাসমূহ জেনে রাখা এবং চিনে রাখা। যারা এসব জাল ও বানানো কথাকে হাদিস বলে প্রচার করে, তাদেরকে বিরত রাখা। জাল ও বানানো কথার হাদিস দ্বারা সুন্নাহ নির্ণয় হয়না। সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদিস সমূহই সুন্নাহর উৎস।

৭. কুরআন এবং সুন্নাহই ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞানের মূল সূত্র

কুরআন আল্লাহর বাণী। কুরআন সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং সকল মানদণ্ডে অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য বলে প্রমাণিত। কুরআনই মানুষের জন্যে মূল হিদায়াত গ্রন্থ। কুরআনই মানুষের নিখাদ ও নির্ভুল সত্য জীবন-বিধান, জীবন-ব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি। কুরআনই সিরাতুল মুস্তাকিম।

হাদিস আকারে সংরক্ষিত সুন্নাহও এক প্রকার অহি। হাদিস আকারে সংরক্ষিত সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা ও রসূলের জীবনাদর্শ। তাই, সুন্নাহ সম্বলিত হাদিসমূহ কুরআনেরই বাস্তব রূপ। সুন্নাহ কুরআন বুঝার সহজ মাধ্যম।

কুরআন ইসলামি জ্ঞানের ডাইরেক্ট ও অকাট্য উৎস। সুন্নাহ কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ। সুতরাং কুরআন এবং সুন্নাহই ইসলাম ও ইসলামি জ্ঞানের মূল সূত্র। বাকি সকল উৎসের জ্ঞানকেই এই দুই উৎসের জ্ঞান দ্বারা যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। অন্য কোনো জ্ঞান বা মানদণ্ড দ্বারা যাচাই করে কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানকে গ্রহণ বা বর্জন করা যাবে না। কুরআন সুন্নাহকেই বানাতে হবে সব জ্ঞানের কষ্টি পাথর বা মানদণ্ড।

৮. কুরআনের অহি এবং হাদিসের অহির মধ্যে পার্থক্য

কুরআন যে সরাসরি মহান আল্লাহর বাণী সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কুরআন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ অহি। অক্ষরে অক্ষরে তা আল্লাহর অহি। তার ভাষাও আল্লাহর এবং বক্তব্যও আল্লাহর।

আর হাদিস? হাঁ, হাদিসও নিঃসন্দেহে অহি। তবে কুরআনের অহির মতো নয়। এ দু'ধরনের অহির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

কুরআনের অহি পুরোটাই আল্লাহ তায়ালা জিবরিল আমিনের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন। নবী করিম তা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্ত করে নিয়েছেন। কুরআনকে হুবহু ধারণ করবার জন্যে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর হৃদয়ে কুরআনকে খোদাই করে দিয়েছেন। জিবরিলের কাছ থেকে শুনার পর তিনি তা সাহাবিদের শুনাতেন এবং লিপিবদ্ধ করে নিতেন। সাহাবিরাও সাথে সাথে মুখস্ত করে নিতেন। এ অহির একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার অধিকার নবীর ছিলো না। এ অহিই সালাতে তিলাওয়াত করতে হয়। এ অহিকেই বলা হয় 'অহীয়ে মাতলু।'

হাদিসের অহির ধরন-এর চাইতে ভিন্নতর। হাদিসের অহি শুধু কেবল জিবরিলের মাধ্যমেই আসেনি। বরং সেই সাথে স্বপ্ন, ইলকা, ইলহাম অর্থাৎ ইংগিত প্রাপ্তি ও মনের মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমেও লাভ করতেন। আসলে এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু অহি করা হতো। ভাষা নয়, তিনি ভাব লাভ করতেন। আর এ ভাবটিকে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এ অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এরূপ অহিকে 'অহীয়ে গায়রে মাত্‌লু' বলা হয়। অবশ্য কুরআনের আলোকে রসূলের ইজতিহাদও হাদিস। 'মাতলু' মানে- যা রাসূলকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে এবং তিনিও হুবহু পাঠ করতে বাধ্য ছিলেন। আর 'গায়রে মাত্‌লু' মানে- যা পাঠ করে শুনানো হয়নি এবং তিনি হুবহু পাঠ করে শুনাতে বাধ্য ছিলেন না।

এক প্রকার হাদিসকে 'হাদিসে কুদসি' বলা হয়। এ হাদিসগুলোকে হাদিসে কুদসি বলার কারণ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসগুলোর বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলকা, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করেছেন, অথবা জিবরিল আমিনের মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং তিনি নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। কুরআনের ভাষা ও বক্তব্য দুটোই আল্লাহর। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসির বক্তব্য আল্লাহর আর ভাষা হলো রসূলের। হাদিসে কুদসিতে তিনি নিজের ভাষায় আল্লাহর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন।

হাদিসে কুদসির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী বলেন :

হাদিসে কুদসি হলো সেসব হাদিস, যেগুলো বর্ণনা করেছেন রাবিদের শিরোমনি, বিশ্বস্তদের পূর্ণিমা চাঁদ নবী মুহাম্মদ সা. তাঁর প্রভু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, কখনো জিবরিলের মাধ্যমে, কখনো অহির মাধ্যমে, কখনো ইলহামের মাধ্যমে

এবং কখনো স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হয়ে। আর তিনি এগুলো বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, যেভাবে ইচ্ছে বাক্য রচনা করে।[২২]

এখন এ কথাটি পরিষ্কার হলো যে, অন্য সকল হাদিস আর হাদিসে কুদসির মধ্যকার পার্থক্য হলো, হাদিসে কুদসি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর বক্তব্য তিনি আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছেন। অবশ্য বর্ণনা করেছেন নিজের ভাষায়।

হাদিসে কুদসি যদিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহির মাধ্যমে লাভ করেছেন, যদিও রসূল সা. তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবু হাদিসে কুদসি কুরআন বা কুরআনের সমতুল্য নয়। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হলো, হাদিসে কুদসিও এক প্রকার হাদিসই মাত্র, হাদিসের ঊর্ধ্বে নয়। যেহেতু হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর সূত্রে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, সে কারণে কেউ যদি এরূপ হাদিসকে কুরআনের সমতুল্য মনে করেন, তবে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। কুরআন এবং হাদিসে কুদসি তথা হাদিসের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান:

১. অক্ষরে অক্ষরে কুরআনের ভাষা এবং বক্তব্য দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদিস ও হাদিসে কুদসির বক্তব্য বা বিষয়বস্তুই কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছেন, আর ভাষা দিয়েছেন রসূল নিজে।

২. কুরআন কেবলমাত্র জিবরিল আমিনের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। অথচ হাদিস ও হাদিসে কুদসি ইলহাম এবং স্বপ্নযোগেও রসূল লাভ করেছেন।

৩. কুরআন লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত এবং সেখান থেকেই নাযিল হয়েছে। অথচ হাদিস ও হাদিসে কুদসি লওহে মাহফুযে রক্ষিত নয়।

৪. কুরআন পাঠ করা ইবাদত। প্রতিটি অক্ষর পাঠ করার জন্যে দশটি সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু হাদিস ও হাদিসে কুদসির পাঠ ইবাদত নয়।

৫. কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত হয়না। অথচ হাদিস ও হাদিসে কুদসির অবস্থা তা নয়।

৬. কুরআন রসূলের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর এক আশ্চর্য মু'জিযা। এর মতো বাণী তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু হাদিসের অবস্থা তা নয়।

৭. কুরআন আল্লাহর ভাষা ও বাণী। পক্ষান্তরে হাদিস ও হাদিসে কুদসি মানুষের (নবীর) তৈরি ভাষা ও কথা।

৮. কুরআন অমান্যকারী কাফির হয়ে যায়। কিন্তু কোনো হাদিস বা হাদিসে কুদসি অমান্যকারীকে কাফির বলা যায় না।

৯. কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হাদিস ও হাদিসে কুদসি শুধু কেবল মানুষের বর্ণনার ভিত্তিতেই সংরক্ষিত হয়েছে।[২৩]

---

২২. সূত্র : আবদুর রউফ আল মানাভী : আল ইত্তেহাফাতুস সুন্নিয়া ফিল আহাদিসিল কুদসিয়া।

২৩. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন। মান্না' আল কাত্তান : মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন। ড. আমির আবদুল আযীয : দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন।

অনুচ্ছেদ ৩

আল কুরআনের পরিচয়

১. আল কুরআনের আভিধানিক অর্থ

প্রথমেই কুরআন (قران) শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয় করা যাক। قران শব্দের শব্দমূল (مادة) কী সে বিষয়ে আরবি ভাষাবিদগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কোনো কোনো ভাষাবিদের মতে قراءة (পাঠ করা) থেকে قران শব্দ গঠিত হয়েছে। এ মতের পক্ষে তাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত আয়াত দুটি :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○

অর্থ: এটি (কুরআন) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো।[১]

এ দুটি আয়াতে قران শব্দটি قراءة (পাঠ করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قران শব্দটি شكران، غفران، فعلان শব্দের মতোই একটি مصدر বা ক্রিয়ামূল।[২]

কোনো কোনো ভাষা বিজ্ঞানী মনে করেন قران শব্দটি قرء শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। তাদের মতে القرء মানে الجمع অর্থাৎ জমা করা বা সংরক্ষণ করা। যেমন আরবরা বলে : قَرَأَ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ অর্থাৎ হাউজে পানি জমা করা হয়েছে। এই قرء থেকেই উদগত হয়েছে قرية শব্দ। এর অর্থ গ্রাম বা জনপদ যেখানে কিছু মানুষ বসবাসের জন্যে জমা বা সমবেত হয়।[৩]

কারো কারো মতে, قران শব্দটি اقتران শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। اقتران মানে এমন জিনিস যার একটি অংশ অন্যান্য অংশের সাথে সুগ্রথিত ও সুসাঞ্জস্যপূর্ণ।[৪]

রাগিব ইস্পাহানি বলেছেন : قران শব্দটি قرا - يقرا থেকে গঠিত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ জমা করা বা একত্রিকরণ। পরে তা পঠন বা পাঠ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পঠন মানেই শব্দসমূহের একত্রিকরণ।[৫]

আবুল আ'লা মওদূদীর মতে : قران শব্দটি قرا - يقرا থেকে গঠিত। এর আসল অর্থ পাঠ করা। কোনো কর্মবোধক মূল শব্দকে যখন কোনো জিনিসের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, সে জিনিসে মূল শব্দে নিহিত কর্ম পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যেমন কোনো ব্যক্তিকে যদি বীরের পরিবর্তে 'বীরত্ব' বলা হয়, তবে তার অর্থ হয়, এ ব্যক্তির মধ্যে বীরত্ব এতো বেশি মাত্রায় বিদ্যমান যে, সে এবং বীরত্ব এ দুটো একই জিনিস হয়ে গেছে।

---

১. আল কুরআন, সূরা ৭৫ আল কিয়ামা : আয়াত ১৭-১৮।
২. মান্না' আল কাত্তান : মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ৮ম মুদ্রণ ১৯৮১।
৩. ড. আমির আবদুল আযীয : দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন, ১ম সংস্করণ, দারুল ফুরকান, বৈরুত।
৪. ড. আমির আবদুল আযীয : দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন, ১ম সংস্করণ, দারুল ফুরকান, বৈরুত।
৫. রাগিব আল ইস্পাহানি : আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন।

আর এ কিতাবের নাম 'কুরআন' রাখার তাৎপর্য হচ্ছে, এ কিতাব বিশেষ ও নির্বিশেষে সকলেরই পড়ার জন্যে এবং অধিক অধিক পড়ার কিতাব।[৬]

উপরে قران শব্দের যেসব আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করা হলো, সেগুলো পরস্পরবিরোধী নয় বরং একটি অর্থ আরেকটির পরিপূরক। সবগুলো অর্থই আরবদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সবগুলো অর্থই সঠিক। কুরআন মজিদের ক্ষেত্রে এ সবগুলো অর্থই প্রযোজ্য।

২. আল কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

কুরআন বিশেষজ্ঞগণ কুরআনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আল কুরআনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কুরআন হলো :

المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول الينانقلا متواترًا بلاشبهة .

অর্থ: (কুরআন সেই গ্রন্থ) যা রসূল সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং সন্দেহাতীত ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৭]

আল্লামা তকি উসমানি বলেন, এ সংজ্ঞার ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম একমত এবং কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

কুরআন মজিদের একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা হলো :

كلام الله المعجز المنزل على النبى محمد ص المكتوب فى المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلا وته.

অর্থ: এ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ মহান আল্লাহর সেই সর্বজয়ী অলৌকিক (miracle) বাণী- যেরূপ বাণী রচনা করতে মানুষসহ সর্বসৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, ধারাবাহিক বিপুল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত এবং যার আবৃত্তি ইবাদত।[৮]

এ সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবহ এবং সুবিখ্যাত। এছাড়া আরেকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

"কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার সেই অতিশয় পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি জিবরিল আমিনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে তেইশ বছরে নাযিল করেছেন; যা বিন্দুমাত্র সংশোধন, সংযোজন ও সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; যার সুরক্ষার দায়িত্ব পালনকারী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা; যা লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত; যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. এবং যার প্রথম সূরা আল ফাতিহা ও শেষ সূরা আন নাস।"[৯]

---

৬. আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ, টীকা ১।
৭. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন। 'আত্ তালবীহ মা'আত তাওযীহ' গ্রন্থের সূত্রে উদ্ধৃত।
৮. ড. আমির আবদুল আযীয : দিরাসাতু ফী উলূমিল কুরআন, দারুল ফুরকান, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৯৮৩। মান্না' আল কাত্তান : মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ ১৯৮১।
৯. মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি : আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৬।

উপরোদ্ধৃত সবগুলো সংজ্ঞাই আল কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশক। সংজ্ঞাগুলো প্রায় একই রকমের। প্রত্যেকটি সংজ্ঞাই একটি আরেকটির সমর্থক, সমার্থক ও পরিপূরক।

৩. কুরআন কাদের জন্যে এবং কী উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে?

কুরআনুল হাকিম কাদের জন্যে এবং কী উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনেই বিস্তারিত বক্তব্য রয়েছে। এ প্রসংগে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াত থেকে :

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

অর্থ: এটি একটি কিতাব, আমরা তোমার প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি **মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো**।[১০]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযান মাস, এতেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, **মানব জাতির জন্যে হিদায়াত** এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও মানদণ্ড।[১১]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ○

অর্থ: (হে মুহাম্মদ! মানুষকে) বলে দাও : **"হে মানুষ!** তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে মহাসত্য (আল কুরআন)। সুতরাং যে **কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করবে**, সঠিক পথ গ্রহণে তারই কল্যাণ হবে। আর যে কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করবে, ভ্রান্ত পথ তারই ক্ষতির কারণ হবে। আমি তোমাদের দায়দায়িত্ব বহনকারী নই।"[১২]

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ: আমি আমার রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে পাঠিয়েছি কিতাব এবং ন্যায়দন্ড, **যাতে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়ের উপর**।[১৩]

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থ: আর কল্যাণকর এ কিতাব আমি নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর **অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও**, তবেই তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।[১৪]

---

১০. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ০১।
১১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।
১২. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ১০৮।
১৩. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ২৫।
১৪. আল কুরআন, সূরা ৬ আন'আম : আয়াত ১৫৫।

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ○

অর্থ: আমরা সত্যসহ তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্যে। সুতরাং যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করবে সে সঠিক পথ গ্রহণ করে নিজেরই কল্যাণ করবে। আর কেউ ভ্রান্ত পথে চলবে, ভ্রান্ত পথে চলে সে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তুমি তাদের দায়দায়িত্ব বহনকারী নও।[১৫]

উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম :

১. আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের জন্যে, মানব জাতির জন্যে। কুরআন কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠী বা ধর্মাবলম্বীদের জন্যে নাযিল করা হয়নি। কুরআন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব। এ কিতাব পড়া, বুঝা, জানা, মানা ও অনুসরণ করার ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মানুষের অধিকার সমান।

২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে মানব সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্যে।

৩. এ কিতাব মানব সমাজের জন্যে সঠিক পথ প্রদর্শক, সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতির নির্দেশিকা। এর বিধান সুপ্রমাণিত এবং এটি সত্য মিথ্যার একমাত্র মানদণ্ড (কষ্টি পাথর)।

৪. আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন মানুষ যেনো এর সাহায্যে ইনসাফ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৫. এ কিতাবের সুফল পেতে হলে এবং এর দ্বারা কল্যাণ লাভ করতে হলে একে অনুসরণ ও প্রতিপালন করতে হবে।

৬. কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করার পর যারা তার অনুসরণ করবে, তারা তাদের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। আর যারা বিপথেই চলবে তারা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

৭. কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক পথ গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে সব মানুষ স্বাধীন। যারা সঠিক পথ গ্রহণ করবেনা, তাদের দায়দায়িত্ব কুরআনের বাহকের উপর বর্তাবেনা।

৪. কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য

আল্লাহ তায়ালার কালাম কুরআন মজিদে অসংখ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি এমন কোনো বিষয় নেই যা কুরআনে করিমে আলোচিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ: এ কিতাবে আমরা কোনো কিছুই বাদ দেইনি।[১৬]

---

১৫. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১।

১৬. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আ'আম : আয়াত ৩৮।

ইমাম বায়দাবি বলেছেন, এ কিতাবে কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে আবার কোথাও ইশারা ইংগিতে দীনের যাবতীয় বিধি বিধানের আলোচনা রয়েছে।

আল্লামা রাগিব আত্তাবাখ তাঁর আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থে নিম্নরূপভাবে কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন :

১. আল্লাহর সত্তার বর্ণনা : অর্থাৎ তিনি এক, একক, মুখাপেক্ষাহীন, সৃষ্টির অস্তিত্ব দানকারী এবং সৃষ্টির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী। এছাড়া তাতে আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বের দলিল প্রমাণের বর্ণনা রয়েছে। তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য কবুল করার আহ্বান রয়েছে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. সেসব বিধিবিধানের বর্ণনা, যেগুলোর দ্বারা মানুষের জীবন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩. আত্মশুদ্ধির জন্য হিকমত, মাওয়িযায়ে হাসানা ও উদাহরণ সমূহের বর্ণনা।

৪. সেসব নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা, যেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে মানব জাতির কল্যাণ ও অকল্যাণ।

৫. অন্তরের দৃঢ়তা এবং সাহস ও সিদ্ধান্তের অটল অবিচলতার জন্যে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের কাহিনী বর্ণনা, যেনো তাঁদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে সফলতা ও কামিয়াবি হাসিল করা যায়।

৬. সেসব জাতি এবং অহংকারি অত্যাচারি লোকদের বর্ণনা, যারা দাওয়াতে হকের বিরোধিতা করেছিল এবং সত্যের দিকে আহ্বানকারীদের আহ্বানকে করেছিল প্রত্যাখ্যান, তাদের এ অস্বীকৃতির অশুভ পরিণতির বর্ণনা।

৭. পারস্পারিক সম্পর্ক, পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জনসাধারণ, আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিবজনের সাথে আচরণ ও সম্পর্কের ধরন আলোচনা।

৮. সৎ কাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ন্যায় ও সততার শিক্ষা দানে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯. আসমান, যমিন এবং এতদোভয়ের মাঝখানে যেসব বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে সেগুলো আর মানুষ, জীব জন্তু ও উদ্ভিদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেনো এগুলো থেকে উপদেশ লাভ করা যায় এবং স্রষ্টার সঠিক পরিচয় ও মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

১০. এ বিশ্বজাহানের পরিণাম ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী ও প্রকৃত ব্যাপারসমূহের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ জগত ধ্বংসের পর দ্বিতীয়বার উত্থান এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে কোন্ ধরনের লোকদের কিরূপ পুরস্কারে ভূষিত

করা হবে আর কাদের চিরতরে আযাবে নিপতিত করা হবে, তার মর্মস্পর্শী আলোচনা করা হয়েছে।[১৭]

মোট কথা, মানুষের চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যে এ গ্রন্থে প্রকৃত বিষয় সমূহের আলোচনা করা হয়েছে যা মানব রচিত কোনো গ্রন্থে পাওয়া সম্ভব নয়।

ইযয ইবনে আবদুস সালাম তাঁর 'মাজাযাতুল কুরআন' গ্রন্থে পবিত্র কালামে পাকের লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আয়াতসমূহের বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে তা কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন :

১. জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মানুষের বিবেককে সত্য উপলব্ধির জন্যে জাগ্রত করা।
২. অনুমতি প্রদান।
৩. সম্বোধন। শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের নামই সম্বোধন। এর দ্বারা শ্রোতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে বক্তব্য বিষয়ে আমল করার আহ্বান জানানোই উদ্দেশ্য।
৪. সৎ কাজের প্রশংসার মাধ্যমে আমলে সালেহর প্রতি উৎসাহিত করা।
৫. নেককারদের (সৎকর্মশীলদের) প্রশংসা।
৬. অসৎ কাজের নিন্দা।
৭. অসৎকর্মশীলদের নিন্দা।
৮. সৎকর্মে পার্থিব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।
৯. সৎকর্মের জন্যে পরকালীন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।
১০. অসৎ কর্মের পার্থিব অশুভ পরিণতির ধমক।
১১. অসৎ কর্মের জন্যে পরকালীন শাস্তির ধমক।
১২. অতীতের উদাহরণ বর্ণনার মাধ্যমে সতর্ককরণ।
১৩. পুনরুক্তি অর্থাৎ পুনরুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা।[১৮]

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি তাঁর 'মুকাদ্দামাতুত তাফসির' গ্রন্থে লিখেছেন : যেসব আহকামের উপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত সেগুলো ছয় ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ তাঁর মতে আল কুরআনের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. আকিদা বিশ্বাস তথা ঈমানের বর্ণনা। আর ঈমানের বিষয়বস্তু পাঁচটি। যেমন : আল্লাহর যাত ও সিফাতের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, কিতাবের প্রতি ঈমান, নবী রসূলদের প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান।
২. ইবাদতের বর্ণনা। যেমন : সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ইতেকাফ এবং কাফফারা ইত্যাদি।
৩. জন্মগত চাহিদাসমূহের বর্ণনা। যেমন : পানাহার, বিয়ে, পোষাক।
৪. পারস্পারিক সম্পর্ক বর্ণনা। যেমন : লেন দেন, বিতর্ক, আমানত এবং উত্তরাধিকার।

---

১৭. রাগিব আত তারাখ : আস্ সাকাফাতুল ইসলামিয়া।
১৮. ইয্য ইবনে আবদুস সালাম : মাজাযাতুল কুরআন।

৫. বিভিন্ন শাস্তির বর্ণনা। যেমন : হত্যার শাস্তি, মানহানির শাস্তি, বংশ বিকৃতির শাস্তি, সম্পদ হরণের শাস্তি, ইসলামী উম্মাহ এবং আল জামায়াতে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি।

৬. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা। এসব গুণ আবার তিন প্রকার। যেমন : ক. ব্যক্তিগত গুণাবলী। যথা : ইলম, বীরত্ব, দান, ক্ষমা, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইত্যাদি। খ. সামাজিক গুণাবলী। যেমন : পিতা মাতার সাথে আচরণ। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। প্রতিবেশীর হিফাযত। অন্যের অধিকার সংরক্ষণ, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, মযলুমের সাহায্য করা ইত্যাদি। গ. রাষ্ট্রীয় ও সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত হবার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।[১৯]

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তাঁর প্রখ্যাত তফসির তাফহীমুল কুরআনের মুকাদ্দমায় লিখেছেন :

"কুরআনের মূল বিষয়বস্তু মানুষ। কারণ, প্রকৃত ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে তার অকল্যাণ হতে পারে কুরআন মজিদে তারই আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয় হলো, স্থূল দৃষ্টি এবং অমূলক ধারণার অনুসরণ কিংবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থা, স্বয়ং নিজের সত্তা এবং নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ রচনা করেছে এবং সেসব মতবাদের উপর ভিত্তি করে যে আচরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে, প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে তা সবই ভুল এবং পরিণতির দিক দিয়ে তা স্বয়ং মানুষের জন্যেই মারাত্মক। তাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খলিফা নিযুক্ত করার সময় নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন। এ সত্য তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেও বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত নীতিই হচ্ছে মানুষের জন্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা।

কুরআন মজিদের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রতি আহ্বান করা যা দুনিয়ার মানুষ নিজেদের উপেক্ষাতেই হারিয়েছে। নিজেদের কুটিল হাতে বিকৃত করে ফেলেছে।

এ তিনটি মৌলিক বিষয় মনে রেখে কুরআন মজিদ অধ্যয়ন করলে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হবে যে, এ মহান গ্রন্থ কোথাও তার মূল বিষয়বস্তু, লক্ষ্য এবং কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয় থেকে একবিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত বা বিভ্রান্ত হয়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার বিভিন্ন প্রকারের আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রিয় বিষয়ের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে আছে, যেমন একখানি কণ্ঠহারের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র বর্ণের হীরা জহরত হারের মূলসূত্রের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। বস্তুত ইসলামি দাওয়াতকে কেন্দ্র করেই তার সকল আলোচনা পর্যালোচনা গভীর ঐক্য ও সাম স্যের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরছে।[২০]

---

১৯. রাগিব আত তারাখের 'আস্ সাফাকাতুল ইসলামিয়া' গ্রন্থের সূত্রে উদ্ধৃত।

২০. আবুল আ'লা মওদূদী : মুকাদ্দমা, তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ইদারায়ে তরজমানুল কুরআন, লাহোর।

৫. আল কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে অনির্বাণ পথ প্রদর্শক ও জীবন ব্যবস্থা। এমন কোনো বিষয় নেই, যা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিধি বিধানের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণের সম্ভার এ কিতাব। কিন্তু এতো অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা থাকলেও মানব রচিত কোনো গ্রন্থের ন্যায় ধারাবাহিক সূচি পরম্পরায় বিন্যস্ত করা হয়নি এ কিতাব। বিষয়বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের সহৃদয় মুর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠককে তীর্যক বলাকার মতোন ধাবিত করে এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে। আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি ও প্রতিধ্বনিতে এখানে পাঠক কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েনা। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনা ভঙ্গিতে বাঙময়। পাঠকের সংকীর্ণ হৃদয়ের দুয়ার খুলে তাকে প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। অতি সাধারণ বিষয়ও অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে এ মহাগ্রন্থে। অতিক্ষুদ্র বিষয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে মহিমা মণ্ডল। প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তা ভোলা যায়না, ভুল হয়না, বার বার শুধু উঁকি মারে পাঠকের হৃদয়ে। প্রতিটি কথাই যেনো সদ্যজাত, অথচ চিরন্তন চির শাশ্বত। এ এমন এক আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দিয়ে দিবালোকের মতো জ্যোতির্ময় করে তোলে পাঠকের হৃদয়। দু:খ বেদনায় মর্মপীড়িত মুমিনের হৃদয়কে সিক্ত করে তোলে প্রশান্তির দুর্নিবার ফল্গুধারায়। এ কিতাব মৃত্যুঞ্জয় সুধা শারাবান তহুরা। একবার যে এ কিতাবের শিক্ষা অমৃত সুধায় সিক্ত করে নিজের হৃদয়, মৃত্যুঞ্জয়ী আসন চুম্বন করে তার পদযুগল। সারা দুনিয়ার তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে সে নিজেকে পেশ করে দুর্জয় বীরের বেশে।

৬. আল কুরআনের মর্যাদা

পবিত্র কুরআন মজিদের সাথে মানব রচিত কোনো গ্রন্থের তুলনাই হয়না। পৃথিবীতে আর যে কয়টি ঐশী গ্রন্থের অবশিষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেগুলো বিকৃত এবং রদবদলের কারণে অনুসরণ অযোগ্য। সুতরাং আল্লাহর কালাম আল কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র অনুপম, অতুলনীয় ও মানব মুক্তির অনন্য মহাসনদ। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

অর্থ: এ হচ্ছে একমাত্র কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই! (এ কিতাব) সতর্ক সচেতন লোকদের জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা।[২১]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

২১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ০২।

অর্থ: রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। (এ কুরআন) গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ যা সত্য ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।[২২]

কুরআন মজিদের অসংখ্য আয়াতে কুরআনের মহানত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যেগুলোতে আল কুরআনের ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস উদ্ধৃত হলো :

১. আকাশ মণ্ডলী এবং যমিন আর এ দুয়ের মাঝখানে যতোকিছু রয়েছে, সবকিছুর চাইতে আল্লাহর কাছে আল কুরআন অধিক প্রিয়। -দারমি : আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা.।

২. যার হৃদয়ে গ্রথিত রয়েছে আল কুরআন, দোযখের আগুন তাকে জ্বালাবেনা কখনো। -তাবারানি : আনাস ইবনে মালেক রা.।

৩. খায়রুল হাদিসে কিতাবুল্লাহ- সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। -মুসলিম : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.।

৪. সকল বাণীর তুলনায় কুরআনের মর্যাদা এতো উর্ধ্বে, সকল সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর মর্যাদা যতো উর্ধ্বে। -বায়হাকি।

৫. রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।-হাকিম: ইবনে উমার রা.।

৬. কুরআনের চাইতে উত্তম কোনো জিনিস নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবেনা। -হাকিম: আবু যর রা.।

৭. নিশ্চয়ই এ কুরআন একটা রজ্জু বিশেষ। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অপর প্রান্ত তোমাদের মাঝে। সুতরাং তোমরা এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তাহলে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা, আর কখনো ধ্বংস হবেনা। -ইবনে আবি শাইবা : আবু শুরাইহ আল খুজায়ী থেকে বর্ণিত।[২৩]

এছাড়া কুরআনের মর্যাদা সংক্রান্ত আরো অনেক হাদিস রয়েছে। বিবেকবানদের জন্যে এ ক'টির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

❖❖❖

২২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।
২৩. হাদিসগুলো জালালুদ্দিন সুয়ূতির 'আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন' গ্রন্থের সূত্রে উদ্ধৃত হলো।

অনুচ্ছেদ ৪

উম্মুল কিতাব থেকে নাযিল হয়েছে আল কুরআন

১. উম্মুল কিতাব কী?

আল্লাহ তায়ালা তেইশ বছর ধরে ধীরে ধীরে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন। লিপিবদ্ধ কোনো গ্রন্থ তিনি তাঁর প্রতি নাযিল করেননি। কুরআন তাঁর প্রতি অহি করা হয়েছে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানব জাতির 'জীবন ধারা' ও 'জীবন যাপন পদ্ধতি'র নির্দেশনা সংক্রান্ত একটি কিতাব (গ্রন্থ) মহান আল্লাহ তাঁর কাছে তৈরি করে রেখেছেন। সেটি 'উম্মুল কিতাব' বা 'মূল কিতাব'। সেটি তাঁর নিকট গোপন ও সংরক্ষিত রয়েছে। সেটি রয়েছে সুরক্ষিত ফলকে।

সেই সুরক্ষিত উম্মুল কিতাব বা মূল কিতাব থেকেই মহান আল্লাহ নবী রসূলদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে 'দীন' ও 'কিতাব' অহি করে পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে তিনি দীন ও কিতাব পাঠিয়েছেন নবী ও নবীর কওমের নিজস্ব ভাষায়।

'উম্মুল কিতাব' বা মূল কিতাব আল্লাহর কাছে কোন্ ভাষায় সংরক্ষিত এবং রেকর্ড করা আছে, তা কেবল তিনিই জানেন। তবে, নবী রসূলদের কাছে তা পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জাতির ভাষায়।

মহান আল্লাহ নবী-রসূলগণের কাছে বিভিন্ন ভাষায় (অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ ভাষায়) অহি ও কিতাব নাযিল করেছেন। সকল নবী রসূলের মধ্যে একজন মাত্র রসূলের কাছে তিনি কিতাব পাঠিয়েছেন আরবি ভাষায়। কারণ তাঁর এবং তাঁর জাতির ভাষা ছিলো আরবি। আর তিনি হলেন বিশ্বনবী এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.। একথাগুলো মূলত কুরআনেরই কথা। কুরআন বলছে :

حٰمٓ ۝ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

অর্থ: হামিম! এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমি এটিকে আরবি ভাষার কুরআন বানিয়েছি এজন্যে, যাতে করে তোমরা তা বুঝতে সক্ষম হও। আর প্রকৃতপক্ষে এটি (এ কুরআন) তো 'উম্মুল কিতাবে' (মূল কিতাবে) লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত রয়েছেই, যা আমার কাছে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ।[১]

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

অর্থ: আল্লাহ যা চান মুছে দেন আর যা চান স্থিতিশীল করেন। আর তাঁর কাছে তো রয়েছে 'উম্মুল কিতাব' (মূল কিতাব)।[২]

---

১. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ১-৪।

২. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ৩৯।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

অর্থ: বরং এ হচ্ছে সম্মানিত কুরআন, যা সংরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।[৩]

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○ لَّا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

অর্থ: নিশ্চয়ই এ এক সম্মানিত কুরআন! এক গোপন সুরক্ষিত কিতাবে এটি সংরক্ষিত। পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া সেটিকে আর কেউই স্পর্শ করেনা।[৪]

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ ○ وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ○

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি (এ কুরআন) মহাজগতের প্রভুর নাযিলকৃত। এটিকে নিয়ে অবতরণ করেছে রূহুল আমিন (জিবরিল), তোমার হৃদয়ে, পরিষ্কার আরবি ভাষায়, যাতে করে তুমি হতে পারো একজন সতর্ককারী। এর (কুরআনের) উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও।[৫]

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার জানা যায় :

১. মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে একটি 'মূল কিতাব' (উম্মুল কিতাব) তৈরি করে রেখেছেন।

২. সেটি তাঁর কাছে (একটি গোপন কিতাব) যা সুরক্ষিত ফলকে (লওহে মাহফুজ-এ) উৎকীর্ণ করা রয়েছে।

৩. সেটি তাঁর কাছে কোন্ ভাষায় সংরক্ষিত, তা তিনি ছাড়া আর কেউই জানেনা। কারণ এ বিষয়ে তিনি মানুষকে অবহিত করেননি।

৪. সেটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

৫. সেই মূল কিতাব (উম্মুল কিতাব) থেকেই তিনি নবী-রসূলগণের কাছে অহী নাযিল করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

৬. প্রত্যেক নবী-রসূলের কাছে তিনি বার্তা পাঠিয়েছেন তার স্বজাতির ভাষায়, যাতে করে তাঁর জনগণ তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

৭. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ আল কুরআনও সেই গোপন সুরক্ষিত মূল কিতাব বা উম্মুল কিতাব থেকেই নাযিল করা হয়েছে।

৮. কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ সা.-এর কাছে অবতরণ করেছেন 'রূহুল আমিন' জিবরিল।

৯. কুরআন নাযিলকালে পবিত্র ফেরেশতারা ছাড়া আর কেউই (জ্বিন-শয়তান) তা স্পর্শ করেনি। 'বিশ্বস্ত রূহ' তা যথাযথভাবে (as it is) পৌঁছে দিয়েছেন।

---

৩. আল কুরআন, সূরা ৮৫ আল বুরুজ : আয়াত ২১-২২।
৪. আল কুরআন, সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া : আয়াত ৭৭-৭৯।
৫. আল কুরআন, সূরা ২৬ শু'আরা : আয়াত ১৯২-১৯৬।

২. কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হবার কারণ

উম্মুল কিতাব থেকে আল্লাহ পাক আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। এর কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আল কুরআনেই :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط

অর্থ: আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষায় (বার্তা নিয়ে) পাঠিয়েছি, যাতে করে সে তাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে পেশ করতে পারে।[৬]

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلاَ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ ط

অর্থ: আমরা যদি এই কুরআনকে অনারবদের ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তখন এই লোকেরা বলতো : 'এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) কেন তফসির করা হলোনা! এটাতো আজব ব্যাপার, কিতাব হলো অনারবি আর রসূল হলো আরবি!'[৭]

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ○ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ: আমি যদি এ কুরআন কোনো অনারবি ব্যক্তির উপর নাযিল করতাম এবং সে যদি এদের কাছে তা পাঠ করতো, তবে এরা তার প্রতি ঈমান আনতোনা।[৮]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো :

১. উম্মুল কিতাব থেকে কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবি ভাষায়। কারণ যাকে শেষ নবী নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি একজন আরব এবং তাঁর স্বজাতির লোকেরাও আরবি ভাষী।

২. একজন আরব রসূলের কাছে এবং প্রথম পর্যায়ের আরব শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অনারবি ভাষায় কিতাব পাঠালে তারা সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝতোনা এবং রসূলও অচেনা ভাষায় তা পরিষ্কার করে বুঝাতে পারতেন না। ফলে তারা ঈমান আনতো না বরং তা প্রত্যাখ্যান করতো।

৩. আরবি ভাষার বিশেষ মর্যাদার কারণে কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়নি; বরং নাযিল করা হয়েছে রসূল এবং রসূলের কওমের ভাষায়।

৪. উম্মুল কিতাব থেকে সব রসূলের কাছেই তাঁদের মাতৃভাষায় বা কওমের ভাষায় আল্লাহ তায়ালা কিতাব নাযিল করেছেন। একই নিয়মে কুরআন নাযিল করেছেন মুহাম্মদ সা.-এর কাছে।

৫. তবে উম্মুল কিতাব-এর ভাষা কী-তা আল্লাহ আমাদের জানাননি।

৩. উম্মুল কিতাব থেকে পৃথিবীর আকাশে আল কুরআন

লওহে মাহফুয বা উম্মুল কিতাব থেকে কুরআন নাযিলের ব্যাপারে কয়েকটি মত

---

৬. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ৪।
৭. আল কুরআন, সূরা ৪১ হামিম আস্-সাজদা : আয়াত ৪৪।
৮. আল কুরআন, সূরা ২৬ শু'আরা : আয়াত ১৯৮-১৯৯।

লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. প্রথম মত : লাইলাতুল কদরে পূর্ণ কুরআন একত্রে পৃথিবীর আকাশের 'বাইতুল ইয্যত'-এ নাযিল করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী রসূল সা.-এর প্রতি কিছু কিছু করে (২৩ বছরে) পুরো কুরআন নাযিল করা হয়েছে।[৯]

২. দ্বিতীয় মত হলো, লওহে মাহফুয থেকে কুরআন ২০ বা ২৩ কিংবা ২৫ লাইলাতুল কদরে পৃথিবীর আকাশে নাযিল হয়েছে। প্রতি লাইলাতুল কদর-এ পৃথিবীর আকাশে সেই পরিমাণ কুরআন নাযিল করা হতো, পরবর্তী লাইলাতুল কদর পর্যন্ত যে পরিমাণ কুরআন রসূল সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হতো।[১০]

৩. তৃতীয় মত হলো, রসূল সা.-এর প্রতি রমযান মাসে লাইলাতুল কদর-এ কুরআন নাযিল-এর সূচনা হয়েছে। অতপর প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআন নাযিল হতে থাকে।[১১]

৪. কুরআন নাযিলের সূচনাকাল প্রসংগে কুরআন

কুরআন নাযিলের সূচনা সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ .

অর্থ: রমযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন।[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে, কুরআন নাযিল করা হয়েছে এক মহা কল্যাণময় রাতে :

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থ: আমরা নাযিল করেছি এটিকে এক মুবারক রাতে।[১৩]

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা নাযিল করেছি এটি লাইলাতুল কদর-এ। কিভাবে জানবে তুমি কী লাইলাতুল কদর? লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে উত্তম।[১৪]

উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো, কুরআন রমযান মাসের 'লাইলাতুম মুবারক' বা 'লাইলাতুল ক্বদরে' নাযিল করা হয়েছে। এখন তৃতীয় মতের লোকদের যুক্তি হলো, 'আল কুরআন' এবং 'আল কিতাব' এই শব্দ দু'টি যেমন গোটা কুরআনের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি আংশিক কুরআনের ব্যাপারেও প্রায়োগ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার প্রথম দিকে রয়েছে :

---

৯. এ মতের সূত্র হলো, বায়হাকী, হাকিম এবং নাসায়ীতে সংকলিত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা।

১০. এ মতটি ইমাম কুরতুবি মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

১১. এটি ইমাম শাবীর মত। দ্রষ্টব্য : ড. আমীর আবদুল আযীয : দিরাসাতুন ফী উমূমিল কুরআন, ১ম সংস্করণ, মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত ১৯৮৩ ঈসায়ী। আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন।

১২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।

১৩. আল কুরআন, সূরা ৪৪ দুখান : আয়াত ৩।

১৪. আল কুরআন, সূরা ৯৭ আল ক্বদর : আয়াত ১-৫।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ. অর্থ: এটি 'আল কিতাব' এতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৫]

এই আয়াতে 'আল কিতাব' বলতে গোটা কুরআনকে বুঝানো হয়নি, বরঞ্চ আংশিক কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, তখনো গোটা কুরআন নাযিল হয়নি। সুতরাং সে সময় পর্যন্ত কুরআনের যতোটা অংশ নাযিল হয়েছিল সে অংশকেই 'আল কিতাব' বলা হয়েছে। একইভাবে সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ .

অর্থ: রমযান মাস, এ মাসে নাযিল করা হযেছে আল কুরআন।[১৬]

একথা পরিষ্কার, যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন গোটা কুরআন নাযিল হয়নি। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়, রমযান মাসে কুরআনের অংশ বিশেষ নাযিল হয়েছে, গোটা কুরআন নয়।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে জানা ও বুঝা গেলো :

১. কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে রমযান মাসে।

২. কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে (ঐ মাসের) একটি রাতে।

৩. মহান আল্লাহ সেই রাতের দুটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সম্মানিত নাম রেখে দিয়েছেন : ক. লাইলাতুম মুবারাকা খ. লাইলাতুল কদর।

'মুবারক' মানে- আশীর্বাদপ্রাপ্ত, সৌভাগ্যবান, মহিমান্বিত। কদর শব্দের তিনটি অর্থ: ১. মর্যাদা ২. ফয়সালা ৩. শক্তি ও ক্ষমতা।

৫. কুরআন নাযিলের সেই মহাসম্মানিত রাত কোন্‌টি?

কোন্ মাসের কোন্ তারিখে রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিলের সূচনা হয়, সেকথা স্বয়ং আল কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আমাদের অবগত হওয়া দরকার। কোন্ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেকথা কুরআনই সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে : 'সেটি রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।'

কুরআন দিনে নাযিল হয়েছে নাকি রাতে? সে বিষয়েও কুরআনের বক্তব্য সুস্পষ্ট : 'অবশ্যি আমি এ (কুরআন) এক পুণ্যময় রাতে অবতীর্ণ করেছি।'

কুরআন যে রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সেকথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই মহাসম্মানিত রাত কোন্‌টি? কোন্‌টি সেই কদর রাত, সেই পুণ্যময় রাত?

সে রাত রমযান মাসের কোন্ রাত? কতো তারিখের রাত? সেকথা আমাদের জানিয়ে গেছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. নিজে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত হাদিস সমূহ নিম্নরূপ :

---

১৫. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ০২।

১৬. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।

১. আবু দাউদে আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. কদর রাত সম্পর্কে বলেছেন, সেটি রমযানের সাতাশ বা ঊনত্রিশের রাত।

২. মুসনাদে আহমদে আবু হুরাইয়া রা. থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : 'কদর রাত রমযানের শেষ রাত।'

৩. মুসনাদে আহমদে উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : রমযানের শেষ দশ রাতের বিজোড় অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ কিংবা ঊনত্রিশতম রাতের মধ্যে রয়েছে কদর রাত।

৪. বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ও মুসনাদে আহমদে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কদর রাত রমযানের শেষ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে সন্ধান করো।

কুরআন রমযান মাসের কত তারিখে নাযিল হয়েছে, সে ব্যাপারে উপরোক্ত হাদিসগুলো আমাদের একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সে নির্দেশনা হলো, কুরআন নাযিল হয়েছে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো একটি বিজোড় রাতে। সে রাত হতে পারে একুশ, কিংবা তেইশ, অথবা পঁচিশ বা সাতাইশ, নতুবা ঊনত্রিশের রাত।

উপরোক্ত বিজোড় তারিখগুলোর কোনো একটিকে রসূলুল্লাহ সা. কুরআন নাযিলের সুনির্দিষ্ট তারিখ বলে উল্লেখ করেননি। ঐ তারিখগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে কুরআন নাযিলের তারিখ। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সা. নিজেও ঐ রাতের সন্ধানে রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করতেন।

৬. কুরআন নাযিল হয় কোন্ সনে?

সৌরবর্ষ এবং চান্দ্র বর্ষের হিসাব মিলাতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিলের সন তারিখ এবং তখন রসূল সা.-এর বয়স কতো ছিলো সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সব মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি ছিলো ৪১ হস্তী সনের রমযান মাস। আর রসূল সা.-এর জন্ম হয় ১ হস্তী সনের রবিউল আউয়াল মাসে।

৪১ হস্তী সনের ২১ বা ২৭ রমযান কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধরা হলে তা ছিলো খৃস্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৬১০ খৃস্টাব্দের ৬ বা ১৩ আগস্ট।

এ হিসেবে সে সময় রসূল সা.-এর বয়স ছিলো ৪০ বৎসর ৬ মাস ১৬ বা ২৩ দিন। তবে আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ ৫

আল কুরআন নাযিলের শুভ সূচনা

১. মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিলের পূর্ব ঘটনা

ইতিহাস সাক্ষী, সমাজের সর্বমহলে একথা স্বীকৃত এবং সুপরিচিত ছিলো যে, আখেরি নবী মুহাম্মদ সা. কৈশোর এবং যৌবনে নবী হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বভাবগতভাবেই ছিলেন একজন সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ। মানুষের কল্যাণকামী। ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

স্বভাবগতভাবেই মুহাম্মদ সা. ছিলেন এসব গুণাবলীর অধিকারী। সমাজের সর্বত্র তাঁর এসব গুণাবলী ছিলো সুপরিচিত।

তিনি দু:খী মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। এতিম এবং বিধবাদের সর্বাত্মক সাহায্য করতেন। মযলুমদের সহায়তা করতেন। বিরোধ মীমাংসা করে দিতেন। মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। অক্ষমদের উপার্জন করে দিতেন। মানুষের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিতেন। সবার সাথে কোমল ব্যবহার করতেন। সদা সর্বদা সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং ন্যায়পরায়নতার নীতিতে অটল থাকতেন।

কিন্তু তাঁর এসব মহত গুণাবলী, সৎকর্ম এবং মানব কল্যাণের ভূমিকা দ্বারা সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ, অজ্ঞতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি দূর হয়নি। সেজন্যে তিনি আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় আল্লাহমুখী হয়ে পড়েন।

২. নির্জনপ্রিয়তা ও ধ্যান

তরুণ বয়স থেকে মুহাম্মদ সা. নির্জনপ্রিয় ও চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি ঝগড়া বিবাদ, যুদ্ধ কলহ, খেল তামাশা, পূজা পার্বন ও নাচগানের অনুষ্ঠানে ছোট বেলা থেকেই যোগদান করতেন না। তাঁর বয়স যতোই বাড়ছিল, ততোই তিনি ধ্যান ও চিন্তাভাবনার জগতে প্রবেশ করছিলেন। কোলাহল থেকে দূরে অবস্থান নিচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে ধ্যান ও চিন্তাশীলতা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

তাঁর ছিলো বিরাট ব্যবসা বহর। দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সততা ও দক্ষতার কারণে প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিকও ছিলেন তিনি। ছিলো সুখের সংসার। বুদ্ধিমতী পরম বন্ধু ও সহযোগী স্ত্রী ছিলো তাঁর। তিনি প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন জনগণের। শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো। ভোগ বিলাস আর আনন্দ বিহারের সুযোগ ছিলো।

সুখী থাকার এবং দুনিয়াকে ভোগ করার সব সুযোগই তাঁর ছিলো। সমাজের সর্দারি পাবার সুযোগও ছিলো। কিন্তু এসব কিছুর আকর্ষণের উপর তাঁর জীবনে আরেকটি আকর্ষণ প্রভাব বিস্তার করে। সে আকর্ষণ তাঁকে গভীর ধ্যান ও চিন্তার জগতে নিয়ে যায়।

তাঁর সে আকর্ষণ ছিলো মানুষ ও মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনের আকর্ষণ। প্রকৃত সত্যের পর্দা উন্মোচনের আকর্ষণ। সে আকর্ষণ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে :

- আমি কে? মানুষ কে? কে সৃষ্টি করেছে মানুষকে?
- এই মহাবিশ্ব, এই মহাকাশ কে সৃষ্টি করেছে?
- কে সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবী? চাঁদ? সূর্য? নক্ষত্ররাজি?
- কে এই সব কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, প্রভু, নিয়ন্ত্রক?
- কেন মানুষ প্রতিমা পূজা করবে? কেন পূজা করবে কোনো সৃষ্টির?
- মানুষ, পৃথিবী, চাঁদ, সুর্য ও নক্ষত্ররাজি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি না হয়ে অন্য কিছু মানুষের উপাস্য হবে কেন?
- সেই মহান স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালকের উপাসনা করার পন্থা কী?
- তাঁকে চেনার জানার এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় কি?
- মানুষকে পাপ পংকিলতা, অন্যায় ও হানাহানি থেকে মুক্ত করার উপায় কি?
- মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় কি?

এসব চিন্তা তাঁকে গভীর ধ্যানে মগ্ন করে। চিন্তার গভীরে তিনি ঢুকে পড়েন। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশে গড়াবার পর থেকে তাঁর মধ্যে সমস্ত বৈষয়িক চিন্তা গৌন হয়ে পড়ে। সৃষ্টির উৎস, সৃষ্টির পরিণতি, প্রকৃত উপাস্য, উপাস্যের প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাঁর মধ্যে দুর্জয় প্রভাব বিস্তার করে।

৩. হেরা গুহায়

কাবার লাগভাগ পূর্বপাশেই বিশ্বনবীর বাড়ি। এখান থেকে মাইল তিনেক পূর্ব দিকে একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টির বর্তমান নাম 'জাবালুন নূর' বা 'জ্যোতির পাহাড়'। পাহাড়টির পশ্চিম প্রান্তে এর সর্বোচ্চ চূড়া অবস্থিত। এ চূড়ায় একটি গুহা আছে। গুহাটির নাম 'হেরা গুহা'। সেকালে এ গুহাটিতে কেউ পশ্চিমমুখী হয়ে বসলে, সে এক দৃষ্টিতে কাবা ঘর দেখতে পেতো। অবশ্য উঁচু উঁচু দালান কোঠা নির্মাণের কারণে এখন আর সেখান থেকে কা'বা দেখা যায় না।

বিশ্বনবী নির্জন ধ্যান ও চিন্তাভাবনা করার জন্যে এ গুহাটিকে বেছে নেন। নবুয়্যত লাভের বছর তিনেক পূর্ব থেকেই তিনি প্রতি বছর রমযান মাস এ গুহাটিতে কাটাতেন। এখানে বসে বসে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতেন। হাদিসে এটাকে বলা হয়েছে 'তাহান্নুছ'। তাহান্নুছ মানে- নির্জন ধ্যান। 'তাহান্নুছ'কে এক স্রষ্টার ইবাদত বলেও অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর প্রকৃত ব্যাপারও ছিলো তাই। একমাত্র স্রষ্টাকে জানার এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা ভাবনাই তিনি এখানে বসে বসে করতেন।

হেরা গুহায় যাবার সময় তিনি কখনো পুরো মাসের খাবার নিয়ে যেতেন। কখনো কিছুদিনের খাবার নিয়ে যেতেন। খাবার শেষ হলে পুনরায় এসে খাবার নিয়ে

যেতেন। কখনো কখনো প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা পাহাড়ে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতেন। হেরা গুহায় উঠা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক শক্তিশালী পুরুষও সেখানে উঠার সাহস করেনা। আবার অনেকে উঠে।

হেরা গুহায় বিশ্বনবীর ধ্যান ও চিন্তামগ্নতা কখনো এতো গভীর ও প্রগাঢ় হতো যে, খাওয়া দাওয়া, এমনকি নিজের সম্পর্কেও কোনো প্রকার চেতনা থাকতনা। নির্জন হেরা গুহায় তাঁর অন্তরদৃষ্টিতে ভেসে উঠতো, সত্যের উপর যেনো জাহেলিয়াতের মেকি আবরণ পড়ে আছে, মানুষ যেনো ভিত্তিহীন কল্পনার চাদর দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছে।[১]

৪. সত্য স্বপ্ন

বিশ্বনবী সা. হেরা গুহায় এতোটাই চিন্তামগ্ন হতেন যে, এতে তাঁর কোমর ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। কারণ চিন্তার এ বোঝা কোনো হাল্কা ছিলোনা। জাতির অজ্ঞতা এবং জাহেলি কর্মকান্ড দেখে দু:খ, বেদনা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের দুরূহ বোঝা তাঁর সংবেদনশীল মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। জাতির মূর্তিপূজা, শিরক, কুফর, কুসংস্কার, নৈতিক পংকিলতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, কন্যাদের জীবন্ত দাফন করা, যুলুম, অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, কলহবিবাদ, হানাহানি, রক্তারক্তি, অশান্তি, অরাজকতা, নিরাপত্তাহীনতা তাঁকে ভীষণভাবে মর্মপীড়িত করে তোলে। এ অধ:পতন থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোনো পথই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।[২]

তিনি গভীর ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হয়ে জাতির মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। প্রকৃত সত্য লাভের চিন্তায় বিভোর হচ্ছিলেন। এ সময় প্রায়ই তিনি স্বপ্ন দেখতেন। উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, আমার খালা আয়েশা রা. বলেছেন : 'এ সময় রসূলুল্লাহ সা. যে স্বপ্নই দেখতেন, তা হতো সকালের সূর্যের মতোই সত্য ও বাস্তব।'[৩]

এ সময় প্রায়ই তিনি স্বপ্ন দেখতেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে যা দেখতেন, জাগ্রত হয়ে নিজ চোখে স্বপ্নের বাস্তবতা দেখতে পেতেন। এভাবে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নবুয়্যতের পূর্বাভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান ও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে এ সময় তাঁর মন মানসিকতায় মহাসত্য উদ্ভাসিত হতে থাকে। এর আলোকে তিনি উপলব্ধি করেন পৃথিবীর এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার ধনদৌলত, ঐশ্বর্য এগুলো মূল্যহীন।

এ সময় ধীরে ধীরে তাঁর চিন্তাশক্তি স্বচ্ছতার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তিনি দিবালোকের মতো উপলব্ধি করেন আল্লাহই সর্বশক্তিমান। তিনি এক, একক,

---

১. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল : হায়াতু মুহাম্মদ।
২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম (মূল উর্দূ) ২য় খণ্ড।
৩. সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম।

অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি পরম দয়ালু। বিশ্বজগতের তিনি প্রতিপালক। মানুষের ভালো মন্দ কৃতকর্মের ফল ভোগ করা অবধারিত। সৎকর্মশীল তার সৎকর্মের শুভ ফল লাভ করবে। পাপিষ্ঠ অপরাধী অবশ্যি তার পাপের শাস্তি ভোগ করবে। জান্নাত জাহান্নাম মহাসত্য। যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে, তার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত।

নবুয়্যত লাভের আর মাত্র ছ'মাস বাকি। হেরা গুহায় তাঁর অহর্নিশি ধ্যান চলছে। সত্য স্বপ্ন দেখছেন। মিথ্যা বাতিলের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রবল আকার ধারণ করে। এ সময় আল্লাহ তায়ালা মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ সা.-এর হৃদয়-মনকে শাশ্বত সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে দেন। মহাসত্য ধারণ করার জন্যে তাঁর মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে উৎকর্ষতা দান করেন। এ পর্যায়ে এসে তাঁর দিল দয়াবান আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়। তিনি কায়োমন বাক্যে এক আল্লাহর দিকে রুজু হন। গোমরাহি থেকে জাতির মুক্তির জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন।

এ সময় রাতের পর রাত তিনি বিনিদ্র কাটিয়ে দিতেন। দিনের পর দিন রোযা রাখতেন। কখনো হেরা গুহা থেকে বের হয়ে পাহাড়ের মরু কঙ্করে পায়চারি করতেন। এভাবে ছ'মাস তিনি গুহায় কাটিয়ে দেন।

এক পর্যায়ে নিজের এই চিন্তাধারার পরিণতির কথা ভেবে তিনি ভীত কম্পিত হয়ে উঠেন। ফলে বাড়ি ফিরে এসে পরম বন্ধু ও সহযোগী স্ত্রী খাদিজাকে নিজের সব অবস্থা খুলে বলেন। সেই সাথে নিজের আশংকার কথাও খাদিজাকে খুলে বলেন। খাদিজা তাঁকে সাহস দেন। খাদিজা বলেন, 'আপনি মহাবিশ্বাসী, কেউ আপনার ক্ষতি করার সাহস পাবেনা।' তিনি ফিরে যান গুহায়। মগ্ন হয়ে পড়েন ধ্যান, চিন্তা ও প্রার্থনায়। সত্য দর্শন ও সত্য উপলব্ধিতে তাঁর হৃদয়-মন উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এ সময় সত্য লাভের তীব্র আকাংখায় তিনি ব্যাকুল।[৪]

৫. পড়ো তোমার প্রভুর নামে

রমযান মাসের এক মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত রাত। স্থান- হেরা গুহা। মানবতার মুক্তিদূত মানবতার মুক্তি চিন্তায় বিভোর। ধীরে ধীরে তাঁর চোখে নেমে এলো তন্দ্রা....নিদ্রা।

হঠাৎ গুহায় আবির্ভূত হলেন বিশ্ব জগতের অধিকর্তার দূত জিবরিল আমিন। তাঁর হাতে একটি রেশমি কাপড়। তাতে উৎকীর্ণ আছে কিছু বাণী।

স্বয়ং বিশ্বনবী সা. বলেন, এ সময় আমি ছিলাম ঘুমে। জিবরিল রেশমি বস্ত্রে লিখিত বাণী আমার সামনে উন্মুক্ত করে বলেন : اِقْرَأْ 'পড়ুন'। আমি বললাম : مَاأَنَا بِقَارِئٍ 'আমি পড়তে জানিনা'।

---

৪. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল : হায়াতু মুহাম্মদ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড।

জিবরিল তখন আমাকে সজোরে আলিংগন করেন। এতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। অতপর ছেড়ে দিয়ে বলেন : 'পড়ুন'। আমি বললাম : আমি পড়তে জানিনা।

ফলে জিবরিল পুনরায় আমাকে ঝাপটে ধরেন। এতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ছেড়ে দিয়ে বলেন : 'পড়ুন'। আমি বললাম : আমি কী পড়বো?

এবারো তিনি ভীষণ জোরে আমাকে বুকে চেপে ধরেন। এতে আমার এতোই কষ্ট হয় যে, আমি আশংকা করছিলাম, দম বন্ধ হয়ে আমি মারা যাবো। অতপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন'।

আমি বললাম : আমি কী পড়বো? একথা এজন্যে বললাম, যাতে ফেরেশতা আমাকে পুনরায় চেপে না ধরেন। এবার তিনি বললেন :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۝

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শক্তভাবে আঁটকানো জিনিস থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রভু বড়ই দয়াবান মহিমামণ্ডিত। তিনি শিক্ষা দান করেছেন কলমের সাহায্যে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতোনা।' (সূরা ৯৬ আল আলাক : আয়াত ১-৫)

এবার আমি সাথে সাথে বাণীগুলো পড়ে ফেললাম। জিবরিল চলে গেলেন। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। দেখলাম, ঐ পাঁচটি বাক্য আমার হৃদয়পটে অংকিত হয়ে গেছে।[৫]

রসূলুল্লাহ সা. দেরি না করে অবিলম্বে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীর কাঁপছে। তিনি ভাবছেন, ইনি কে? কেন আমাকে চেপে ধরলেন? কেন আমাকে পড়তে বাধ্য করলেন? ইনি কে, যিনি আমাকে আমার প্রভুর নামে পড়তে বললেন? এভাবে আগুন্তুক সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং ভীতি নিয়ে গুহা থেকে আনমনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হন।

রসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি এগুতে এগুতে পাহাড়ের মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ আকাশের দিক থেকে আওয়ায ভেসে এলো : 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরিল।'

আমি আকাশের দিকে তাকাতেই দেখি, জিবরিল আকাশের এক প্রান্তে স্থির হয়ে আছেন। তিনি বলছেন : 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আমি জিবরিল।' -আমি শূন্যলোকের যেদিকেই তাকাই, দেখি, সবদিকে, সর্বত্র জিবরিল বিদ্যমান। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফেরেশতার অপরূপ সুন্দর আকৃতি আমি কিছুতেই দৃষ্টির আড়াল করতে পারছিলাম না। আমি অনেকক্ষণ হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অতপর ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি থেকে জিবরিল বিলীন হয়ে যায়।

---

৫. সীরাতে ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, সুহায়লি, তাবারি। বুখারিতে আয়েশা রা. থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে, তাতে জিবরাইলের আগমনের সময় রসূল সা. ঘুমে ছিলেন বলে বর্ণিত হয়নি।

এদিকে স্বামীর কল্যাণ চিন্তায় অধীর খাদিজা কয়েকজন দাসদাসীকে পাঠান স্বামীর খোঁজ খবর নিয়ে আসতে। ওরা এসে গুহায় খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যায় খাদিজার কাছে। খাদিজা ব্যাকুল হয়ে উঠেন স্বামীর জন্যে।

দৃশ্যপট থেকে ফেরেশতা বিলীন হয়ে যাবার পর আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় প্রিয় নবী সা. দ্রুত খাদিজার কাছে ফিরে আসেন। ঘরে ঢুকেই তিনি সবাইকে বলতে থাকেন : 'আমাকে কাপড় জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' তাঁরা দ্রুত তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দিলেন। এ সময় তিনি জ্বরাক্রান্তের মতো কাঁপছিলেন।

অতপর তাঁর আতঙ্ক অবস্থা প্রশমিত হয়ে এলে ব্যাকুল খাদিজা তাঁকে শুধান : হে আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনাকে খোঁজার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম। ওরা খোঁজাখুঁজি করে আপনাকে কোথাও পায়নি। আপনার কী হয়েছে? কী হয়েছে আপনার? [৬]

এতোক্ষণে তাঁর ভয় ও আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর ভেতরে একটা শংকা রয়েই গেছে। তিনি খাদিজার কাছে সে আশংকা ব্যক্ত করেন। বলেন, খাদিজা! আমার কী হয়ে গেলো? অতপর হেরা গুহায় যা ঘটেছে, তিনি সব ঘটনা খাদিজাকে খুলে বলেন। তারপর বলেন : 'খাদিজা! আমি আমার জীবনের আশংকা করছি।'[৭]

খাদিজা : 'না, কখনো নয়। আল্লাহর কসম কখ্খনো নয়! কিছুতেই আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি তো আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, আমানত রক্ষা করেন, অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন, নি:স্ব লোকদের উপার্জন করে দেন, মেহেমানদারি করেন, সৎকর্মে সহযোগিতা করেন। যে ঘটনা ঘটেছে এটা সুখবর। এতে আপনার শংকার কোনো কারণ নেই, এর জন্যে আপনি খুশি হয়ে যান।'

অতপর খাদিজা নিজেকে ভালো করে কাপড় চোপড় দিয়ে আবৃত করে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে নিয়ে যান চাচা অরাকা বিন নওফেলের কাছে। এ সময় অরাকা বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা অরাকাকে বললেন : চাচা! আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন।

অরাকা : ভাতিজা! তুমি কী দেখতে পেয়েছো?

মুহাম্মদ সা. অরাকাকে সব ঘটনা খুলে বলেন।

অরাকা : ভাতিজা! তোমার কাছে যিনি এসেছেন, তিনি হলেন সেই অহি বহনকারী ফেরেশতা, যিনি মূসার কাছেও অহি নিয়ে এসেছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়্যতের সময় বলবান থাকতাম! হায়! আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দেবে!

---

৬. সীরাতে ইবনে হিশাম : ১ম খণ্ড। ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল : হায়াতু মুহাম্মদ।

৭. সহীহ আল বুখারি, অহির সুচনা অধ্যায়।

মুহাম্মদ সা. : 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'

অরাকা : হ্যাঁ, তারা তোমাকে বের করে দেবে। এমন কখনো হয়নি, তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছো, অতীতে তা নিয়ে কেউ এসেছে, অথচ তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি, তবে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করবো।[৮]

৬. বুদ্ধিমতী খাদিজার অনন্য কৌশল

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, প্রথম অহি নাযিলের পর মুহাম্মদ সা. কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের নবুয়্যত ও রিসালাত লাভের বিষয়ে প্রশান্তিসহ পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি। এ সময় তিনি প্রায়ই জিবরিলকে আকাশে দেখতে পেতেন। জিবরিল তাঁকে ডেকে বলতেন: 'হে মুহাম্মদ! আপনি অবশ্যি আল্লাহর রসূল, আমি জিবরিল বলছি।'

মুহাম্মদ সা. এ ঘটনাটিও খাদিজাকে অবহিত করেন। ঘটনা শুনে খাদিজা এক অভিনব ও অনন্য কৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রিয় স্বামীকে বলেন, 'এরপর আবার যখন জিবরিল আপনার কাছে আসবেন এবং আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন, তখন আমাকে জানাবেন।'

অতপর যথারীতি তিনি জিবরিলকে দেখতে পেলেন। খাদিজাকে ডেকে বললেন, 'খাদিজা! এই তো জিবরিল এসেছেন।' খাদিজা বলেন, 'আপনি উঠে এসে আমার বাম উরুর উপর বসুন।' মুহাম্মদ সা. তাই করলেন।

খাদিজা : এখন কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?

মুহাম্মদ সা. : হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

খাদিজা : 'এবার আমার ডান উরুর উপর বসুন।' রসূলুল্লাহ সা. তাই করলেন।

খাদিজা : এখন কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?

মুহাম্মদ সা. : 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' খাদিজা এবার স্বামীকে নিজের কোলের উপর এনে বসালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?'

রসূলুল্লাহ সা. : হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

এবার খাদিজা নিজের ঘাড়ের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ঘাড় ও গলার নিচের কিছু অংশ অনাবৃত করলেন। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর কোলেই বসা ছিলেন। খাদিজা জিজ্ঞেস করেন : 'এখনো কি তাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

এবার রসূলুল্লাহ সা. বলেন : না, এখন দেখতে পাচ্ছিনা।

খাদিজা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেন : 'হে আমার চাচাতো ভাই! আপনি নিশ্চিত হোন, আপনি আনন্দিত হোন, আল্লাহর শপথ! আপনার কাছে যিনি আসেন, তিনি অবশ্যি ফেরেশতা, শয়তান নয়। কারণ শয়তান হলে আমার

৮. সহীহ আল বুখারি, অহির সূচনা অধ্যায়, বর্ণনা : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

শরীরের অনাবৃত অংশ দেখে লজ্জায় দূরে সরে যেতনা, বরং তাকিয়ে থাকতো।'

স্বামীর কাছে ফেরেশতা আসে নাকি শয়তান, তা নিশ্চিত হবার জন্যে কী চমৎকার কৌশল অবলম্বন করলেন খাদিজা। সত্যি খাদিজার সাথে অন্য কোনো নারীরই তুলনা হয়না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং গুণগরিমার সাথেও কারো তুলনা হয়না। সর্বদিক থেকে খাদিজাই অনন্য-অনুপম। তাইতো তিনি হবেন জান্নাতি মহিলাদের নেত্রী।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী খাদিজা নিজেই গিয়ে অরাকার কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। সব ঘটনা আদ্যপ্রান্ত শুনার পর অরাকা বলে উঠেন : খাদিজা! তুমি আমাকে যা শুনালে তা যদি সত্য হয়, তবে মুহাম্মদের কাছে আল্লাহর সেই দূতই এসেছেন, যিনি মূসার কাছেও আসতেন। খাদিজা! মুহাম্মদ যে এ উম্মতের নবী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি তাকে দৃঢ় ও নিশ্চিত থাকতে বলো।[৯]

হেরা গুহায় এই প্রথম অহি অবতীর্ণের সময় মুহাম্মদ সা.-এর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস।[১০]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, একদিন কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় অরাকা বিন নওফেল এসে মুহাম্মদ সা.-এর সাথে সাক্ষাত করে হেরা গুহার ঘটনাবলী শুনেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহর রসূল বলে ঘোষণা করেন এবং জীবিত থাকলে তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এ সময় কথাবার্তার এক পর্যায়ে অরাকা মুহাম্মদ সা.-এর একেবারে কাছাকাছি এগিয়ে আসেন এবং তাঁর পবিত্র ললাটে চুমু দেন। এর কিছুদিন পরই অরাকা মারা যান। অতপর কিছুদিনের জন্যে অহি অবতীর্ণ বন্ধ থাকে।[১১]

৭. কুরআন নাযিল : বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য ঘটনা

মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ আমাদের এ পৃথিবী। এ পৃথিবীতে বসবাস করার জন্যে মহান আল্লাহ যেদিন থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, মানুষের জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে আল কুরআন নাযিলের ঘটনা।

কুরআন নাযিলের পূর্বেও আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে তাঁর বাণী ও কিতাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেসব বাণী স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো। অর্থাৎ সেসব কিতাব আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোনো এলাকার জন্যে পাঠিয়েছেন, বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর জন্যে পাঠিয়েছেন এবং একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে

৯. সীরাতে ইবনে হিশাম : ১ম খণ্ড।
১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : সীরাতে সরওয়ারে আলম, মূল উর্দু, ২য় খণ্ড।
১১. সহীহ আল বুখারি, অহির সূচনা অধ্যায়।

পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সেসব কিতাব সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেননি। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর সেসব কিতাব পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

কিন্তু আল কুরআনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিস্ময়কর। আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থকে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারবেনা, এমনকি এতে কেউ বিন্দুমাত্র বিকৃতি পর্যন্ত ঘটাতে পারবেনা। এ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সুসংরক্ষিত। আল কুরআন স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে জীবন বিধান।

আল কুরআন নাযিলের ঘটনাটি বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনন্য সাধারণ ঘটনা। কারণ :

০১. আল কুরআন মানুষের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

০২. আল কুরআন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেতু বন্ধন।

০৩. আল কুরআন মানুষের স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী। আল কুরআন পাঠকালে মানুষ নিজ মুখে সরাসরি আল্লাহর বাণী উচ্চারণ করে এবং যেনো আল্লাহরই সাথে কথা বলে।

০৪. আল কুরআন নির্দেশিত সকল তত্ত্ব, তথ্য, বিধান ও জীবন যাপন ব্যবস্থা বাস্তব, নির্ভুল ও অকাট্য সত্য।

০৫. আল কুরআন বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র গ্রন্থ, যার কোনো বক্তব্যকেই চ্যালেঞ্জ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো দিক থেকেই একে অতিক্রম করতে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম। এটি শাশ্বত অনির্বাণ

০৬. মানুষের যিনি স্রষ্টা, আল কুরআন মানুষের জন্যে তাঁরই প্রদত্ত জীবন বিধান ও জীবন যাপন পদ্ধতি। কুরআন মানুষের জন্যে স্রষ্টার দেয়া বিধি।

০৭. আল কুরআন স্রষ্টার ইচ্ছা ও নির্দেশিত পদ্ধতিতে জীবন যাপন করার একমাত্র আগা-গোড়া নির্ভুল গাইড বুক।

০৮. আল কুরআনই মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণকারী একমাত্র গ্রন্থ। যারা এ গ্রন্থকে মানবে ও অনুসরণ করবে, পরজীবনে আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন এবং মহা পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

০৯. যারা আল কুরআনকে মানবেনা এবং এর ভিত্তিতে জীবন যাপন করবেনা, পরকালে আল্লাহ তায়ালা তাদের কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন। তাদের রক্ষা করবার কেউ থাকবেনা।

১০. আল কুরআনকে মানা ও না মানার ভিত্তিতে বিশ্ববাসী দুই ভাগে বিভক্ত। কুরআনকে মান্যকারীরা আল্লাহর দল আর অমান্যকারীরা শয়তানের দল।

১১. কুরআনে বিশ্বাসী ও কুরআন অনুসারিরা মু'মিন ও মুসলিম। পক্ষান্তরে

কুরআন অস্বীকার ও অমান্যকারীরা কাফির। কুরআন মান্যকারীরা সৌভাগ্যবান। আর অমান্যকারীরা দুর্ভাগা।

১২. পৃথিবীর মানুষের জন্যে এই পৃথিবীতে কুরআনের চাইতে বড় সম্মানিত, মর্যাদাবান ও পুণ্যময় আর কিছুই নেই। কারণ এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাণী। একটি রাতে এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণের সূচনা হবার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সে রাতকে 'লাইলাতুল কদর' এবং 'লাইলাতুম, মুবারাকা' আখ্যায়িত করে মর্যাদাবান করেছেন।

১৩. যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু করেছে, সে রাতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাজার মাসের চাইতে উত্তম রাত বলে ঘোষণা করেছেন।[১২] যে কুরআনের কারণে একটি রাতের এতো বড়ো মর্যাদা হলো, সে কুরআনের মর্যাদা যে কতো বড়, কতো মহান তা কি আর খতিয়ান দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে?

১৪. কুরআন নাযিলের রাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন : এ রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে থাকে।[১৩]

১৫. মানুষের জ্ঞান যতোই বিকশিত হচ্ছে, মানুষ নিজের সম্পর্কে ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে যতোই গবেষণা করছে, যতোই নতুন নতুন আবিষ্কার করছে, ততোই আল কুরআনের সত্যতা ও বাস্তবতা অকাট্যভাবে সুপ্রমাণিত হচ্ছে। এ বিশ্বে কি আল কুরআন ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থ আছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে যার তত্ত্ব, তথ্য, বর্ণিত বিধান ও নির্দেশনা সত্য, নির্ভুল, অকাট্য, যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হচ্ছে?

১৬. আল কুরআন তার জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্বে সংঘটিত করেছে এক নজীরবিহন অনন্য অনুপম বিপ্লব। এ বিপ্লব ছিলো একাধারে চিন্তা, চরিত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব। বিশ্ব ইতিহাসে এমন সুন্দর, ন্যায়, শান্তিপূর্ণ, কার্যকর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী পূর্ণাংগ বিপ্লব আর দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয়নি।

১৭. কুরআন তার জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিশ্বকে যে সুসমাজ ও সুশাসন উপহার দিয়েছিল, এমন সোনার মানুষ, এমন সুন্দর সমাজ এবং এমন সুশাসন পৃথিবীকে অন্য কেউ উপহার দিতে পারেনি।

১৮. কুরআনের বক্তব্য চির শাশ্বত। কুরআন সর্বকালের সর্বাধুনিক এবং সর্বোচ্চ জ্ঞানের উৎস। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে কেবলই উজ্জ্বল করে।

১৯. কুরআন সর্বযুগেই তার জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম। সপ্তম শতাব্দীতে সে যেমন বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম ছিলো, এই

---

১২. দেখুন : আল কুরআন, সূরা ৯৭ : আল কদর।

১৩. আল কুরআন, সূরা ৪৪ আদ দুখান : আয়াত ২-৪।

একবিংশ শতাব্দীতেও সেই বিপ্লব সাধন করতে সে সক্ষম এবং পরবর্তী যে কোনো শতাব্দীতেও সক্ষম।

২০. কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। পৃথিবীর সকল অঞ্চলেরই ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে কুরআন পাঠ করে এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে। প্রতিদিনই কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তফসির লেখা হচ্ছে, রচিত হচ্ছে কুরআন ভিত্তিক গ্রন্থ, প্রকাশিত হচ্ছে কুরআন ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও জার্নাল। তাছাড়া প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হয় কুরআন ভিত্তিক আলোচনা সভা, সেমিনার, তফসির মহফিল। বিশ্বে আর কোনো গ্রন্থকেই প্রতিদিন এতো অধিক চর্চা করা হয় না।

২১. আল কুরআনের আরেকটি বিস্ময়কর ও অনন্য আকর্ষণ হলো, প্রতিদিন হাজারো লাখো মানুষ এ গ্রন্থকে স্মৃতিতে ধারণ করছে। হাজারো লাখো শিশু যুবক বৃদ্ধ নারী পুরুষ প্রতিদিন মুখস্ত করে চলেছে আল কুরআন। অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণ কুরআনকে স্মৃতিতে ধারণ করে প্রতিদিন পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছেন অসংখ্য হাফেযে কুরআন! আদ্যপ্রান্ত কোনো গ্রন্থকে সর্বযুগে এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের স্মৃতিতে ধারণ করার বিষয়টি রীতিমতো এক মহাবিস্ময়।

২২. বিস্তৃত, সংক্ষিপ্ত, কিংবা সাংকেতিকভাবে হলেও সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্দেশনাই আল কুরআনে রয়েছে। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচিকাকেন্দ্র। ঈমান, ইবাদত, ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, আইন, আদালত, অর্থ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, প্রকৃতি, পদার্থ, সমুদ্র, সময়, মহাকাশ ও নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই নির্দেশনা আল কুরআনে রয়েছে। এদিক থেকেও আল কুরআন অনন্য গ্রন্থ।

২৩. পৃথিবীতে আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা থেকে মানুষ জানতে পারে তার সঠিক পরিচয় কি? কে তাকে সৃষ্টি করেছেন? কেন সৃষ্টি করেছেন? কে তার স্রষ্টা? কি তাঁর সঠিক পরিচয়? মানুষের শেষ পরিণতি কি? মৃত্যুর পর কি হবে? ইহ জীবন ও পরজীবনে শান্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভের উপায় কি? এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব একমাত্র আল কুরআনই দিয়েছে। আল কুরআন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবেনা এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব আর নির্ভুল নির্দেশনা।

তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট যেদিন আল কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়, সেদিনই মূলত বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। আল কুরআন নাযিলের এই ঘটনা বাস্তবিকই বিশ্ব ইতিহাসের অনন্য, অনুপম ও অসাধারণ এক ঘটনা। মানুষকে তার জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত এই আল কুরআনের প্রতি।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ ৬

আল কুরআন : প্রথম ও শেষ অহি কোন্‌টি

১. প্রথম অহি কোন্‌টি?

অহি আগমনের সূচনায় মুহাম্মদ সা. প্রথমত সত্য স্বপ্ন দেখতেন।[১] অতপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস পূর্ণ হলো, তখন রমযান মাসের[২] এক সম্মানিত রাতে[৩] হঠাৎ তাঁর প্রতি অহি নাযিল হয় এবং তা ছিলো সূরা আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ○
الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ○

অর্থ: পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শক্তভাবে আটকে থাকা পিণ্ড থেকে। পড়ো! আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। এমন জ্ঞান মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানতো না।[৪]

২. প্রথম অহির বক্তব্য কী?

জিবরিল আমীন হেরা গুহায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যে পাঁচটি (সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি) আয়াত বিশ্বনবী সা.-এর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, সে পাঁচটি আয়াতের মূল বক্তব্য কি? হ্যাঁ, সে পাঁচটি আয়াতের বক্তব্য ও তাৎপর্য নিম্নরূপ :

আয়াত-১ : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমার প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।'

- এ আয়াতের পয়লা নির্দেশিকা হলো, হে মুহাম্মদ! তুমি যে মহান আল্লাহকে তোমার প্রভু বলে জানো এবং মানো, প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমার প্রভু। তাঁকেই একমাত্র প্রভু বলে মানার তোমার যে সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত সঠিক ও নির্ভুল।

- এ আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'পড়ার।' একথা চির শাশ্বত এবং সকলেরই জানা যে, পড়ার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন করা। পড়া হলো জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম। কাউকেও পড়ার নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়ার অর্থ হলো তাকে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়া। এখানেও প্রথম অহির প্রথম বাক্যেই

---

১. সহীহ আল বুখারী, ১ম খন্ড, অহির সূচনা অধ্যায়।
২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত : ১৮৫।
৩. আল কুরআন, সূরা ৯৭ আল কদর : আয়াত : ১।
৪. আল কুরআন, সূরা ৯৬ আল আলাক : আয়াত : ১-৫।

মুহাম্মদ সা.-কে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকে নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

- এ আয়াতের তৃতীয় নির্দেশিকা হলো : 'তোমার প্রভুর নামে পড়ো।' অর্থাৎ তুমি যে জ্ঞানার্জন করবে, তা অর্জন করতে আরম্ভ করো তোমার প্রভুর নামে- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে। নিজ প্রভু আল্লাহ তায়ালার নামে জ্ঞানার্জন করা মানে- তিনি অহির মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করেছেন, সে জ্ঞানার্জন করো। সে জ্ঞানকেই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল মনে করো। তার বিপরীত এবং তার সাথে সাংঘর্ষিক সকল জ্ঞানকে ভ্রান্ত, বাতিল, অকল্যাণকর ও প্রত্যাখানযোগ্য মনে করো।

- এ আয়াতের চতুর্থ নির্দেশিকা হলো : 'প্রভুর পরিচয়।' অর্থাৎ তুমি যাকে প্রভু বলে জানো ও মানো তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী, পৃথিবীর সবকিছু এবং গোটা মহাবিশ্ব এমনিই সৃষ্টি হয়নি, তোমার প্রভুই এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি সবকিছুর স্রষ্টা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁরই নামে পড়তে আরম্ভ করো এবং তাঁকেই সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস মনে করো।

আয়াত-২ : দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : 'তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে দৃঢ়ভাবে আঁটকানো জিনিস থেকে।'

- এ আয়াতে দুইটি নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে।

- এ আয়াতের পয়লা নির্দেশিকা হলো, পৃথিবী ও গোটা মহাবিশ্বের সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তোমার প্রভু অন্যসব কিছুর মতোই মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন।

- অতপর এ আয়াতে মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

আয়াত-৩ : তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : 'পড়ো, আর তোমার প্রভু বড়ই দয়াবান মহিমামণ্ডিত।'

- এ আয়াতে সৃষ্টির মাঝে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমার প্রভু বড়ই দয়াময়, তিনি তাঁর অসীম কৃপা ও মহিমায় মানুষকে পড়ার ও জ্ঞানার্জন করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন। সুতরাং জ্ঞানার্জন এবং তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

আয়াত-৪ : এ আয়াতে বলা হয়েছে : 'তিনি (মানুষকে) শিক্ষা দান করেছেন কলমের সাহায্যে।'

কলম জ্ঞানের প্রতীক। কলম জ্ঞানার্জন, জ্ঞান দান, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান এবং গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার প্রতীক। সুতরাং এ আয়াতের তাৎপর্য হলো : আল্লাহ

তায়ালাই মানুষকে জ্ঞানার্জন, জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান সম্প্রচার ও সম্প্রসারণ এবং জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতি সাধনের যোগ্যতা দান করেছেন।

আয়াত-৫ : পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে : 'তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যা সে জানতো না।'

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো :

- মানুষ প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন ছিলো, কোনো কিছুই তার জানা ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই দয়া করে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

- মানুষ অন্যসব জীব জন্তুর মতো নয়। মহান স্রষ্টা অন্যসব সৃষ্ট জীবকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেননি। তিনি দয়া করে মানুষকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান না করলে মানুষের অবস্থা পশুর মতোই হতো।

- তিনি মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অজানাকে জানার যোগ্যতা দান করেছেন।

- কিন্তু চিন্তা, গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে মানুষের পক্ষে সব জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। স্রষ্টার সঠিক পরিচয় কি? তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলী কি? মানুষের উপর তাঁর অধিকার কি? তিনি কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন? কেন মানুষকে জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা দান করেছেন? কেন মানুষকে বিবেক ও বিচার ক্ষমতা দান করেছেন? মৃত্যুর পর কি মানুষকে জীবিত করা হবে? জীবিত করা হলে সে জীবনে মানুষের অবস্থা কি হবে? পৃথিবীর জীবনে স্রষ্টার ইচ্ছা মাফিক জীবন যাপনের পদ্ধতি কি? তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় কি? পৃথিবীর জীবনে কিভাবে জীবন যাপন করলে পরকালের জীবনে কল্যাণ লাভ করা যাবে? স্রষ্টার সাথে মানুষের কি সম্পর্ক? এসব কিছুই মানুষের অজানা বিষয়। চিন্তা গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা মহান আল্লাহরই অসীম কৃপা, তিনি অহির মাধ্যমে এবং মানুষের মধ্য থেকে নবী-রসূল নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে এসব অজানা বিষয় জানাবার ব্যবস্থা করেছেন। অহি ও নবুয়্যতের এই বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা।

৩. সর্বশেষ অহি (আয়াত) কোন্‌টি?

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন।[৫] ইবনে আব্বাস রা. বলেন : বিদায় হজ্বের সময় রসূল সা. হজ্ব সমাপ্ত করার পর আয়াতে কালালা অবতীর্ণ হয় : يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط

৫. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি : তাফসীরুল কবির, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৪৫।

অর্থ: তারা তোমার কাছে ফতোয়া চাইছে। তুমি বলো : আল্লাহ কালালাদের বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন যে, ...।[৬]

অতপর তিনি আরাফাতে অবস্থানকালে এ আয়াত নাযিল হয় :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[৭]

অবশেষে রসূল সা. হজ্ব শেষ করে মদিনায় রওয়ানা করলে পথিমধ্যে নাযিল হয় আল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। সেটি হলো :

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ق ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ○

অর্থ: আর সে দিনের বিপদকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। অতপর প্রত্যেককে তার কামাই অনুযায়ী পরিপূর্ণ ফল দান করা হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করা হবে না।[৮]

আবুস সাউদ তাঁর তফসিরে, ওয়াহেদি তার আসবাবুন নুযুলে, জালালুদ্দীন সুয়ূতি তাঁর আল ইতকানে বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস রা. থেকে একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইতকানে দু'একটি ভিন্ন মতেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত দলিলগুলো ছাড়াও আরো বহুসংখ্যক সহি হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী সূরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াতই নবী সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত বলে প্রমাণিত হয়।

❖❖❖

৬. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭৬।
৭. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ০৩।
৮. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৮১।

অনুচ্ছেদ ৭

আল কুরআনের হিফাযত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা

১. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ

কুরআন মজিদের অক্ষরে অক্ষরে হুবহু হিফাযত ও সংরক্ষণের বিষয়টি বিশ্বের এক অত্যাশ্চর্য বিষয়। মানুষের স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ মানুষের জীবন যাপন ব্যবস্থা সম্বলিত আল কিতাব পাঠিয়েছেন আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে, যিনি পাঠ করতেও জানতেন না, লিখতেও জানতেন না। ছয় হাজারের অধিক বাক্য সম্বলিত এই মহাগ্রন্থটি অটুট ক্রমধারায় কী সুনিপুণ পন্থায় তিনি সুরক্ষিত করে গেলেন, তা আজ আমাদের ভাবতেও অবাক লাগে! মূলত, যে মহান আল্লাহ এ কিতাবটি নাযিল করেছেন, তিনিই এর হিফাযত ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথম এবং প্রধান বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ নিজেই এ কিতাব হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ○

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি আয্‌যিক্‌র (আল কুরআন) এবং অবশ্যি আমি এর হিফাযতকারী।[১]

২. কুরআন সংরক্ষণে রসূলুল্লাহ সা.-এর নিখুঁত ব্যবস্থা

আল্লাহ পাক কুরআন মজিদ সংরক্ষণের প্রথম ব্যবস্থা করেন তাঁর রসূলের হৃদয়পটে। কুরআন মজিদ স্মৃতিপটে (memory-তে) ধারণ করার জন্যে তাঁর রসূলের হৃদয়কে উন্মুক্ত উন্নত ও উর্বর করে দিয়েছিলেন। ফেরেশতা যখন তাঁর কাছে অহি (কুরআন) নিয়ে আসতো এবং তাঁকে পাঠ করে শুনাতো, তখন তিনি ফেরেশতার পাঠের সাথে সাথে তা স্মৃতিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পাঠ করতে শুরু করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক তাঁর হৃদয়পটে কুরআন সংরক্ষিত করে দেয়া সংক্রান্ত নিজের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে দেন, যাতে করে ফেরেশতার পাঠের সময় মুখস্ত করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে না পড়েন। আল্লাহ পাক তাঁকে বলেন :

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ○ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ○

অর্থ: তুমি তা (কুরআন) দ্রুত আয়ত্ত করার জন্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করোনা। এটির সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন (জিবরিলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠ অনুসরণ

১. আল কুরআন, সূরা ১৫ আল হিজর : আয়াত ০৯।

(মনোযোগ সহকারে শ্রবণ) করো। তারপর তা (তোমাকে) পরিষ্কার করে বর্ণনা করে দেয়া আমারই দায়িত্ব।[২]

এ আয়াতের বিশ্লেষণে আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানি রহ. বলেন :

"এ আয়াতে পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, অহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কুরআনকে হিফ্‌য করার জন্যে রসূল সা.-এর বার বার শব্দ উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ স্বয়ং রসূল সা.-এর মাঝে এমন তীক্ষ্ণস্মৃতি শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার অহি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সেটাকে আর ভুলবেন না। অবস্থা এমন হয় যে, একদিকে তাঁর উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছে, অন্যদিকে তা তাঁর স্মৃতিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে রসূলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র বক্ষ কুরআনের এমন সুরক্ষিত ভান্ডারে পরিণত হয় যে, তাতে সামান্যতম কম বেশি কিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোনো আশংকা ছিলনা। এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে তিনি প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরিলকে পুরো কুরআন শোনাতেন, জিবরিল থেকেও শুনে নিতেন। তাঁর ইন্তিকালের বছর রমযানে তিনি দু'দুবার জিবরিলকে শোনান এবং জিবরিল থেকেও শোনেন।"[৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা তকি উসমানি বলেন :

"ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরআনুল করিম সংরক্ষণের জন্য সাহাবায়ে কিরামকে মুখস্থ করানোর বিষয়টাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। প্রাথমিক যুগে এ পদ্ধতিটিই বেশি সংরক্ষণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ছিলো। কারণ তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিলো খুবই সীমিত। বই-পুস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এবং অন্য কোনো উপায়-উপকরণের অস্তিত্বও ছিলনা। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তাহলে কুরআনুল করিমের সংরক্ষণ করা যেমন জটিল হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নি:সন্দেহে অসম্ভব হয়ে পড়তো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি এতোই প্রখর ছিলো যে, একেক ব্যক্তি হাজারো কাব্যগাঁথা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারতো। মরুভূমির যাযাবর বেদুঈনরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কোষ্ঠিনামার ইতিহাস মুখস্থ করে রাখতো। কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সে অনন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। মুখস্থ শক্তির মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে।"[৪]

এ পদ্ধতি অবলম্বনে কুরআন মজিদ যে কতো দ্রুত প্রচার-প্রসার হয়েছে তা একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। ঘটনাটি হচ্ছে, আমর ইবনে সালামা

২. আল কুরআন, সূরা ৭৫ আল কিয়ামা, আয়াত ১৬-১৯।
৩. ইবনে হাজর আসকালানি : ফাতহুল বারি, ৯ম খন্ড।
৪. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড।

রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় খুবই অল্প বয়স্ক সাহাবি ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিলো একটি ঝরণার পাশে। এটা ছিলো মুসাফিরদের যাতায়াত ও বিশ্রামের পথ। তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র সাত বছর। তখনো তিনি মুসলমান হননি। কিন্তু যাতায়াতকারী মুসলিম মুসাফিরদের কাছ থেকে শুনে শুনে মুসলমান হওয়ার পূর্বেই কুরআন মজিদের বেশ কিছু অংশ তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।[৫]

হিফয বা স্মৃতিবদ্ধ করা ছাড়াও তিনটি পর্যায়ে কুরআন মজিদ লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। পর্যায়গুলো ছিলো নিম্নরূপ :

৩. প্রথম পর্যায় : কুরআন নাযিলের যুগে কুরআন সংরক্ষণ

রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায়, যখন তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন থেকেই লিখিতভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। রসূল সা. লেখাপড়া জানা সাহাবিদের দিয়ে কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে যায়েদ বিন সাবিত রা. বর্ণনা করেন :

كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَخَذَتْهُ بِرِحَاءٍ شَدِيْدَةٍ وَعَرَقًا مِثْلَ الْجُمَّانِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ - فَكُنْتُ أُدْخُلُ عَلَيْهِ بِقَطْعَةِ الْكَتِفِ أَوْ كِسْرَةٍ فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِيْ عَلَيَّ فَمَا أَفْرُغُ حَتّٰى تَكَادَ رِجْلَيَّ تَنْكَسِرُ مِنْ ثَقَلِ الْقُرْآنِ حَتّٰى أَقُوْلَ لَا أَمْشِيْ عَلَى رِجْلَيَّ أَبَدًا- فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ إِقْرَأْ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ -فَاقْرَاءَه فَإِنْ كَانَ فِيْهِ سَقَطٌ أَقَامَهُ .

অর্থ: আমি রসূল সা.-এর জন্যে অহি লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর অহি নাযিল হতো, তখন তাঁর খুব তাপ বোধ হতো এবং মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম দেখা দিতো। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা (লেখার) অন্য কোনো উপকরণ নিয়ে হাযির হতাম। তিনি বলতেন, আমি লিখতাম। লেখা শেষ হওয়ার পর কুরআন লিখনের চাপে আমার এমন মনে হতো যেনো আমার পা ভেঙ্গে যাবে। যেনো আমি আর চলতে পারবো না। লেখা শেষ হলে রসূল সা. বলতেন, যা লিখেছো তা আমাকে পড়ে শোনাও। আমি কুরআন নিয়ে মানুষের কাছে বেরিয়ে পড়বো। তখন আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করে দিতেন। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন।[৬]

শুধু যায়েদ বিন সাবিতই নন, আরো অনেক সাহাবি অহি লিখনের দায়িত্ব পালন করেছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর অহি লেখকগণের সংখ্যা চল্লিশ পর্যন্ত জানা যায়।

---

৫. সূত্র : সহীহ আল বুখারি।

৬. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাবারানি তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তাঁদের তালিকাও প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন :

১. আবুবকর সিদ্দিক রা.।
২. উমর বিন খাত্তাব রা.।
৩. উসমান ইবনে আফফান রা.।
৪. আলী ইবনে আবু তালিব রা.।
৫. যায়েদ বিন সাবিত রা.।
৬. উবাই ইবনে কা'ব রা.।
৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ রা.।
৮. যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.।
৯. খালিদ বিন সায়ীদ আল আস্ রা.।
১০. হানযালা ইবনে রবী' রা.।
১১. আকিব ইবনে আবু ফাতিমা রা.।
১২. আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহায়রি রা.।
১৩. শুরাহবিল ইবনে হাসনা রা.।
১৪. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.।
১৫. আমের বিন ফুহাইরা রা.।
১৬. আমর ইবনুল আস্ রা.।
১৭. সাবিত বিন কায়েস বিন শাম্মাস রা.।
১৮. মুগিরা ইবনে শো'বা রা.।
১৯. খালিদ বিন অলিদ রা.।
২০. মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা.।[৭]

পড়ালেখা জানা সাহাবিগণকে দিয়ে রসূলুল্লাহ সা. নাযিল হওয়ার সাথে সাথে কুরআন লিখিয়ে নিতেন। এভাবে রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়। বুখারি ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص نُؤَلِّفُ الْقُرْاٰنَ مِنْ الرِّقَاعِ.

অর্থ: আমরা রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে চামড়ায় কিংবা খেজুর পাতায় কুরআন লিখতাম।

রসূল সা.-এর জীবদ্দশাতে বহু সংখ্যক সাহাবি পূর্ণ কুরআন বা তার অংশ বিশেষ লিখে নিজেদের নিকট সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, সালেম মওলা হুযাইফা, যায়েদ বিন

৭. এসব নামের বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যাবে ইবনুল কায়্যিমের যাদুল মা'আদ ১ম খন্ড এবং ইবনে হাজরের ফাতহুল বারি ৯ম খন্ডে।

সাবিত, মুয়ায বিন জাবাল, উবাই ইবনে কায়াব, আবু যায়েদ প্রমুখ সাহাবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[৮]

কুরআনের কোনো সূরা যখনই নাযিল হতো, তখনই রসূল সা. তাঁর নিকট লেখকদের ডেকে তা লিখে নিতে আদেশ দিতেন। তা সঠিকভাবে লিখিত হবার পর তিনি তার স্থান নির্ধারণ করে দিতেন। বলে দিতেন এ সূরাটি অমুক সূরার আগে এবং অমুক সূরার পূর্বে রক্ষিত হবে। অনুরূপভাবে কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশ (যাকে স্বতন্ত্র সূরার মর্যাদা দেয়া আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো না) নাযিল হলে কোন্ সূরার কোন্ স্থানে তা রক্ষিত হবে তা রসূলুল্লাহ সা. নিজেই বলে দিতেন। শুধু তাই নয়, অনুরূপ পরম্পরা অনুযায়ী তিনি নিজেই নামাযে কুরআনের বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াত করতেন। সাহাবাগণও অনুরূপ পরম্পরা অনুযায়ী অনুরআন হিফ্য করতেন। বস্তুত কুরআন নাযিল সম্পন্ন হবার দিনই কুরআনের তরতীব বা পরম্পরা নির্ধারণও সম্পন্ন হয়। এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, কুরআন যিনি নাযিল করেছেন, তিনি নিজেই তার তরতীবও নির্ধারণ করেছেন এবং যার হৃদয়ের উপর তা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাঁর দ্বারাই তিনি এ কাজ সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিলনা।[৯]

রসূলুল্লাহ সা.-এর জীদ্দশাতেই স্বয়ং তাঁর তত্ত্বাবধানে কুরআন করিমের একটি কপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও তা গ্রন্থাকারে ছিলনা। তবে পৃথক পৃথক চামড়া বা পাতায় লিপিবদ্ধ ছিলো। নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবিগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে লিখনের প্রচলন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ছিলো। একটি ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনাটি হচ্ছে, উমর রা.-এর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও ভগ্নিপতি সায়িদ ইবনে যায়েদ রা. উমর রা.-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। যখন উমর রা. তাদের মুসলমান হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাগান্বিত হয়ে তাদের ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তাদের কাছে কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি পেলেন। যার মাঝে সূরা তোয়াহার আয়াত লিপিবদ্ধ ছিলো। খাব্বাব ইবন আরত রা. তা পাঠ করছিলেন।[১০]

অনেক সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কপি লিখে নিজের সংরক্ষণে রেখেছিলেন। যেমন, সহীহ বুখারিতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُّسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।
৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।
১০. দারু কুতনি, সীরাতে ইবনে হিশাম, যাদুল মা'আদ।

'রসূলুল্লাহ সা. কুরআন নিয়ে শত্রু ভূমিতে সফর করতে নিষেধ করেছেন'।[১১]

মু'জামে তাবারানিও বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. বলেছেন :

قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةً. وَقِرَاءَتُهُ فِىْ الْمُصْحَفِ تَضَاعَفُ عَلَى ذَالِكَ اَلْفَىْ دَرَجَةً.

অর্থ: যে ব্যক্তি কপি না দেখে কুরআন তিলাওয়াত করে, তার সওয়াব এক হাজার। আর যে দেখে দেখে তিলাওয়াত করে, তার সওয়াব দু'হাজার।[১২]

উপরোক্ত বর্ণনা দু'টি দ্বারা জানা যায়, রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশাতেই সাহাবায়ে কিরামের নিকট কুরআনের পান্ডুলিপি বিদ্যমান ছিলো। অন্যথায় কুরআন দেখে দেখে তিলাওয়াত করা এবং তা নিয়ে শত্রু ভূমিতে সফর করার প্রশ্নই আসেনা।

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম রা. রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা মোতাবেক কুরআন লিখে নিতেন। সে যুগে যেহেতু আরব দেশে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিলো তাই কুরআনের আয়াত পাথরের গায়ে, চামড়ার কাগজে, খেজুরের শাখায়, বাঁশের চটিতে, গাছের পাতায় ও পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। অবশ্য কখনো কখনো কাগজের টুকরাও ব্যবহৃত হতো।[১৩]

৪. দ্বিতীয় পর্যায় : আবু বকর রা.-এর সময় কুরআন সংকলন

কুরআন মজিদ লিখিতভাবে সংরক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, আবু বকর রা.-এর খিলাফত আমলে গ্রন্থাবদ্ধভাবে কুরআনুল করিমের সংকলন। এ সময় রসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে হাড়, শিলা, চর্ম ও বৃক্ষপত্রে লিখিত কুরআনের বিচ্ছিন্ন কপিগুলোকে একত্রিত করে আল কুরআনের পূর্ণাংগ পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারিতে যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর কুরআন সংকলন সংক্রান্ত সোনালি ইতিহাস সমৃদ্ধ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেন :

"আবু বকর একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন ইয়ামামার যুদ্ধ শেষে। গিয়ে দেখি তাঁর নিকট উমর ইবনুল খাত্তাবও রয়েছেন। আবু বকর বললেন, আমার নিকট উমর এসে প্রস্তাব রাখলেন : 'ব্যাপক হারে হাফেযে কুরআন শহীদ হচ্ছেন। এটা খুবই আশংকার ব্যাপার। আমার প্রস্তাব হচ্ছে আপনি কুরআন গ্রন্থাবদ্ধের নির্দেশ দিন।' আমি উমরকে বললাম: যে কাজ রসূল সা. করে যাননি, তা আপনি কি করে করবেন? উমর বললেন: এটা একটা উত্তম কাজ। অত:পর আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমি উমরের সাথে একমত হলাম। যায়েদ বিন সাবিত বলেন: আবু বকর অতপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি একজন জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত যুবক। আর তুমি রসূলুল্লাহ সা.-এর

১১. সহীহ বুখারি : কিতাবুল জিহাদ।
১২. তাবারানি : আল মু'জাম।
১৩. ইবনে হাজর আসকালানি : ফাতহুল বারি, ৯ম খণ্ড।

'কাতেবে অহি'ও ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআনকে খুঁজে একত্রিত ও গ্রন্থাবদ্ধ করো। কসম আল্লাহর! আমাকে যদি একটি পাহাড় উঠিয়ে নিয়ে অন্যত্র স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হতো, কুরআন গ্রন্থাবদ্ধের এ নির্দেশ থেকে তা আমার কাছে অধিক ভারি মনে হতো না। আমি বললাম: যে কাজ রসূলুল্লাহ সা. করে যাননি, তা আপনারা কেমন করে করতে চান। তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! এটা একটা উত্তম কাজ। তৎক্ষণেই এ কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর খুলে দিলেন। যেমন করে খুলে দিয়েছেন আবু বকর ও উমরের অন্তর। অত:পর আমি কুরআন সংগ্রথিত করলাম পাথর, খেজুর পাতা এবং লোকদের হৃদয় থেকে। সূরা বারাআতের (তওবা) শেষ কয়টি আয়াত (লাকাদ জা আকুম রাসূলুম) আবু খাযিমা আনসারি ছাড়া আর কারো নিকট লিখিত পাইনি। অত:পর সুগ্রথিত গ্রন্থখানা মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকরের নিকট ছিলো। অত:পর উমর যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন তাঁর নিকট ছিলো, তারপর তা হাফসা বিনতে উমরের নিকট গচ্ছিত থাকে।"[১৪]

আবু বকর রা. যায়েদ বিন সাবিতকে এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি রসূলুল্লাহ সা.-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ছিলেন। কুরআন মজিদ গ্রন্থাবদ্ধ করার জন্যে এক দিকে রসূলুল্লাহ সা.-এর পরিত্যাক্ত লিখিত অংশসমূহ সম্মুখে রাখা হয়। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যার নিকট পূর্ণ কুরআন কিংবা তার কিছু অংশ লিখিত পাওয়া গেলো তাও সংগ্রহ করা হলো। কুরআনের হাফেযদের থেকেও এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করা হলো। এ তিন প্রকারের পন্থায় সম্মিলিত সাহায্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পূর্ণ কুরআন মজিদ গ্রন্থাবদ্ধ করা, এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ও নি:সংশয়তা লাভ করার পর কুরআন মজিদের এক একটি শব্দ সুলিখিত হয়। এ পন্থায় কুরআন মজিদের একখানা নির্ভরযোগ্য পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় এবং তা পরে উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা.-এর নিকট গচ্ছিত থাকে। গ্রন্থাবদ্ধ কুরআন থেকে পুনরায় লেখার বা তার সাথে নিজের নিকট থাকা লিখিত কুরআন যাচাই করে নেয়ার জন্যে সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পান্ডুলিপি প্রস্তুত করার মূল ইতিহাস এটাই।[১৫]

এ প্রসঙ্গে আমরা আল্লামা তকি উসমানির একটি লম্বা বক্তব্য উদ্ধৃত করা জরুরি মনে করছি। তিনি বলেন :

"প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ বিন সাবিত রা. কর্তৃক কুরআনুল করিম সংকলন করার ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি নিজেই হাফিযে কুরআন ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন।

---

১৪. সহীহ বুখারি। জালালুদ্দীন সুয়তির আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থের সূত্রে উদ্ধৃত।

১৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

তাছাড়া শত শত হাফিযে কুরআন বিদ্যমান ছিলেন। তাদের একত্র করেও সমগ্র কুরআনুল করিম একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিলো। বিশেষ করে রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু অধিক সতর্কতাবশত যে কোনো একটি পদ্ধতির উপর অবিচল থাকেননি, বরং সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলিল, অন্যান্য হাফিযদের তিলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তার পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়াও রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে লিখিত যেসব আয়াতের পাণ্ডুলিপি সাহাবায়ে কিরামের নিকট সংরক্ষিত ছিলো, যায়েদ বিন সাবিত রা. সেগুলো একত্রিত করেন।

এমনকি ব্যাপকভাবে ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, 'তোমাদের যার নিকট সূরা বা আয়াতের লিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে, সব যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর নিকট জমা দিয়ে দাও।' (ফাতহুল বারি)

যেসব লিখিত পাণ্ডুলিপি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর নিকট জমা দেয়া হলো, সেগুলো যাচাই করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন :

১. প্রথমে তিনি তার স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করেন।

২. উমর রা.ও হাফিয ছিলেন। আবু বকর রা. তাকেও এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত কপিগুলো যাচাই করতেন এবং এক জনের পর একজন নিজ নিজ স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন।

৩. এমন কোনো লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হতো না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ রসূল সা.-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। (আল ইতকান)

আল্লামা সূয়ুতি রহ. বলেন, বাহ্যত এ সাক্ষ্যগুলো এ কথার উপরও নেয়া হতো যে, লিখিত এ আয়াতগুলো রসূল সা.-এর ওফাতের বছর তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর তিনি এ কথার সত্যয়ন করেছিলেন যে, এগুলো ঐ সাত হরফ অনুযায়ী রয়েছে যার উপর কুরআনুল করিম অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারাও আল্লামা সুয়ূতি রহ.-এর এ উক্তি সমর্থনপুষ্ট।

৪. অত:পর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবি কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। (আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন)

ইমাম আবু শামাহ্ রা. বলেন, কুরআনুল করিম লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতার জন্যেই এত সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং শুধু স্মৃতিশক্তির

উপরই নির্ভর না করে ঐ কপির সাথে আয়াতগুলো মিলানো হয়েছে, যেগুলো খোদ রসূল সা.-এর তত্তাবধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আবু বকর রা.-এর যুগে কুরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবলম্বিত উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই যায়েদ বিন সাবিত রা.-এর এ কথাটির অর্থ পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, সূরা বারা'আতের শেষ আয়াত لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটুকু আবু খুযাইমা রা.-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়, অন্য কারো কাছে পাওয়া যায়নি। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু আবু খুযাইমাই জানতেন; অন্য কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিলো না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিলো না। বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে লিখিত দলিল হিসেবে এবং উপরোক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবল আবু খুযাইমা রা.ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় এ অংশটুকু যে কুরআনের অংশ, তা তাওয়াতুরের সাথেই সবাই জানতেন। প্রথমত, শত শত সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতি শক্তিতে সমগ্র কুরআনুল করিম বিদ্যমান ছিলো; এ আয়াত ক'টিও তাদের স্মৃতিস্থ ছিলো। দ্বিতীয়ত, কুরআনুল করিমের সমস্ত পাণ্ডুলিপি অনেক সাহাবায়ে কিরামের সংরক্ষণে ছিলো। সেগুলোতেও এ আয়াত ক'টি বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু যেহেতু যায়েদ বিন সাবিত রা. অধিক সতর্কতার জন্য উপরোল্লিখিত উপকরণাদির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিখিত আয়াতগুলোকে একত্র করার দায়িত্ব বহন করেছিলেন। তাই তিনি তার নতুন কপিতে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত লিপিবদ্ধ করতেন না, যতোক্ষণ না তৃতীয় পদ্ধতিতে যাচাই করা হতো। অন্যান্য আয়াতের ব্যাপার তো এমন ছিলো যে, হাফিয সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিতে তা বিদ্যামন ছিলো এবং নববী যুগের পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত ছাড়াও কোনো কোনো সাহাবায়ে কিরামের নিকট তা পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিলো। এমনকি একই আয়াত অনেক সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে এসেছিলেন।

পক্ষান্তরে সূরা বারা'আতের শেষ আয়াতটি শত শত সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিতে তো ছিলোই এবং যাদের কাছে কুরআনুল করিমের পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিলো, তাদের নিকটও এ আয়াতটি লিপিবদ্ধ ছিলো। কিন্তু রসূল সা.-এর তত্ত্বাবধানে লিখিত পাণ্ডুলিপি শুধুমাত্র আবু খুযাইমার নিকটই পাওয়া গেলো, অন্য কারো নিকট নয়। (আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন)

মোট কথা যায়দ বিন সাবিত রা. অসাধারণ সাবধানতার সাথে কুরআনুল করিমের পরিপূর্ণ কপি তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, তাই তা একাধিক সহীফায় সমৃদ্ধ ছিলো। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিলো নিম্নরূপ :

১. এ কপিতে কুরআনের আয়াতগুলো রসূল সা.-এর নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিলো না। প্রত্যেক সূরা পৃথক পৃথক কপিতে লিপিবদ্ধ ছিলো। (আল ইতকান)
২. এ কপিতে পূর্ব বর্ণিত কুরআনের সাত হরফের সবগুলোই বিদ্যমান ছিলো। (মানাহিলুল ইরফান)
৩. এ কপিগুলো হীরী লিপির অনুকরণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।
৪. এ কপিগুলোতে শুধু ঐ সমস্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেগুলোর তিলাওয়াত মানসূখ হয়নি।
৫. এ কপিগুলো এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উম্মতের সবাই তা থেকে নিজ নিজ কপি শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

আবু বকর রা.-এর উদ্যোগে কুরআন সংকলন সংক্রান্ত এই বিশদ বিবরণ মনে থাকলে ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্যও ভালভাবে বুঝে এসে যায় যাতে বলা হয়েছে যে, রসূল সা.-এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গেই আলী রা. কুরআনুল করিম সংকলন করে নিয়েছিলেন। কারণ ব্যক্তিগত কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে আলী রা. একা নন; বরং আরো কতিপয় সাহাবা রা. সংকলন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু গোটা উম্মতের সম্মতিক্রমে কুরআনুল করিমের যে মানদণ্ডমূলক পাণ্ডুলিপি সংকলন করা হয়েছে, সর্বপ্রথম তা খলিফা আবু বকর রা.ই প্রস্তুত করিয়েছেন।

আবু বকর রা.-এর উদ্যোগে সংকলিত এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকটই সংরক্ষিত ছিলো। তাঁর ইন্তিকালের পর তা উমর রা. সংরক্ষণ করেন। উমর রা.-এর শাহাদাতের পূর্বে তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী এ পাণ্ডুলিপিটি উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রা.-এর নিকট সোপর্দ করা হয়। (ফাতহুল বারি)

অত:পর মারওয়ান ইবনে হিশাম তার শাসনামলে হাফসা রা. থেকে এ পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে পাঠান। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত হাফসা রা. এর ইন্তিকালের পর মারওয়ান তা নিয়ে নেয় এবং উসমান রা. কর্তৃক সূরার তারতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ কুরআনে করিমের সর্বসম্মত শুদ্ধতম কপি প্রস্তুত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর এ পাণ্ডুলিপিটি অগ্নিতে ভস্ম করে দেয়া হয়। কেননা, তখন সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতি ও সূরার অবিন্যস্ত কোনো কপি অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশংকা ছিলো বলেই এরূপ করা হয়েছিল।"[১৬]

৫. তৃতীয় পর্যায় : খলিফা উসমান কর্তৃক কপি করে সম্প্রচার

কুরআন মজিদ যদিও কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়, কিন্তু প্রথম পর্যায়ে অপরাপর এলাকা ও গোত্রের লোকদেরও তাদেরই নিজেদের উচ্চারণভংগি

---

১৬. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড।

অনুযায়ী পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ, এতে মূল অর্থের কোনো প্রকার পার্থক্য হতো না। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হওয়ায় আরব অনারবদের ব্যাপক সংমিশ্রণের ফলে আরবি ভাষা প্রভাবান্বিত হতে লাগলো। কুরআনের ভাষার উপর আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক প্রভাবের কারণে উচ্চারণ ভংগির ব্যাপক পার্থক্য দেখা দিলো। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. আরমানিয়া এবং আজারবাইজানের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে উসমান রা.কে বিভিন্ন এলাকায় কুরআনের উচ্চারণ ভংগির সাংঘাতিক পার্থক্যের ও বিকৃতির আশংকা উল্লেখ করে তা থেকে কুরআনকে হিফাযত করার পরামর্শ দেন। উসমান রা. হাফসা রা.-এর কাছে সংরক্ষিত মাসহাফটার (পাণ্ডুলিপি) জন্য পাঠিয়ে বললেন : মাসহাফটা আমাদের পাঠিয়ে দিন। আমরা তার কয়েকটা কপি করে আপনাকে ফেরত দেবো। হাফসা রা. পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলে উসমান রা. তার কয়েকটা কপি করার জন্য যায়েদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সায়াদ ইবনুল আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেছকে নির্দেশ দিলেন। কপি করা শেষ হলে উসমান মূল পাণ্ডুলিপি হাফসাকে ফেরত পাঠালেন এবং প্রত্যেক এলাকায় এক একটা কপি পাঠিয়ে অন্যান্য সকল প্রকার উচ্চারণভংগি ও প্রচলিত ধ্বনিতে লিখিত কুরআনের প্রচার বন্ধের নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।[১৭]

হুযাইফা ইবনে ইয়ামন রা. কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর উসমান রা. এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবগণকে একত্র করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের কিরাত তোমাদের কিরাত অপেক্ষা উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরির পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন? সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? উসমান রা. বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত কপি তৈরি করা কর্তব্য, যাতে কিরাত পদ্ধতির মধ্যেও কোনো মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবিগণ সর্বসম্মতিক্রমে উসমান রা.-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গিকার করলেন।[১৮]

এরপর উসমান রা. সর্বশ্রেণীর লোকদেরকে সমবেত করে একটি বিশেষ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, আপনারা মদিনায় আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কুরআনুল করিমের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বুঝা যায় যে, যারা আমার থেকে অনেক দূরে বসবাস করেন,

---

১৭. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন।

১৮. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি : আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন।

তারা এ ব্যাপারে আরো বেশি মতভেদ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত রয়েছেন। সুতরাং আসুন! আমরা সকলে মিলে কুরআনের এমন একটি লিখিত কপি তৈরি করি, যাতে মতভেদের কোনো সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে উসমান রা. সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রা.-এর কাছ থেকে আবু বকর রা. কর্তৃক লিপিবদ্ধ কপিগুলো চেয়ে পাঠালেন। এ কপি সামনে রেখে সূরার ক্রমধারাসহ কুরআনের শুদ্ধতম কপি তৈরি করার উদ্দেশ্যে কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত চারজন বিখ্যাত সাহাবি যায়েদ ইবনে সাবিত রা. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. সাঈদ ইবনে আস রা. ও আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রা.-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, আবু বকর রা. কর্তৃক সংকলিত মাসহাফকেই সামনে রেখে শুধু এমন একটা সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ কিরাআত পদ্ধতি অনুযায়ীই তিলাওয়াত করা সম্ভব হয়।[১৯]

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবিকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেককেই তাদের সাথে সহযোগি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইবনে আবু দাউদ রা.-এর বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিলো বার। উবাই ইবনে কা'ব রা., কাসির ইবনে আফলাহ্ রা., মালিক ইবনে আবু আমর রা., আনাস ইবনে মালিক রা. এবং আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২০] লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন :

১. আবু বকর রা.-এর উদ্যোগে লিখিত যে কপিটি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলোর বিন্যাস ছিলো না, বরং সূরাগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিলো। তারা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই কপিতে সুবিন্যস্ত করে লিপিবদ্ধ করেন।

২. আয়াতগুলো এমন এক লিখন পদ্ধতির অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ কিরাত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই এতে নুকতা, যের, যবর ও পেশ সংযুক্ত হয়নি।

৩. তখন পর্যন্ত কুরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র কপি বিদ্যমান ছিলো। তারা একাধিক কপি তৈরি করেন। সাধারণ বর্ণনা মতে উসমান রা.-এর তত্ত্বাবধানে পাঁচটি কপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আবু হাতিম সিজিস্তানী র.-এর মতে সাতটি কপি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কায়, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়েমেনে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফায় প্রেরণ করেন এবং একটি মদিনায় সংরক্ষিত ছিলো।

---

১৯. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি : আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন।

২০. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন।

৪. লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত আবু বকর রা.-এর যুগে লিখিত কপি অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, আবু বকর রা.-এর যুগে মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল। রসূল সা.-এর যুগে লিখিত যেসব অনুলিপি সাহাবিগণের নিকট সংরক্ষিত ছিলো, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবিগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিলো, তন্মধ্যে সূরা আহ্যাবের এ আয়াত: مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

শুধু খুযাইমা ইবনে সাবিত আনসারী রা.-এর কপিতে পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, অন্য কারো স্মরণ ছিলো না কিংবা আবু বকর রা. কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিলো না। কেননা যায়দ ইবনে সাবিত রা. বর্ণনা করেন :

فَقَدَتْ اٰيَةٌ مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ فَسَخْنَا الْمَصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُبِهَا فَالتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِى .

অর্থ: মাসহাফ (পাণ্ডুলিপি) তৈরি করার সময় সূরা আহযাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোনো কপিতে পাওয়া যাচ্ছিল না, অথচ সেটি আমি রসূল সা.কে অনেকবার তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অতপর সেটি আমরা খুযাইমা বিন সাবিত আনসারির পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছি।

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ আয়াত যায়দ রা.সহ অনেক সাহাবিরই স্মরণ ছিলো কিংবা এর দ্বারা একথাও বুঝা যায়না যে, এ আয়াত অন্য কোনো লিপিতেও ছিলো না। বরং আবু বকর রা. কর্তৃক তৈরি করা কপিতে এ আয়াত লিখিত ছিলো। বিচ্ছিন্ন কপিগুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সা.-এর যুগে সাহাবিগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব কপি লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবলমাত্র খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর লিখিত কপিতে পাওয়া গিয়েছিল।

৫. কুরআনের এ সর্বসম্মত কপি তৈরি হলে গোটা উম্মত এ কপির ব্যাপারে নি:সন্দেহ হওয়ার পর উসমান রা. আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল কপি আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা, এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত কপিগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থ এবং সর্বসম্মত প্রতিটি কিরাআতে পাঠোপযোগী লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

উসমান রা.-এর এ কাজকে গোটা উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।[২১]

---

২১. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড।

"আজ যে কুরআন মজিদটি আমাদের হাতে আছে সেটি আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর নোস্‌খার অনুলিপি। এই অনুলিপিটি উসমান রা. সরকারি ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানেও দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কুরআনের সেই প্রামাণ্য নোস্‌খাগুলো পাওয়া যায়। কুরআন মজিদ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবার ব্যাপারে যদি কারো মনে সামান্যতমও সংশয় থাকে তাহলে মানসিক সংশয় দূর করার জন্যে তিনি পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার কোনো বই বিক্রেতার দোকান থেকে এক খণ্ড কুরআন মজিদ কিনে নিতে পারেন। তারপর সেখান থেকে চলে আসতে পারেন ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। জাভার কোনো হাফেযের মুখে কুরআনের পাঠ শুনে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কেনা তার হাতের নোস্‌খাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখতে পারেন। অত:পর দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারগুলোয় উসমান রা.-এর আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তকার যতগুলো কুরআনের নোস্‌খা রক্ষিত আছে সবগুলোর সাথে সেটি মিলাতে পারেন। তিনি যদি তার মধ্যে কোনো একটি হরফ বা নোক্‌তার পার্থক্য দেখতে পান তাহলে সারা দুনিয়াকে এই অভিনব আবিষ্কারের খবরটি জানানো তাঁর অবশ্যি কর্তব্য। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহকারী সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু যে কুরআনটি আমাদের হাতে আছে সেটি সামান্যতম হেরফের ও পরিবর্তন ছাড়াই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে কুরআনটি নাযিল হয়েছিল এবং যেটি তিনি দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন তারই হুবহু অনুলিপি, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এমন অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বলিত সত্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহলে বলতে হয়, দুনিয়ায় কোনো কালে রোমান সাম্রাজ্য বলে কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলো এবং মোগল রাজবংশ কোনো দিন ভারত শাসন করেছে অথবা দুনিয়ায় নেপোলিয়ান নামক কোনো ব্যক্তি ছিলেন- এ ব্যাপারেও তিনি অবশ্যি সন্দেহ পোষণ করবেন। এ ধরনের ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করা জ্ঞানের নয়, বরং অজ্ঞতারই প্রমাণ।"[২২]

❖❖❖

২২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

অনুচ্ছেদ ৮

আল কুরআনের নাম

আল কুরআনের পরিচয় ও সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো আল কুরআনের নামের সংখ্যা কয়টি এবং মূল নাম কোন্‌টি? এ প্রসংগে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ অনেকেই নিজ নিজ গবেষণার আলোকে মত প্রদান করেছেন।

বিখ্যাত কুরআন বিশারদ আবুল মু'আলির[১] মতে আল কুরআনের নাম পঞ্চান্নটি। জালালুদ্দীন সূয়ূতি আবুল মু'আলির সূত্রে এই পঞ্চান্নটি নাম আল ইতকানে[২] উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন আল কুরআনের নাম-এর সংখ্যা নব্বইটি কিংবা তার চাইতেও অধিক।[৩] তবে তাঁরা নামগুলো উল্লেখ করেননি। এই লেখক ব্যাপক অনুসন্ধান করে কুরআন মজিদ থেকে কুরআনের কিছু কম বেশি নব্বইটি নাম খুঁজে পেয়েছেন। (সেগুলো আমারা একটু পরেই উল্লেখ করছি)।

এখন প্রশ্ন হলো, আল কুরআনের মূল নাম কী? এ ক্ষেত্রেও কুরআন বিশারদগণ নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রকৃত নাম পাঁচটি।[৪] সেগুলো হলো :

১. আল কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ)। সূত্র : সূরা ইসরা, আয়াত ৯।

২. আল কিতাব (اَلْكِتَابُ)। সূত্র : সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ১০।

৩. আল ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ)। সূত্র : সূরা আল ফুরকান, আয়াত ০১।

৪. আয যিক্‌র (اَلذِّكْرُ)। সূত্র : সূরা আল হিজর, আয়াত ০৯।

৫. আত তানযিল (اَلتَّنْزِيْلُ)। সূত্র : সূরা আশ শোয়ারা, আয়াত ১৯২।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দাররাযের মতে : আল করআনের সুপরিচিত ও খ্যাতি অর্জনকারী নাম দুটি। সেগুলো হলো : ১. আল কুরআন এবং ২. আল কিতাব।[৫]

ড. দাররায এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, 'আল কুরআন' মানে অতি পঠিত এবং 'আল কিতাব' মানে লিপিবদ্ধ। কুরআন মজিদ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত থাকার পদ্ধতিও এ দুটিই। কুরআন মজিদের প্রতিটি আয়াত অবতীর্ণের ক্ষণটি থেকে

---

১. আবুল মু'আলির মূল নাম : আযিযি ইবনে আবদুল মালেক (মৃত্যু : ৪৯৪ হিজরি) : আল বুরহানু ফী মুশকিলাতিল কুরআন।

২. জালালুদ্দীন সূয়ূতি : আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ১ম খন্ড, পৃ: ১৭৮-১৮১।

৩. দৃষ্টব্য : মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড ১ম অধ্যায়।

৪. মান্না আল কাত্তান : মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, ৮ম মুদ্রণ ১৯৮১,পৃ: ২১-২২। মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, প্রথম খন্ড, ১ম অধ্যায়।

৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দাররায : আন্ নাবাউল আযিম, পৃষ্ঠা ১২-১৩, দারুল কলম সংস্করণ, কুয়েত।

নিয়ে আজ পর্যন্ত এবং অনন্তকাল পর্যন্ত কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করা হয়েছে ও স্মৃতিতে ধারণ করা হয়েছে এবং হতে থাকবে। এ প্রক্রিয়া অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত ও শাশ্বত অকাট্য। অপরদিকে অবতীর্ণের সময় থেকেই অবিচ্ছিন্নভাবে কুরআন মজিদ লিখিত হয়েছে, পরবর্তীতে মুদ্রিত হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়াও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে এবং হতে থাকবে অনন্তকাল।"

তবে আমাদের মতে, আল কুরআনের মূল ও প্রকৃত নাম 'আল কিতাব' (اَلْكِتَابُ) এবং এ কিতাবের উপাধি, উপনাম, শিরোনাম বা পরিচিত নাম (title, nickname, surname, known name) হলো : 'আল কুরআন' (اَلْقُرْاٰنُ)। এছাড়া কুরআন মজিদের বাকি সকল নাম গুণ বা বৈশিষ্ট্যসূচক নাম (اَلْاَسْمَاءُ اَلصِّفَاتُ)।

আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য রসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের যেমন উপনাম (surname) দিয়েছেন তাওরাত, যবূর, ইনজিল প্রভৃতি; তেমনি মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপনাম দিয়েছেন 'আল কুরআন'। কিন্তু সকলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবেরই মূল নাম 'আল কিতাব'। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ. الحديد-٢٥

অর্থ: আমি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ আমার রসূলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি 'আল কিতাব'।[৬]

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ س وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ. البقرة-٢١٣

অর্থ: সব মানুষ ছিলো (প্রথমে) একই উম্মত। তারপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠান এবং সত্যসহ তিনি তাদের সঙ্গে নাযিল করেন 'আল কিতাব'...।[৭]

একারণেই অতীতে যেসব রসূলের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, কুরআন মজিদে তাঁদের উম্মতকে 'আহল আল কিতাব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ সা.-এর প্রতিও যে আল কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, তা কুরআন মজিদে বার বার সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। যেমন :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج البقرة-٢

অর্থ: এটি 'আল কিতাব', এতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই।[৮]

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ. ال عمران-٣

অর্থ: তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন 'আল কিতাব'....।[৯]

---

৬. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ২৫।
৭. আল কুরআন, সূরা ০২ আল বাকারা : আয়াত ২১৩।
৮. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ০২।
৯. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ০৩।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ. المائدة-٤٨

অর্থ: আর আমরা তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি 'আল কিতাব'....।[১০]

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা সত্যসহ তোমার প্রতি 'আল কিতাব' নাযিল করেছি....।[১১]

এ বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার হলো, আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা অন্যান্য কিতাবের মতোই আল কুরআনেরও মূল এবং প্রকৃত নাম 'আল কিতাব।'

তবে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি অবতীর্ণ আল কিতাবের উপাধি বা উপানাম, শিরোনাম কিংবা পরিচিত ও খ্যাতি অর্জনকারী নাম হলো : 'আল কুরআন'।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ○

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমার প্রতি আল কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।[১২]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ

অর্থ: কাফিররা বলে : তোমরা এ কুরআন শুনোনা এবং এটি পাঠকালে শোরগোল সৃষ্টি করো....।[১৩]

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ○

অর্থ: সুতরাং যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাদেরকে আল কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।[১৪]

কুরআন মজিদে 'কুরআন' শব্দটি ৭০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৬১ বার ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনের নাম হিসেবে। এ নামটিই কুরআনের নাম হিসেবে মেঘমুক্ত আকাশে তারকারাজির মেলায় পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

ব্যাপক অনুসন্ধান করে আমরা আল কুরআন থেকে আল কুরআনের ৯০টির অধিক নাম খুঁজে বের করেছি। এগুলোর মধ্যে আল কিতাব এবং আল কুরআন রয়েছে। এই নামগুলো মূলত আল কুরআনের আসমাউস্ সিফাত বা মর্যাদা, গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশক নাম। এখানে আমরা সূত্রসহ নামগুলো উল্লেখ করছি :

১. اَلْكِتَابُ (আল কিতাব) : এর অর্থ মহাগ্রন্থ বা আল্লাহর কিতাব (the

---

১০. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৪৮।

১১. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ২, ৪১। এ প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য সূরা এবং আয়াত ২:১৫১, ১৭৬। ৩:৭, ১৬৪। ৪:১০৫, ১১৩, ১৩৬। ৫:১৫। ৬:১৫৫। ৭:০২। ১০:০১। ১১:০১। ১২:০১। ১৩:০১। ১৪:০১। ১৫:০১। ১৬:৬৪, ৮৯। ১৮:০১, ২৭। ২৯:৪৭, ৫১। ৩১:০২। ৩২:০২। ৩৫:৩১। ৩৮:২৯। ৩৯:০১, ০২, ০৩। ৪০:০২। ৪১:০৩, ৪১। ৪২:১৭, ৫২। ৪৩:০২। ৪৪:০২। ৪৫:০২। ৪৬:০২, ১২। ৬২:০২।

১২. আল কুরআন, সূরা ২৭ আল নমল : আয়াত ০৬।

১৩. আল কুরআন, সূরা ৪১ ফুস্সিলাত : আয়াত ২৬।

১৪. আল কুরআন, সূরা ৫০ কাফ : আয়াত ৪৫।

book)। আল্লাহ তায়ালা বলেন : إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج

অর্থ: আমরা সত্যসহ তোমার প্রতি 'আল কিতাব' নাযিল করেছি।[১৫]

২. اَلْقُرْاٰنُ (আল কুরআন) : এর অর্থ এবং সূত্র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই আল কুরআনের সুপরিচিত নাম। এ নামেই সবাই কুরআনকে চেনে।

৩. اَلْفُرْقَانُ (আল ফুরকান) : এর অর্থ মানদণ্ড, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (the criterion)। মহান আল্লাহ বলেন :

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا○

অর্থ: অতীব মহান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি নাযিল করেছেন 'আল ফুরকান' (the criterion), যাতে সে জগতবাসীর জন্যে হতে পারে সতর্ককারী।[১৬]

৪. اَلذِّكْرُ (আয যিক্‌র) : এর অর্থ উপদেশবাণী, স্মারক। কুরআন বলে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ○

অর্থ: অবশ্যি আমি 'আয যিক্‌র' নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাযত ও সংরক্ষণকারী।[১৭]

৫. اَلتَّنْزِيْلُ (আত তান্‌যিল) : এর অর্থ (আল্লাহর নিকট থেকে) নাযিলকৃত, অবতীর্ণ (revelation)। মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ○ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ○ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ○ وَإِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ○

অর্থ: এবং নিশ্চয়ই এটি (এই কুরআন) মহাজগতের প্রভুর 'অবতীর্ণ' (revelation)। এটি নিয়ে অবতরণ করেছে রূহুল আমিন (জিবরিল) তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি হতে পারো সতর্ককারী। (এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় এবং নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে।[১৮]

৬. اَلتَّذْكِرَةُ (আত তাযকিরাহ্) : এর অর্থ সতর্কবাণী, উপদেশবাণী (admonition)। আল্লাহ পাক বলেন : كَلَّآ إِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ○ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ○

অর্থ: না (তা নয়, বরং) এটি একটি তাযকিরাহ (an admonition), সুতরাং যার ইচ্ছা সে এটি (পড়ুক এবং) উপদেশ গ্রহণ করুক।[১৯]

৭. اَلنُّوْرُ (আন নূর) : নূর মানে আলো (the light)। কুরআন বলে :

---

১৫. সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৪১।
১৬. সূরা ২৫ আল ফুরকান : আয়াত ০১।
১৭. সূরা ১৫ আল হিজর : আয়াত ০৯।
১৮. সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ১৯২-১৯৬।
১৯. সূরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির : আয়াত ৫৪-৫৫)

.....فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

অর্থ: ....সুতরাং যারা তার প্রতি (মুহাম্মদের প্রতি নবী ও রসূল হিসেবে) ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার প্রতি অবতীর্ণ 'নূর'-এর অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।[২০]

৮. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ (আহসানুল হাদিস) : অর্থ- সুন্দরতম বাণী, সর্বোত্তম বাণী।

৯. مُتَشَابِهٍ (মুতাশাবিহ) : সুবিন্যস্ত, সুসামঞ্জস, সুষম বিন্যস্ত।

১০. مَثَانِيَ (মাছানি) : পুনরাবৃত্ত, পুন: পনু: আবৃত্ত।

১১. ذِكْرُ اللّٰهِ (যিকরুল্লাহ্) : আল্লাহ্র উপদেশ (reminder of Allah)।

১২. هُدَى اللّٰهِ (হুদাল্লাহ্) : এর অর্থ- আল্লাহর পথনির্দেশ (guidance of Allah) ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নম্বরে উল্লেখিত পাঁচটি নাম একটি আয়াতেই উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ নাযিল করেছেন 'সর্বোত্তম বাণী', এটি একটি কিতাব, সুষম বিন্যস্ত, পুনরাবৃত্ত। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে, এতে (এর পাঠে) তাদের দেহ ভয়ে কেঁপে উঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি হলো 'আল্লাহর পথনির্দেশ'।[২১]

১৩. هُدًى لِلنَّاسِ (হুদাল্লিন্নাস) : মানবজাতির পথনির্দেশ বা দিশারি।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

অর্থ: রমযান মাস, এতেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন মানব জাতির পথনির্দেশ (guidance for mankind)[২২]

১৪. اَلْحَدِيْثُ (আল হাদিস) : বাণী, বর্ণনা (narration)।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا○

অর্থ: তারা এই হাদিস (বাণী) বিশ্বাস করে না, সে কারণে তুমি তাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে সম্ভবত নিজেকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেবে।[২৩]

১৫. اَلْقَوْلُ(আল কাওলু) : বাণী (the word)।

---

২০. সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ১৫৭ শেষাংশ।

২১. সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ২৩।

২২. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।

২৩. সূরা ১৮ আল কাহফ : আয়াত ০৬।

১৬. اَلْفَصْلُ (আল ফাস্‌লু) : ফায়সালাকারী, মীমাংসাকারী। إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ○
অর্থ: নিশ্চয়ই এটি (আল কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী।[২৪]

১৭. نُوْرُ اللّٰهِ (নূরুল্লাহ) : আল্লাহর নূর, আল্লাহর জ্যোতি, আল্লাহর আলো।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ○

অর্থ: তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেনই, যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপসন্দ করে।[২৫]

১৮. اَلْبُرْهَانُ (বুরহান) : অকাট্য প্রমাণ (convincing proof)।

১৯. نُوْرٌ مُّبِيْنٌ (নূরুম মুবিন) : সুস্পষ্ট আলো (manifast light)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا○

অর্থ: হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে একটি প্রমাণ আর আমি তোমাদের কাছে নাযিল করেছি একটি সুস্পষ্ট আলো।[২৬]

২০. كَلَامُ اللّٰهِ (কালামুল্লাহ) : আল্লাহর বাণী (word of Allah)।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

অর্থ: কোনো মুশরিক তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিও, যাতে করে সে 'আল্লাহর বাণী' শুনতে পায়...।[২৭]

২১. كَلِمَةُ اللّٰهِ (কালিমাতুল্লাহ) : আল্লাহর কথা (word of Allah)।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط

অর্থ: এবং তিনি কাফিরদের কথাকে হেয় করে দেন, আর আল্লাহর কথাই থাকে সর্বোপরে।[২৮]

২২. اَلْكِتَابُ الْمُبِيْنِ (আল কিতাবুল মুবিন) : সুস্পষ্ট কিতাব।

অর্থ: হামিম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।[২৯] حٰمٓ ○ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

২৩. قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ (কুরআনুম মুবিন) : সুস্পষ্ট কুরআন (manifest Quran)।

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ○

অর্থ: আলিফ-লাম-রা, এগুলো আল কিতাবের আয়াত এবং সুস্পষ্ট কুরআন।[৩০]

২৪. اَلْحَكِيْمُ (আল হাকিম) : জ্ঞানগর্ভ, বিজ্ঞানময়।

---

২৪. সূরা ৮৬ আত তারিক : আয়াত ১৩।
২৫. সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ০৮। আরো দ্রষ্টব্য : সূরা ৯ : আয়াত ৩২।
২৬. সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭৪
২৭. সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ০৬।
২৮. সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৪০।
২৯. সূরা ৪৪ আদ দুখান : আয়াত ১-২।
৩০. সূরা ১৫ হিজর : আয়াত ০১।

২৫. اَلْكِتَابُ الْحَكِيْمُ (আল কিতাবুল হাকিম) : জ্ঞানগর্ভ আল কিতাব।

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ○

অর্থ: আলিফ-লাম-রা, এগুলো জ্ঞানগর্ভ আল কিতাবের আয়াত।[৩১]

২৬. اَلْعَزِيْزُ (আল আযীয) : সুরক্ষিত মর্যাদাবান।

২৭. كِتَابٌ عَزِيْزٌ (কিতাবুন আযীয) : মহামর্যাদাবান কিতাব। وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ○

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি এক সুরক্ষিত মর্যাদাবান কিতাব।[৩২]

২৮. اَلْمَجِيْدُ (আল মাজীদ) : জ্যোর্তিময়, গৌরবান্বিত, মহত, মহিমান্বিত (glorious)।

ق قف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ○

অর্থ: কাফ, শপথ জ্যোর্তিময় গৌরবান্বিত আল কুরআনের।[৩৩]

২৯. قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ (কুরআন মজিদ) : জ্যোর্তিময় মহিমান্বিত কুরআন. গৌরবময় কুরআন (the glorious Quran)।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ○ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ○

অর্থ: বস্তুত এটি মহিমান্বিত কুরআন, সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।[৩৪]

৩০. مُبَارَكٌ (মুবারক) : কল্যাণময় (blessed)।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ

অর্থ: আর এটি একটি কিতাব, আমি এটি নাযিল করেছি তোমার প্রতি, কল্যাণময় এটি। সুতরাং তোমরা এটির অনুসরণ করো।[৩৫]

৩১. ذِكْرٌ مُبَارَكٌ (যিকরুম মুবারক) : কল্যাণময় উপদেশ (blessed reminder)।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

অর্থ: আর এটি একটি কল্যাণময় উপদেশ। এটি আমি নাযিল করেছি। তবু কি তোমরা এটিকে অস্বীকার করবে?[৩৬]

৩২. اَلْعَرَبِىُّ (আরবি) : আরবি ভাষার গ্রন্থ (arabic)।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ○

অর্থ: আমিই এটিকে নাযিল করেছি আরবি ভাষার কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[৩৭]

৩৩. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا (কুরআনান আরাবিয়ান) : আরবি কুরআন।

---

৩১. সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ০১।
৩২. সূরা ৪১ ফুস্‌সিলাত : আয়াত ৪১।
৩৩. সূরা ৫০ কাফ : আয়াত ০১।
৩৪. সূরা ৮৫ আল বুরুজ : আয়াত ২১-২২।
৩৫. সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১৫৫।
৩৬. সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৫০।
৩৭. সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ০২।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

অর্থ: আর এমনি করে আমরা তোমার প্রতি অহি করেছি একটি আরবি কুরআন (an Arabic Quran)।[৩৮]

৩৪. بَشِيْرٌ (বাশীর) : সুসংবাদদাতা (good news giver)।

৩৫. نَذِيْرٌ (নাযীর) : সতর্ককারী (warner)।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ○ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج

অর্থ: এটি একটি কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, এটি আরবি কুরআন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে; এটি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী।[৩৯]

৩৬. اَلْمَوْعِظَةُ (আল মাওয়িযা) : উপদেশ, ওয়ায (good advice)।

৩৭. اَلشِّفَاءُ (আশ্‌শিফা) : নিরাময় (healing)।

৩৮. اَلْهُدٰى (আল হুদা) : পথ নির্দেশ (guidance)।

৩৯. اَلرَّحْمَةُ (আর রাহমাহ্) : অনুকম্পা (mercy)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ○

অর্থ: হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে একটি মাওয়িযা (উপদেশ) এবং অন্তরে যেসব আছে সেগুলোর নিরাময়, আর এসেছে একটি পথ-নির্দেশ ও একটি অনুকম্পা মুমিনদের জন্যে।[৪০]

৪০. اَلْاَنْبَاءُ (আল আন্‌বা) : সংবাদ, খবর (news)।

৪১. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ (হিকমাতুন বালিগাহ) : পরিপূর্ণ জ্ঞান (perfect wisdom)।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ○ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ

অর্থ: অবশ্যি তাদের কাছে এসেছে 'সংবাদ' যাতে রয়েছে সাবধান বাণী, আর পরিপূর্ণ জ্ঞান (perfect wisdom)।[৪১]

৪২. حَبْلُ اللّٰهِ (হাবলুল্লাহ) : আল্লাহর রজ্জু (the rope of Allah)।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

অর্থ: তোমরা সবাই মিলে শক্ত করে ধরো 'আল্লাহর রজ্জু' এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।[৪২]

৪৩. اَلرُّوْحُ (রূহ্) : আত্মা, অহি (spirit, revelation)।

---

৩৮. সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত ০৭।
৩৯. সূরা ৪১ হামিম আস্ সাজদা : আয়াত ৩-৪।
৪০. সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৫৭।
৪১. সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ৪-৫।
৪২. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৩।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

অর্থ: এমনি করে আমি তোমার প্রতি অহি করেছি আমার নির্দেশের একটি 'রূহ'।[৪৩]

৪৪. اَلْوَحِىْ (আল অহি) : প্রত্যাদেশ (revelation)। قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ

অর্থ: তুমি বলো : আমি তোমাদের সতর্ক করছি অহি দ্বারা।[৪৪]

৪৫. النَّبَا الْعَظِيْمِ (আন নাবাউল আযীম) : মহাসংবাদ (great news)।

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ○ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ○

অর্থ: তারা কী বিষয়ে (পরস্পরকে) জিজ্ঞাসা করছে? 'মহা সংবাদ' সম্পর্কে?[৪৫]

৪৬. اَلْعِلْمُ (আল ইল্‌ম) : জ্ঞান, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান (the knowledge)।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ ۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

অর্থ: তোমার কাছে 'আল ইল্‌ম' আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো, তবে তো তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।[৪৬]

৪৭. اَلْحَقُّ (আল হক) : মহাসত্য (the truth)।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

অর্থ: আমি তোমাকে মহাসত্য (the truth) দিয়ে পাঠিয়েছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।[৪৭]

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে তারা জানে এটি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মহাসত্য।[৪৮]

৪৮. اَلصِّدْقُ (আসসিদ্‌ক) : মহাসত্য (the truth)।

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ○

অর্থ: আর যে ব্যক্তি (অর্থাৎ মুহাম্মদ) 'মহাসত্য' নিয়ে এসেছে এবং যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই মুত্তাকি।[৪৯]

৪৯. اَلْعَدْلُ (আদল) : ন্যায়, ন্যায্য, সুষম (justice)।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج

অর্থ: আর 'সিদক' (truth) ও 'আদল' (justice) হিসেবে পরিপূর্ণ হয়েছে তোমার প্রভুর বাণী। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই।[৫০]

---

৪৩. সূরা ৪২ আশ্‌ শূরা : আয়াত ৫২।
৪৪. সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৪৫।
৪৫. সূরা ৭৮ আন নাবা : আয়াত ১-২।
৪৬. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৪৫ শেষাংশ।
৪৭. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১১৯।
৪৮. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৬।
৪৯. সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৩৩।
৫০. সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১১৫।

৫০. اَمْرُ اللّٰهِ (আমরুল্লাহ) : আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহর বিধান (command of Allah)।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ط

অর্থ: এটি আল্লাহর নির্দেশ, তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন।[৫১]

৫১. اٰيٰتِ اللّٰهِ (আয়াতুল্লাহ) : আল্লাহর আয়াত (verses of Allah)।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط

অর্থ: (আর তিনি পাঠিয়েছেন) একজন রসূল, যে তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে বের করে আনার উদ্দেশ্যে।[৫২]

৫২. بَصَائِرُ (বাসায়ির) : প্রমাণসমূহ (evidences)।

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ○

অর্থ: এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে 'বাসায়ির' এবং পদনির্দেশ ও অনুকম্পা- যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে।[৫৩]

৫৩. الْمُهَيْمِنُ (মুহাইমিন) : সংরক্ষক, সাক্ষী, বিশ্বস্ত।

৫৪. الْمُصَدِّقُ (মুসাদ্দিক) : সমর্থক, সত্যায়নকারী।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

অর্থ: আর আমি তোমার প্রতি আল কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহ, এ কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।[৫৪]

৫৫. صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ সিরাতুম মুস্তাকিম : সরল সঠিক পথ (straight path)।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج

অর্থ: আর নিশ্চয়ই এটি আমার 'সরল সঠিক পথ' (straight path)। সুতরাং তোমরা এটির অনুসরণ করো।[৫৫]

يٰسٓ○ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ○ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ○ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ○

অর্থ: ইয়াসিন! কুরআনুল হাকিমের শপথ, নিশ্চয়ই তুমি রসূলদেরই একজন,

---

৫১. সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৫।
৫২. সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ১১।
৫৩. সূরা ০৭ আল আ'রাফ : আয়াত ২০৩।
৫৪. সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৪৮।
৫৫. সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৫৩। আরো দেখুন : ৬ : ১২৬, ১৬১।

সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো, যা দয়াময় পরাক্রমশালীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[৫৬]

৫৬. اَلْعَلِيُّ (আল আলি) : মহান, উচ্চ মর্যাদাবান (exalted)।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ○

অর্থ: এটি (এ কুরআন) আমার কাছে 'উম্মুল কিতাবে' সংরক্ষিত রয়েছে, এটি মহান, উচ্চ মর্যাদাবান ও বিজ্ঞানময়।[৫৭]

৫৭. رِسٰلٰتُ اللّٰهِ (রিসালাতুল্লাহ) : আল্লাহর বার্তা।

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ

অর্থ: তারা প্রচার করতো আল্লাহর বার্তা এবং তাঁকে ভয় করতো।[৫৮]

৫৮. حُجَّةُ اللّٰهِ الْبَالِغَةُ (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ) : আল্লাহর পূর্ণাংগ প্রমাণ (perfect proof of Allah)।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ○

অর্থ: বলো : পূর্ণাংগ প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন।[৫৯]

৫৯. اَلْقَيِّمُ (আল কায়্যিম) : সরল-সঠিক, সুপ্রতিষ্ঠিত (straight)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا○ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর দাসের প্রতি 'আল কিতাব' নাযিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোনো প্রকার বক্রতা। (বরং তিনি এটিকে করেছেন) কায়্যিম-সরল-সঠিক-সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে.....।[৬০]

৬০. اَلْبَيَانُ (আল বয়ান) : পরিষ্কার বার্তা, সুস্পষ্ট বার্তা, সুস্পষ্ট বর্ণনা (plain statement)। هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ○

অর্থ: এটি (এই কুরআন) মানুষের জন্যে একটি 'সুস্পষ্ট বার্তা' এবং মুত্তাকিদের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি ও উপদেশ।[৬১]

---

৫৬. সূরা ৩৬ ইয়াসিন : আয়াত ১-৫।
৫৭. সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ০৪।
৫৮. সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ৩৯।
৫৯ . সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৪৯।
৬০. সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ১-২।
৬১. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৩৮।

৬১. قُرْاٰنًا عَجَبًا (কুরআনান আজাবা) : চমৎকার পাঠ (wonderful recitation) :

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا○

অর্থ: বলো : আমাকে অহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে : একদল জিন মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে : 'আমরা শুনে এসেছি এক চমৎকার পাঠ।'[৬২]

৬২. عُرْوَةُ الْوُثْقٰى (উরওয়াতুল উসকা) : নির্ভরযোগ্য হাতল।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

অর্থ: যে অস্বীকার করবে তাগুতকে আর ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, সে আঁকড়ে ধরবে এক নির্ভরযোগ্য হাতল, ...।[৬৩]

৬৩. صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (সুহুফান মুতাহ্হারা) : পবিত্র গ্রন্থ (purified book)।

৬৪. كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (কুতুবুন কায়্যিমা) : সরল-সঠিক-সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।

৬৫. اَلْبَيِّنَةُ (আল বাইয়্যিনা) : সুস্পষ্ট প্রমাণ (clear evidence)।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً○ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ○ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ○

অর্থ: (সে হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল, সে তিলাওয়াত করে 'পবিত্র গ্রন্থ', তাতে রয়েছে 'সরল-সঠিক-সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।' ইতোপূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা তো পৃথক হয়ে গেলো ঠিক তখন, যখন তাদের কাছে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' (আল কুরআন) এলো।[৬৪]

৬৬. اَلْمُكَرَّمَةُ (আল মুকাররমা) : সম্মানিত, মর্যাদাবান (noble)।

৬৭. صُحُفٌ مُّكَرَّمَةٌ (সুহুফুন মুকাররমা) : মর্যাদাবান গ্রন্থ।

৬৮. اَلْمَرْفُوْعَةُ (মারফুয়া) : উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন (exalted in dignity)।

৬৯. اَلْمُطَهَّرَةُ (মুতাহ্হারা) : পবিত্র, বিশুদ্ধ।

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ○ فَمَنْ شَاۤءَ ذَكَرَهٗ○ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ○ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ○

অর্থ: না (তোমাদের কথা ঠিক নয়), বরং এটি একটি তাযকিরা (উপদেশবাণী)। যার ইচ্ছা সে এর প্রতি মনোযোগী হোক। এটি রয়েছে মর্যাদাবান গ্রন্থে। এটি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র ও বিশুদ্ধ।[৬৫]

৭০. اَلْكَرِيْمُ (আল করিম) : সম্মানিত, মর্যাদাবান।

---

৬২. সূরা ৭২ জিন : আয়াত ০১

৬৩. সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৫৬।

৬৪. সূরা ৯৮ আল বায়্যিনা : আয়াত ২-৪।

৬৫. সূরা ৮০ আবাসা : আয়াত ১১-১৪।

৭১. اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمِ (আল কুরআনুল করিম) : মর্যাদাব্যঞ্জক আবৃত্তি।

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ○ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ○

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি আল কুরআন, সম্মানিত (অথবা : নিশ্চয়ই এটি মর্যাদাব্যঞ্জক আবৃত্তি)। এটি রয়েছে সুরক্ষিত কিতাবে।[৬৬]

৭২. مُنَادِىْ মুনাদি) : আহ্বায়ক । رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমরা শুনেছি, এক আহ্বায়ক (কুরআন অথবা মুহাম্মদ সা.) আহ্বান করছে ঈমানের দিকে..... ।[৬৭]

৭৩. اَلْبُشْرٰى (আল বুশরা) : সুসংবাদ (good news)।

৭৪. اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ (আয়াত আল কুরআন) : আল কুরআনের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ○ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ○

অর্থ: এগুলো কিতাবুম মুবিন এবং আল কুরআনের আয়াত, পথ নির্দেশ এবং মুমিনদের জন্যে বুশরা-সুসংবাদ।[৬৮]

৭৫. اَلْبَيِّنٰتِ (আল বাইয়্যেনাত) : সুস্পষ্ট প্রমাণ clear proof.

৭৬. بَيِّنٰتُ الْهُدٰى (বাইয়্যেনাতুল হুদা) : হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ (clear proof of guidance)।

৭৭. هُدًى لِلنَّاسِ (হুদাল্লিন নাস) : মানুষের পথ প্রদর্শক, মানুষের দিশারি, মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি (guidance for mankind)।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন যা মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পার্থক্যকারী (সত্য ও মিথ্যার)।[৬৯]

৭৮. اَلْبَلَاغ (আল বালাগ) : বার্তা (message)।

৭৯. بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ (বালাগুন লিন্নাস) : মানুষের জন্যে একটি বার্তা (a message for mankind)। هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ

অর্থ: এটি (কুরআন) মানব জাতির জন্যে একটি বার্তা।[৭০]

৮০. اَلْقَصَصُ (আল কাসাস) : বৃত্তান্ত (narrative)।

৮১. اَلْقَصَصُ الْحَقُّ (আল কাসাসুল হক): সত্য, সঠিক ও বাস্তব বৃত্তান্ত (true

---

৬৬. সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া : আয়াত ৭৭-৭৮।
৬৭. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৯৩।
৬৮. সূরা ২৭ আন নামল : আয়াত ১-২।
৬৯. সূরা ২ আল বাকারা। আয়াত ১৮৫।
৭০ . সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ৫২।

narrative)। إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ط

অর্থ: অবশ্য অবশ্যি এটি সত্য-সঠিক ও বাস্তব বৃত্তান্ত। আর (জেনে রাখো) কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ ছাড়া।[৭১]

৮২. اَلْمِيْزَانُ (আল মিযান) : ন্যায়দন্ড, সুষম বিধান (the balance, the justice)।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ

অর্থ: তিনিই সেই মহান আল্লাহ, যিনি নাযিল করেছেন সত্যসহ আল কিতাব এবং আল মিযান।[৭২]

৮৩. كِتَابُ اللّٰهِ (কিতাবুল্লাহ) : আল্লাহর কিতাব (book of Allah)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ○

অর্থ: তুমি কি ঐসব লোকদের দেখছো না, যাদেরকে আল কিতাবের অংশ বিশেষ প্রদান করা হয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) দিকে ডাকা হচ্ছে যেনো তা তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়? অতপর তাদের একটি গ্রুপ মুখ ফিরিয়ে নিলো। মূলত এরা (সত্য) বিমুখ।[৭৩]

৮৪. نِعْمَةُ اللّٰهِ (নি'মাতুল্লাহ) : আল্লাহ্র অনুগ্রহ (favour of Allah)।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি তোমাদের দীন, সম্পূর্ণ করে দিয়েছি 'আমার অনুগ্রহ' (কুরআন) আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে মনোনীত করেছি দীন হিসেবে।[৭৪]

৮৫. كِتَابٌ مَّسْطُوْرٌ (কিতাবুন মাস্তুর) : ছত্রে ছত্রে লেখা কিতাব।

وَالطُّوْرِ○ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ○

অর্থ: শপথ তুর (পাহাড়)-এর আর সেই কিতাবের যা ছত্রে ছত্রে লিখিত।[৭৫]

৮৬. اَلْمَتْلُوْا (মাতলু) : তিলাওয়াতকৃত, আবৃত্ত (recited)।

৮৭. اَلْاٰيَاتُ (আল আয়াত) : আয়াত, আল্লাহর আয়াত (verses)।

৮৮. اَلذِّكْرُ الْحَكِيْمِ (আয যিকরুল হাকিম) : জ্ঞানময় উপদেশ (wise reminder)। ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ○

---

৭১. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৬২।
৭২. সূরা ৪২ আশ শূরা : আয়াত ১৭।
৭৩. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ২৩।
৭৪. সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৩।
৭৫. সূরা ৫২ আত তুর : আয়াত ১-২।

অর্থ: আমি যে তোমার প্রতি তিলাওয়াত করছি, এ হলো 'আল আয়াত' এবং যিক্‌রুল হাকিম।[৭৬]

৮৯. ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ (জিকরুল লিল আলামিন) : জগদ্বাসীর জন্যে উপদেশ।

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلعٰلَمِيْنَ○ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ○

অর্থ: এটি (আল কুরআন) জগদ্বাসীর জন্যে একটি উপদেশ। সহসাই তোমরা এর প্রদত্ত সংবাদের সত্যতা অবশ্যি জানতে পারবে।[৭৭]

৯০. اَلْهَادِىْ (আল হাদি) : পথ প্রদর্শনকারী (guide)।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

অর্থ: তারা (জিনেরা) বললো : আমরা শুনে এসেছি মূসার পরে অবতীর্ণ একটি কিতাব। একটি সত্যায়নকারী তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং পথ প্রদর্শনকারী মহাসত্যের দিকে এবং সরল সঠিক পথের দিকে।[৭৮]

৯১. اَنْبَاءُ الْغَيْبِ (আনবাউল গায়ব) : গায়েবের সংবাদ, অদৃশ্য সংবাদ (news of the unseen)।

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ج مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ط

অর্থ: এটা হলো গায়েব-এর সংবাদ তোমার প্রতি আমি অহি করছি। ইতোপূর্বে তোমার কিংবা তোমার কওমের এটা জানা ছিল না।[৭৯]

❖❖❖

৭৬. সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৫৮।
৭৭.. সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৮৭-৮৮।
৭৮. সূরা ৪৬ আল আহকাফ : আয়াত ৩০।
৭৯. সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৪৯। আরো দ্রষ্টব্য : সূরা ১২ : আয়াত ১০২।

অনুচ্ছেদ ৯

আল কুরআনের সূরা ও আয়াত

কুরআন মজিদে একশত চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশানুযায়ী সূরা সমূহের পরম্পরা বা ক্রমিক ধারাবাহিকতা বিন্যাস করেছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর হিজরতের পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে মক্কী আর হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরাসমূহকে মাদানি সূরা বলা হয়। অবশ্য কোনো কোনো সূরায় মক্কী মাদানি আয়াতের সংমিশ্রণ রয়েছে। আবার কয়েকটি সূরা মক্কী না মাদানি বর্ণনাগত কারণে সে বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানে কুরআনের ১১৪টি সূরার নাম উল্লেখ করবো। সেই সাথে সূরাটি মক্কী না মাদানি তাও উল্লেখ করবো। তবে তার আগে মক্কী ও মাদানি সূরার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

১. মক্কী ও মাদানি সূরা

অবতীর্ণের স্থান অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন অংশ বা সূরাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। ইবনুল আরাবি তাঁর 'আন নাসেখ ওয়াল মানসুখ' গ্রন্থে এরূপ ভাগ করেছেন : ১. মক্কী ২. মাদানি ৩. সফরি ৪. হদরি ৫. লাইলি ৬. নাহারি ৭. আসমানি ৮. যমিনি ৯. আসমান ও যমীনের মাঝখানের এবং ১০. গুহার।

ইবনে নকিব তাঁর তফসিরের ভূমিকায় চার ভাগে ভাগ করেছেন : ১. মক্কী ২. মাদানি ৩. আংশিক মক্কী আংশিক মাদানি এবং ৪. মক্কীও নয় মাদানিও নয় এমন।

মূলত মৌলিকভাবে কুরআনকে অবতীর্ণের স্থান অনুযায়ী দু'ভাগেই ভাগ করা যায়: মক্কী ও মাদানি।

আবার মক্কী ও মাদানি ভাগ করার ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। যেমন :

১. হিজরতের পূর্বে মক্কায় যেসব সূরা ও অংশ নাযিল হয়েছে তা-ই মক্কী এবং হিজরতের পরে যা নাযিল হয়েছে তা সবই মাদানি। চাই তা মক্কায় নাযিল হোক কিংবা মদিনায়।

২. মক্কায় যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সবই মক্কী, তা হিজরতের পূর্বে হোক কিংবা পরে। আর মদিনায় যা কিছু নাযিল হয়েছে, তাই মাদানি।

৩. মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে যা নাযিল হয়েছে তা-ই মক্কী, তা হিজরতের পরে হোক কিংবা পূর্বে। আর মদিনায় যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা সবই মাদানি।

ইবনে সায়াদ তাঁর 'তবকাতে' ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি উবাই ইবনে কায়াবের নিকট মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মদিনায় সাতাশটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, বাকি সবগুলো নাযিল হয়েছে মক্কায়।

জালালুদ্দীন সূয়ুতি তাঁর অমূল্য গ্রন্থ আল ইতকানে এ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো বর্ণনায় সাতাশটি, কোনো বর্ণনায় ২৬টি, কোনো কোনো বর্ণনায় ২৮টি এবং কোনো বর্ণনায় ২৯টি মাদানি সূরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কয়েকটি সূরা এমন আছে, যেগুলোর মক্কী বা মাদানি হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনাগত ইখতেলাফ রয়েছে। আবার বেশ কয়েকটি সূরা এমনও আছে যেগুলোতে মক্কী ও মাদানি আয়াতের সংমিশ্রণ আছে।

সহীহ বুখারিতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : "কসম সেই আল্লাহর যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবে এমন একটি আয়াতও নেই যেটি সম্পর্কে আমি জানি না যে তা কাদের উপস্থিতিতে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে।"

কাযী আবু বকর তাঁর ইন্তেসার গ্রন্থে লিখেছেন : 'মক্কী এবং মাদানি সূরার পরিচয়ের উৎস হলেন সাহাবায়ে কিরাম রা.। রসূল সা. থেকে এ ব্যাপারে কোনো কথা পাওয়া যায়না। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশিত হননি। আর মক্কী এবং মাদানি সূরা জানা আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য ফরয করে দেননি।'[১]

২. মক্কী ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

রসূলে করিম সা.-এর নবুয়্যতি যিন্দেগির দু'টি মৌলিক অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে হিজরতের পূর্বে মক্কায় তের বছরের যিন্দেগি। মদিনার দশ বছরের যিন্দেগি হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায়ে রসূল সা.কে দু'ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়। সেই পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হতে থাকে। সে কারণে দু'অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'রকম মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সকল কুরআন অধ্যয়নকারী এবং তফসিরকারকদের এসব বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। কারণ সূরার বৈশিষ্ট্য জানলে সূরার মূল শিক্ষা উপলব্ধি করা সহজ হয়।

মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. রসূল সা.-কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

২. জীবন ও জগত সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও সঠিক বিশ্বাস সৃষ্টি। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে পেশ করা। তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বেশি চর্চা।

৩. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তা শক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. প্রাথমিক সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ ও ঝর্ণাধারার মতো ঝরঝরে, ছোট ছোট

১. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল ইকতান ফী উলূমিল কুরআন, ১ম খন্ড, প্রথম অধ্যায়।

ছন্দময় আয়াত অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্ত হবার যোগ্য, অতি উন্নত সাহিত্য।

৫. মক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনের হেদায়াতপূর্ণ। তাতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আইন বিধান নেই। শুধু শেষ দিকে সমাজ গঠনের ইঙ্গিতমূলক কথা ম্যানিফেস্টো আকারে আছে। অতীতে বিভিন্ন জাতির নিকট নবীর আগমন ও নবীদের প্রতি জনগণের আচরণের ভিত্তিতে তাদের উত্থান পতনের বর্ণনা (ইতিহাস শেখার জন্য নয়) ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

৬. কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতার বিভিন্ন অবস্থায় ধৈর্যের উপদেশ, বিরোধিতার জবাব ও মোকাবিলা করার পন্থা।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য হলো :

১. দীর্ঘ সূরা (অধিকাংশ)।

২. সমাজ গঠনের বিধান।

৩. ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকার বিধান, বিয়ে তালাক, যাকাত, লেনদেন ইত্যাদির নিয়ম কানুন।

৪. দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি রচনা।

৫. মুনাফিক, কাফির, জিম্মি, আহলে কিতাব, যুদ্ধমান শত্রু, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ জাতির প্রতি আচরণ-এর মূলনীতি।

৬. জয় পরাজয়, বিপদ, শান্তি, নিরাপত্তা, ভীতি ইত্যাদি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য।

৩. সূরা ও আয়াত : সংখ্যা, তালিকা, মক্কী, মাদানি

ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম আরবি	সূরার নাম বাংলা	মক্কী মাদানি	আয়াত সংখ্যা
১	اَلْفَاتِحَةِ	আল ফাতিহা	মক্কী	৭
২	اَلْبَقَرَةِ	আল বাকারা	মাদানি	২৮৬
৩	اٰلِ عِمْرَانَ	আলে ইমরান	মাদানি	২০০
৪	اَلنِّسَاءِ	আন নিসা	মাদানি	১৭৬
৫	اَلْمَائِدَةِ	আল মায়িদা	মাদানি	১২০
৬	اَلْاَنْعَامِ	আল আন'আম	মক্কী	১৬৫
৭	اَلْاَعْرَافِ	আল আ'রাফ	মক্কী	২০৬
৮	اَلْاَنْفَالِ	আল আনফাল	মাদানি	৭৫
৯	اَلتَّوْبَةِ	আত তাওবা	মাদানি	১২৯
১০	يُوْنُسَ	ইউনুস	মক্কী	১০৯
১১	هُوْدٍ	হুদ	মক্কী	১২৩

ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম আরবি	সূরার নাম বাংলা	মক্কী/ মাদানি	আয়াত সংখ্যা
১২	يُوْسُف	ইউসুফ	মক্কী	১১১
১৩	اَلرَّعْد	আর রাআদ	মাদানি	৪৩
১৪	اِبْرٰهِيْمَ	ইবরাহিম	মক্কী	৫২
১৫	اَلْحِجْر	আল হিজর	মক্কী	৯৯
১৬	اَلنَّحْل	আন নাহল	মক্কী	১২৮
১৭	بَنِىْٓ اِسْرَائِلَ	বনি ইসরাঈল	মক্কী	১১১
১৮	اَلْكَهْف	আল কাহাফ	মক্কী	১১০
১৯	مَرْيَم	মরিয়ম	মক্কী	৯৮
২০	طٰهٰ	তোয়াহা	মক্কী	১৩৫
২১	اَلْاَنْبِيَاء	আল আম্বিয়া	মক্কী	১১২
২২	اَلْحَجّ	আল হজ্জ	মাদানি*[২]	৭৮
২৩	اَلْمُؤْمِنُوْنَ	আল মু'মিনুন	মক্কী	১১৮
২৪	اَلنُّوْر	আন নূর	মাদানি	৬৪
২৫	اَلْفُرْقَان	আল ফুরকান	মক্কী	৭৭
২৬	اَلشُّعَرَاءُ	আশ শোয়ারা	মক্কী	২২৭
২৭	اَلنَّمْلُ	আন নাম্‌ল	মক্কী	৯৩
২৮	اَلْقَصَص	আল কাসাস	মক্কী	৮৮
২৯	اَلْعَنْكَبُوْت	আল আনকাবূত	মক্কী	৬৯
৩০	اَلرُّوْم	আর রূম	মক্কী	৬০
৩১	لُقْمٰن	লুকমান	মক্কী	৩৪
৩২	اَلسَّجْدَة	আস সাজদা	মক্কী	৩০
৩৩	اَلْاَحْزَاب	আল আহযাব	মাদানি	৭৩
৩৪	سَبَا	সাবা	মক্কী	৫৪
৩৫	فَاطِر	ফাতির	মক্কী	৪৫

২. তারকা চিহ্নিত সূরাগুলো মক্কায় না মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে বর্ণাগত কারণে মতপার্থক্য পাওয়া যায়। তবে এখানে প্রসিদ্ধ মতই গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ২৮টি সূরা মাদানি এবং বাকিগুলো মক্কী দেখানো হয়েছে। মদিনাস্থ বাদশাহ ফাহাদ কুরআন ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কুরআন শরীফেও মাদানি সূরা এই ২৮টি দেখানো হয়েছে।

সূরার ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম আরবি	সূরার নাম বাংলা	মক্কী/ মাদানি	আয়াত সংখ্যা
৩৬	يٰسٓ	ইয়াসীন	মক্কী	৮৩
৩৭	اَلصّٰفّٰتِ	আস সাফফাত	মক্কী	১৮২
৩৮	صٓ	সোয়াদ	মক্কী	৮৮
৩৯	اَلزُّمَرُ	আয্ যুমার	মক্কী	৭৫
৪০	اَلْمُؤْمِنُ	আল মু'মিন	মক্কী	৮৫
৪১	حٰمٓ السَّجْدَةُ	হামীম আস সাজদা	মক্কী	৫৪
৪২	اَلشُّوْرٰى	আশ শূরা	মক্কী	৫৩
৪৩	اَلزُّخْرُفُ	যুখরুফ	মক্কী	৮৯
৪৪	اَلدُّخَانُ	আদ দুখান	মক্কী	৫৯
৪৫	اَلْجَاثِيَةُ	আল জাসিয়া	মক্কী	৩৭
৪৬	اَلْاَحْقَافُ	আল কাহাফ	মক্কী	৩৫
৪৭	مُحَمَّدٌ	মুহাম্মদ	মাদানি	৩৮
৪৮	اَلْفَتْحُ	আল ফাতাহ	মাদানি	২৯
৪৯	اَلْحُجُرٰتُ	আল হুজুরাত	মাদানি	১৮
৫০	قٓ	কা-ফ	মক্কী	৪৫
৫১	اَلذّٰرِيٰتُ	আয্ যারিয়াত	মক্কী	৬০
৫২	اَلطُّوْرُ	আত তূর	মক্কী	৪৯
৫৩	اَلنَّجْمُ	আন নাজম	মক্কী	৬২
৫৪	اَلْقَمَرُ	আল কামার	মক্কী	৫৫
৫৫	اَلرَّحْمٰنُ	আর রাহমান	মাদানি*	৭৮
৫৬	اَلْوَاقِعَةُ	আল ওয়াকিয়া	মক্কী	৯৬
৫৭	اَلْحَدِيْدُ	আল হাদীদ	মাদানি	২৯
৫৮	اَلْمُجَادَلَةُ	আল মুজাদালা	মাদানি	২২
৫৯	اَلْحَشْرُ	আল হাশর	মাদানি	২৪
৬০	اَلْمُمْتَحَنَةُ	আল মুমতাহিনা	মাদানি	১৩
৬১	اَلصَّفُّ	আস সফ	মাদানি	১৪

সূরার ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম আরবি	সূরার নাম বাংলা	মক্কী মাদানি	আয়াত সংখ্যা
৬২	اَلْجُمُعَةُ	আল জুমুআ	মাদানি	১১
৬৩	اَلْمُنٰفِقُوْنَ	আল মুনাফিকুন	মাদানি	১১
৬৪	اَلتَّغَابُنِ	আত তাগাবুন	মাদানি	১৮
৬৫	اَلطَّلَاقِ	আত তালাক	মাদানি	১২
৬৬	اَلتَّحْرِيْمِ	আত তাহরিম	মাদানি	১২
৬৭	اَلْمُلْكِ	আল মুল্‌ক	মক্কী	৩০
৬৮	اَلْقَلَمِ	আল কলম	মক্কী	৫২
৬৯	اَلْحَاقَّةُ	আল হাক্কাহ	মক্কী	৫২
৭০	اَلْمَعَارِجِ	আল মায়ারিজ	মক্কী	৪৪
৭১	نُوْحٍ	নূহ	মক্কী	২৮
৭২	اَلْجِنِّ	আল জিন	মক্কী	২৮
৭৩	اَلْمُزَّمِّلِ	আল মুয্‌যামমিল	মক্কী	২০
৭৪	اَلْمُدَّثِّرِ	আল মুদ্দাস্‌সির	মক্কী	৫৬
৭৫	اَلْقِيٰمَةِ	আল কিয়ামাহ	মক্কী	৪০
৭৬	اَلدَّهْرِ	আদ দাহার	মাদানি*	৩১
৭৭	اَلْمُرْسَلٰتِ	আল মুরসালাত	মক্কী	৫০
৭৮	اَلنَّبَاِ	আন নাবা	মক্কী	৪০
৭৯	اَلنّٰزِعٰتِ	আন নাযিয়াত	মক্কী	৪৬
৮০	عَبَسَ	আবাসা	মক্কী	৪২
৮১	اَلتَّكْوِيْرِ	আত তাকবীর	মক্কী	২৯
৮২	اَلْاِنْفِطَارِ	আল ইনফিতার	মক্কী	১৯
৮৩	اَلْمُطَفِّفِيْنَ	আল মুতাফ্‌ফিফীন	মক্কী	৩৬
৮৪	اَلْاِنْشِقَاقِ	আল ইনশিকাক	মক্কী	২৫
৮৫	اَلْبُرُوْجِ	আল বুরূজ	মক্কী	২২
৮৬	اَلطَّارِقِ	আত তারিক	মক্কী	১৭
৮৭	اَلْاَعْلٰى	আল আ'লা	মক্কী	১৯

ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম আরবি	সূরার নাম বাংলা	মক্কী/ মাদানি	আয়াত সংখ্যা
৮৮	اَلْغَاشِيَة	আল গাশিয়া	মক্কী	২৬
৮৯	اَلْفَجْر	আল ফজর	মক্কী	৩০
৯০	اَلْبَلَد	আল বালাদ	মক্কী	২০
৯১	اَلشَّمْس	আশ শামস	মক্কী	১৫
৯২	اَللَّيْل	আল লাইল	মক্কী	২১
৯৩	اَلضُّحٰى	আদ দোহা	মক্কী	১১
৯৪	اَلْاِنْشِرَاحْ	আল ইনশিরাহ	মক্কী	৮
৯৫	اَلتِّيْنِ	আত তীন	মক্কী*	৮
৯৬	اَلْعَلَق	আল আলাক	মক্কী	১৯
৯৭	اَلْقَدْر	আল ক্বদর	মক্কী*	৫
৯৮	اَلْبَيِّنَة	আল বাইয়্যেনা	মাদানি*	৮
৯৯	اَلزِّلْزَالِ	আয্ যিলযাল	মাদানি*	৮
১০০	اَلْعٰدِيٰتِ	আল আদীয়াত	মক্কী*	১১
১০১	اَلْقَارِعَة	আল ক্বারিয়া	মক্কী	১১
১০২	اَلتَّكَاثُرِ	আত তাকাসুর	মক্কী*	৮
১০৩	اَلْعَصْرِ	আল আস্‌র	মক্কী*	৩
১০৪	اَلْهُمَزَة	আল হুমাযাহ	মক্কী	৯
১০৫	اَلْفِيْل	আল ফীল	মক্কী	৫
১০৬	قُرَيْشٍ	কুরাইশ	মক্কী*	৪
১০৭	اَلْمَاعُوْن	আল মাউন	মক্কী*	৭
১০৮	اَلْكَوْثَرِ	আল কাউসার	মক্কী*	৩
১০৯	اَلْكٰفِرُوْنَ	আল কাফিরূন	মক্কী*	৬
১১০	اَلنَّصْرِ	আন নাস্‌র	মাদানি	৩
১১১	اَللَّهَبِ	আল লাহাব	মক্কী	৫
১১২	اَلْاِخْلَاص	আল ইখলাস	মক্কী*	৪
১১৩	اَلْفَلَق	আল ফালাক	মক্কী*	৫
১১৪	اَلنَّاس	আন নাস	মক্কী*	৬
মোট		১১৪	৮৬+২৮	৬২৩৬

অনুচ্ছেদ ১০

আল কুরআন : ঈমান ও ইত্তেবা

মহান আল্লাহ মানব জাতির হিদায়াত, নাজাত ও সার্বিক কল্যাণের জন্যে আল কুরআন পাঠিয়েছেন। এ কিতাবের প্রতি তিনি মানুষের যেসব কর্তব্য নির্ধারন করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে দুটি কর্তব্য প্রধান ও মৌলিক। বাকিগুলো সে দুইটির অন্তর্ভুক্ত। সে দুটি কর্তব্য হলো :

১. আল্লাহর কিতাব হিসেবে এটির প্রতি ঈমান আনা।

২. এই কিতাবের অনুসরণ, অনুবর্তন তথা ইত্তেবা করা।

১. ঈমান বিল কুরআন

ঈমানের অপরিহার্য অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের প্রতি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনা। মুক্তি লাভের জন্যে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ তায়ালা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারেনা, মুসলিম হতে পারেনা। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল কিতাব বা আল কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

অর্থ: পুণ্য রয়েছে কেবল ঐ ব্যক্তির জন্যে যে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি এবং নবীদের প্রতি।[১]

রসূল এবং মুমিনগণ কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছেন :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط

অর্থ: রসূল, তার প্রতি তার রব-এর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, সেটির প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুমিনরাও।[২]

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ○
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

অর্থ: এবং যারা ঈমান আনে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে সেটির প্রতি আর যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে এবং আখিরাতের প্রতি একীন রাখে, তারাই তাদের প্রভুর নির্দেশিত সঠিক পথে রয়েছে আর তারাই হবে সফলকাম।[৩]

তাই স্বয়ং মানুষের স্রষ্টাই মানুষকে আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনার জন্যে

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৭৭।
২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ২৮৫।
৩. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ৪-৫।

আহ্বান জানিয়েছেন : فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ط

অর্থ: অতএব, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূর (আল কুরআন)-এর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।[৪]

মহান আল্লাহ আহলে কিতাবদেরও (ইহুদি খৃস্টানদেরও) জানিয়ে দিয়েছেন আখেরি নবীর উপর অবতীর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান না আনলে তাদের মুক্তি হবেনা এবং তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَا

অর্থ: ওহে, যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, তোমাদের নিকট যা (যে কিতাব) আছে, তার সমর্থক হিসেবে আমি যা (যে কুরআন) নাযিল করেছি, সেটির প্রতি তোমরা ঈমান আনো আমি মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত করে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বেই।[৫]

গোটা মানব জাতির পথ প্রদর্শক আল কুরআন। গোটা মানবজাতির মুক্তির পথ আল কুরআন। পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি আল কুরআন। চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান আল কুরআন। মুমিন হবার জন্যে ঈমানের যে ক'টি বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে ঈমান বিল কিতাব একটি। আল্লাহর কালাম আল কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের জন্য সেটির প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। যে সকল দিক থেকে আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন :

১. একথার উপর পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করতে হবে যে, কুরআন যেভাবে যে অর্থে অবতীর্ণ হয়েছিল, হুবহু সে অর্থেই তা সুরক্ষিত রয়েছে :

وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থ: তোমার প্রতি তোমার রবের কিতাব থেকে যা কিছু অহি পাঠানো হয়েছে, তার তিলাওয়াত করো, তাঁর বাণী পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।[৬]

২. কুরআন অবতরণে কোনো শয়তানি শক্তির বিন্দু পরিমাণও দখল নেই :

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ○ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ○

অর্থ: এ কিতাব (আল কুরআন) শয়তান অবতরণ করেনি। এটা তাদের কাজও নয়, আর এ কাজের সাধ্যও তাদের নেই। বরং অহি শোনা থেকেও তাদের বিতাড়িত করে দেয়া হয়।[৭]

---

৪. আল কুরআন, সূরা ৬৪ তাগাবুন : আয়াত ৮।
৫. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৪৭।
৬. আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ২৭
৭. আল কুরআন, সূরা ২৬ আশ শোয়ারা : আয়াত ২১০-২১২

৩. কুরআন পূর্ণরূপে আল্লাহর অহি, এতে স্বয়ং নবীর কামনা বাসনারও স্থান নেই :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى○

অর্থ: সে (নবী) নিজের খেয়াল খুশি মতো কিছুই বলছেনা, বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ অহি।[৮]

৪. কুরআনে মিথ্যা ও অসত্যের আদৌ ঠাঁই নেই, এটি মহাবিজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় সত্তার অবতীর্ণ দুর্জয় কিতাব :

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ○ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ○

অর্থ: নিশ্চিতরূপে এ এক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত কিতাব, মিথ্যা বাতিল না এর সম্মুখ থেকে আসতে পারে আর না পিছন থেকে। এ এক মহাবিজ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।[৯]

৫. এ কুরআন আগা গোড়া সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই :

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ○

অর্থ: নিসন্দেহে এ কিতাব নিশ্চিত সত্য।[১০]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ج

অর্থ: এ কিতাবে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।[১১]

৬. কুরআনের পরিপন্থী সবই বর্জনীয়। কেবলমাত্র কুরআনকেই অনুসরণ করতে হবে :

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

অর্থ: তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তারই অনুসরণ অনুবর্তন করো এবং সেটাকে ছেড়ে অন্যান্য কর্তাদের মাত্রই অনুসরণ করোনা।[১২]

২. আল কুরআনের ইত্তেবা

কোনো মানব রচিত গ্রন্থ কোনো অবস্থাতেই মানুষের জীবন বিধান হতে পারেনা। অন্যদিকে আসমানি গ্রন্থাবলির মধ্যে অনেকগুলোই এখন অনুপস্থিত। আর যেগুলো বর্তমানে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কুরআন ছাড়া আর কোনো কিতাবই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই। সেগুলো ভাষা ও বক্তব্য সবদিক থেকেই বিকৃত, সংশয়যুক্ত ও সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। সেগুলো এখন সন্দেহযুক্ত সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রচারক। সর্বোপরি এসব গ্রন্থে এখন আর মানবতার পূর্ণ জীবন বিধান বর্তমান নেই। আবুল আ'লা মওদূদী রহ. কুরআন সম্পর্কে বলেন :

১. রসূলুল্লাহ সা. যে ভাষায় কুরআন পেশ করেছিলেন, তা ঠিক সে ভাষায়ই সুরক্ষিত আছে। প্রথম দিন থেকে শত সহস্র লক্ষ মানুষ প্রত্যহ তা তিলাওয়াত

৮. আল কুরআন, সূরা ৫৩ আন নাজম : আয়াত ৩-৪
৯. আল কুরআন, সূরা ৪১ ফুসসিলাত : আয়াত ৪১-৪২
১০. আল কুরআন, সূরা ৬৯ আল হাক্কাহ : আয়াত ৫১
১১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ০২
১২. আল কুরআন, সূরা ২ আর আ'রাফ : আয়াত ০৩

করছে। হামেশা তার কপি লিপিবদ্ধ করে আসছে। কখনো তার অর্থ বা বাচনে পার্থক্য দেখা দেয়নি। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো শোবা সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ সা.-এর যবান থেকে যে কুরআন শোনা গিয়েছিল, তা-ই আজও দুনিয়ায় বর্তমান এবং চিরকাল বর্তমান থাকবে। এতে কখনো না হয়েছে একটি শব্দের রদবদল আর না হতে পারে।

২. কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা আজো একটি জীবন্ত ভাষা। আজও দুনিয়ায় কোটি কোটি আরবি ভাষাভাষী মানুষ বর্তমান। কুরআন অবতীর্ণকালে যেসব পুস্তক এ ভাষার শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সাহিত্য ছিলো, আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। মৃত ভাষাগুলোর পুস্তকাদি বুঝতে আজ যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, এসব সাহিত্যের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সেরকম কোনো অসুবিধা নেই।

৩. কুরআন পুরোপুরি সত্য ও অভ্রান্ত এবং আদ্যপান্ত খোদায়ী শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এতে কোথাও মানবীয় আবেগ, প্রবৃত্তির লালসা, জাতীয় বা গোত্রীয় স্বার্থপরতা এবং মুর্খতা জাত গোমরাহির চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। এর ভিতর খোদায়ী কালামের সংগে মানবীয় কালাম অনুপরিমাণও মিশ্রিত হতে পারেনি।

৪. এতে তামাম মানব জাতিকেই আহ্বান করা হয়েছে এবং এমন আকিদা বিশ্বাস ও আচরণবিধি পেশ করা হয়েছে, যা কোনো দেশ, জাতি এবং যুগ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এর প্রতিটি শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন, তেমনি শাশ্বত।

৫. পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থাবলীতে যেসব সত্যতা, মৌলিকতা এবং কল্যাণ ও সুকৃতির কথা বিবৃত হয়েছিল, এতে তার সবই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে এমন কোনো সত্য ও সুকৃতির উদ্ধৃত করা যাবেনা আল কুরআনে যার উল্লেখ নেই। এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বর্তমানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমস্ত গ্রন্থ থেকে মুখাপেক্ষাহীন হয়ে যায়।

৬. কুরআন হচ্ছে আসমানি হেদায়াত ও খোদায়ী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ গ্রন্থ (latest edition)। অতীতের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব বিধি ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিল, এতে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে অতীতের গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত, এমন অনেক নতুন শিক্ষা সংযোজিত করা হয়েছে।

এসব কারণেই ইসলাম তামাম গ্রন্থাবলী থেকে অনুবৃত্তির সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল কুরআনকেই অনুসরণের উপযোগী ঘোষণা করেছে এবং একমাত্র এ গ্রন্থকেই অনুসরণ অনুকরণ করার এবং কর্মবিধি ও কর্মপ্রণালী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তামাম দুনিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে।[১৩]

৩. কুরআনের প্রতি সামগ্রিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন মানুষের জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে। তাই কুরআনের প্রতি মুমিনদের রয়েছে কতগুলো অতি অবশ্য কর্তব্য। সেগুলো হলো :

---

১৩. আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামি তাহযিব আওর উস্‌কে উসূল ও মবাদি।

১. আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা এবং কুরআনের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।
২. কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখা, নিয়মিত তিলাওয়াত করা এবং যতোটা সম্ভব স্মৃতিতে ধারন করা।
৩. কুরআন বুঝা এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা।
৪. কুরআনের অনুসরণ করা এবং এর গাইডেন্স অনুযায়ী জীবন-যাপন করা।
৫. নিজ পরিবার পরিজনসহ অন্যদেরকে কুরআন শিখানো ও বুঝানো।
৬. কুরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করা।
৭. কুরআনের ভিত্তিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে যাওয়া।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযান মাস, এ মাসেই অবতীর্ণ করা হয়েছে আল কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য 'হুদা' (সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশিকা) হিসেবে এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও পথ নির্দেশিকার প্রমাণ ও মানদণ্ড হিসেবে।[১৪]

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○

অর্থ: আমি যাদের 'আল কিতাব' (আল কুরআন) দিয়েছি, তারা তা তিলাওয়াত করে তিলাওয়াতের হক আদায় করে। তারাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর যারা এর প্রতি কুফুরি করে (অস্বীকৃতি জানায়), তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।[১৫]

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

অর্থ: আর আমাদের অবতীর্ণ এ কিতাব সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাই তোমরা এটিকে অনুসরণ করো, মেনে চলো এবং (এতে প্রদত্ত) নির্দেশ অমান্য করাকে ভয় করো। এভাবেই তোমরা (আল্লাহর) অনুকম্পা লাভ করতে সক্ষম হবে।[১৬]

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○ يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

অর্থ: আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলো (নবী মুহাম্মদ সা.) এবং একটি সত্য ও সঠিক পথ প্রকাশকারী কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তোষ সন্ধানকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান এবং নিজের ইচ্ছায় তিনি

---

১৪. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৮৫।
১৫. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১২১।
১৬. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম : আয়াত ১৫৫।

তাদের বের করে আনেন সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আর তাদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে (to the straight way)।[১৭]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ○

অর্থ: আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যা প্রতিটি জিনিসের পরিষ্কার বিবরণ সম্বলিত। তাছাড়া আত্মসমর্পণকারীদের জন্য এটি একটি শাশ্বত জীবন পদ্ধতি, একটি অনুকম্প এবং সুসংবাদ।[১৮]

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ: আমি আমার রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি আল কিতাব আর সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি, যাতে করে মানবজাতি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯]

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ: এটি একটি কিতাব। তোমার প্রতি আমরা এটি নাযিল করেছি যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে বের করে আনতে পারো।[২০]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا○

অর্থ: অবশ্যি এ কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা পুরোপুরি সরল সুদৃঢ় ও সঠিক। তাছাড়া যেসব মুমিন যোগ্যতার সাথে সংস্কার-সংশোধনের কাজ করে, কুরআন তাদের এ সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শুভ প্রতিদান।[২১]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ○

অর্থ: আমার পক্ষ থেকে আল কিতাবে (কুরআনে) পরিষ্কার বিবরণ দেয়ার পরও যারা আমার নাযিল করা স্পষ্ট নির্দেশাবলী ও জীবন পদ্ধতি (মানুষের কাছে প্রচার না করে) গোপন করে রাখে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং সকল অভিশাপ প্রদানকারীদের অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে।[২২]

❖❖❖

১৭. আল কুরআন, সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ১৫-১৬।
১৮. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নাহল : আযাত ৮৯।
১৯. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদীদ : আয়াত ২৫।
২০. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ১।
২১. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইস্‌রা : আয়াত ০৯।
২২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : ১৫৯।

অনুচ্ছেদ ১১

আল কুরআন প্রসঙ্গে কিছু তথ্য

আল কুরআনে রয়েছে অসংখ্য তথ্য, আর আল কুরআন সম্পর্কেও রয়েছে অনেক অনেক তথ্য। উৎসুক পাঠকদের জন্যে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি তথ্য প্রদান করা হলো :

১. আল কুরআন নাযিল হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' থেকে। 'উম্মুল কিতাব' আল্লাহর কাছে লওহে মাহফুযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ ও সুরক্ষিত।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সা.-এর নিকট কুরআন নিয়ে এসেছেন জিবরিল। জিবরিলকে কুরআনে 'রূহুল আমিন' (বিশ্বস্ত আত্মা) এবং 'রূহুল কুদ্‌স' (পবিত্র আত্মা) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. কুরআন নাযিল হয়েছে মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি। ৫৭১ খৃস্টাব্দে তিনি জাজিরাতুল আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী রসূল আসবেনা।

৪. আল কুরআন মানব জাতির জন্যে আল্লাহর অবতীর্ণ সর্বশেষ কিতাব। তাই আল্লাহ এ কিতাবকে সুসংরক্ষিত রেখেছেন।

৫. মুহাম্মদ-যার প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে তিনি এবং তাঁর কওম ছিলো আরবি ভাষী, তাই কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবি ভাষায়। (দ্রষ্টব্য সূরা ৪১ : আয়াত ৪৪)

৬. শুধু কুরআন নয়, সব রসূলের প্রতিই তাঁদের নিজ নিজ জাতির ভাষায় কিতাব নাযিল করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য সূরা ১৪ : আয়াত ০৪)

৭. আল কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪। এর মধ্যে ২৮ মতান্তরে ২৯টি মদিনায় নাযিল হয়েছে, বাকিগুলো নাযিল হয়েছে মক্কায়।

৮. আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ (ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশ)।

৯. কুরআন নাযিলের সূচনা হয় ৪১ হস্তি সনের রমযান মাস মোতাবেক ৬১০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে।

১০. কুরআনের প্রথম অহি সূরা ৯৬ আল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত।

১১. আল কুরআনের সর্বশেষ আহি (আয়াত) হলো সূরা ২ আল বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত।

১২. কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হয় ১০ হিজরি সনের জিলহজ্জ মাস মোতাবেক ৬৩২ খৃস্টাব্দে।

১৩. ১২ হিজরি সনে আবু বকর রা.-এর খিলাফত আমলে কুরআনের সর্বস্বীকৃত পূর্ণাংগ গ্রন্থ সংকলন করা হয়। এর পূর্বে কুরআন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা ছিলো।

১৪. হিজরি ২০ সনে উসমান রা. এর খিলাফত আমলে কুরআনের কুরাইশি লুগাত বহাল করে অন্যসব পঠনরীতি বর্জন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। একই সালে খলিফা উসমান রা. কুরাইশি লুগাতে আবু বকর রা. কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কপির অনুলিপি তৈরি করিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন।

১৫. আলী রা.-এর খিলাফত আমলে অথবা তার কিছু পরে আবুল আসওয়াদ দোয়েলি কুরআনে বিশেষ ধরনের স্বরচিহ্ন (হরকত) বসিয়ে দেন।

১৬. অবশেষে অনারব মুসলমানদের কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশক্রমে হিজরি ৭৫ সনে নসর বিন আসেম ইয়াহইয়া ও খলিল বিন আহমদ প্রমুখ কুরআন মজিদে কারক, কর্মকারক, করণকারক ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্নভাবে চিনার উদ্দেশ্যে শব্দের শেষ বর্ণে বর্তমানে প্রচলিত স্বরচিহ্ন (হরকত)সমূহ বসিয়ে দেন। এ সময়ে সমরূপ বিশিষ্ট বর্ণগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্যে তারা নোকতার প্রচলনও শুরু করেন।

১৭. একই সনে কুরআনকে পারা, রুকু এবং পারাকে রুবুউ, নিসফ এবং ছোলুছে বিভক্ত করার চিহ্ন ব্যবহার করা আরম্ভ হয়। তিলাওয়াতকারীদের সুবিধার্থে এরূপ করা হয়।

১৮. ৮৬ হিজরিতে আল কুরআনের সকল হরফে বর্তমানে প্রচলিত হরকত চালু করা হয়।

১৯. কুরআন মজিদে তিলাওয়াতের সাজদা সংখ্যা ১৪টি। ইমাম শাফেয়ীর মতে সাজদা সংখ্যা ১৫টি।

২০. কুরআনের সবচাইতে বড় সূরা আল বাকারা, সূরা ২, আয়াত সংখ্যা ২৮৬।

২১. কুরআনের সবচাইতে ছোট সূরা আল কাওছার, সূরা ১০৮, আয়াত ৩। এ ছাড়া সূরা ১০৩ এবং সূরা ১১০-এর আয়াত সংখ্যাও-৩।

২২. কুরআনে একজন সাহাবির নাম উল্লেখ হয়েছে। তিনি যায়েদ রা.

২৩. কুরআনে মুহাম্মদ সা.সহ ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে।

২৪. কুরআনে নবীর শত্রুদের মধ্যে আবু লাহাবের নাম উল্লেখ হয়েছে।

২৫. কুরআনে একজন মহিলার নাম উল্লেখ হয়েছে, তিনি ঈসা আ.-এর মা মরিয়ম। তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরারও নামকরণ করা হয়েছে। সূরা-১৯।

২৬. কুরআনে 'আন নিসা' অর্থাৎ 'নারী' বা 'মহিলা' নামে একটি সূরা রয়েছে। সূরা নম্বর-৪।

২৭. কুরআনের প্রথম সূরা 'আল ফাতিহা' এবং শেষ সূরা 'আন নাস'।

❖❖❖

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাফসিরুল কুরআন

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ: আর আমি তোমার প্রতি আয্ যিক্‌র (আল কুরআন) নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে (ব্যাখ্যা করে) বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে-যা (যে বিধান) তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে করে তারা চিন্তা-ফিকির করে দেখতে পারে। (আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪)

অনুচ্ছেদ ১

কুরআন অনুধাবনের অপরিহার্যতা ও তফসির

১. অনুধাবন ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে

ইসলাম মানব জাতির জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম হলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করার বিধান।

যেহেতু ইসলাম জীবন যাপনের বিধান, সে জন্যে তা জানা ও বুঝা ছাড়া পালন ও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আর আল কুরআনই ইসলামি জীবন বিধানের মূল ম্যানুয়েল বা গাইডবুক। এ কিতাবই ইসলামি জ্ঞানের মূল উৎস এবং মূলসূত্র। তাই একজন মুসলিম-এর জন্যে ইসলামি জীবন বিধানের-

১. অনুসরণ অপরিহার্য। আর

২. অনুসরণের জন্যে অনুধাবন অপরিহার্য।

কারণ, কোনো কিছুই না বুঝে প্রয়োগ এবং ব্যবহার করা যায় না। যে কেউ আল কুরআনকে জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে গ্রহণ করবে, তাকে অবশ্যি প্রথমে এ কিতাবকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, অনুধাবন করতে হবে। অতপর তা যথাযথভাবে প্রয়োগ, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মুমিনের জন্যে কুরআনের ব্যাপারে তিনটি জিনিস সমভাবে অপরিহার্য-ফরয :

১. আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান আনা।

২. কুরআন জানা, বুঝা, অনুধাবন করা এবং

৩. সামগ্রিক জীবনে কুরআনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা।

কুরআন মজিদে যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে[১] বলা হয়েছে, যেমন কুরআনকে অনুসরণ করতে[২] বলা হয়েছে, ঠিক তেমনি কুরআনকে বুঝতে এবং অনুধাবন ও উপলব্ধি করতেও বলা হয়েছে :

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

অর্থ: এ এক কল্যাণময় কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, মানুষ যেনো এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা (ponder) করে এবং বুঝ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা (men of understanding) যেনো উপদেশ গ্রহণ করে।[৩]

---

১. দ্রষ্টব্য : আল কুরআন ২:৪, ২:৪১, ৪:৪৭, ৬৪:৮।

২. দ্রষ্টব্য : আল কুরআন ৭:৩, ৩৯:৫৫, ৬:১৫৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ২৯।

এ আয়াতে কুরআন নাযিলের অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা ও কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। আর একথা সুস্পষ্ট, কোনো বিষয় অনুধাবন করলেই কেবল তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রশ্ন আসে। এ আয়াত থেকে পরিষ্কার হলো-

১. প্রথমেই কুরআন বুঝতে হবে, অনুধাবন করতে হবে।
২. দ্বিতীয়ত, কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা (ও গবেষণা) করতে হবে।
৩. তৃতীয়ত, উপদেশ গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ মেনে চলতে হবে।

যারা কুরআনরে মর্ম অনুধাবন-উপলব্ধি করে না, কুরআন তাদের তিরস্কার করে :

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا○

অর্থ: তবে কি তারা মনোনিবেশ সহকারে কুরআন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না? নাকি (কুরআন অনুধাবনে) তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[৪]

২. অনুধাবন ছাড়া আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য করা যায়না

কুরআন নাযিলের মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনেই অন্যত্র বলা হয়েছে :

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ○

অর্থ: আলিফ-লাম-রা (হে মুহাম্মদ!) এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে, স্বপ্রশংসিত সর্বশক্তিমানের পথে।[৫]

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো, মানব সমাজকে এর সাহায্যে অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে বের করে আনা। আলো মানে- আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের জ্ঞান এবং আল্লাহর পথ। এখন চিন্তা করার বিষয় হলো, কুরআন যদি লোকেরা না-ই বুঝলো, কুরআনের মর্ম যদি তাদের অন্তরে প্রবেশ না-ই করলো, তাহলে তো তারা 'আলো' দেখতে পেলো না, আল্লাহর পথ চিন্‌তে পারলো না। সুতরাং আলো আর অন্ধকার তাদের কাছে একই হয়ে থাকলো। অনুধাবন বা জ্ঞান ছাড়া আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য করা যায় না।

তাই এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য হলো, আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের আলো তথা আল্লাহর পথের পরিচয় মানুষকে জানাতে হবে, এর জ্ঞান মানুষকে দিতে হবে এবং এ পথের ধারণা মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

---

৪. আল কুরআন, সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : আয়াত ২৪।
৫. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ০১।

৩. অনুধাবনের জন্যেই আল্লাহ রসূলের জাতির ভাষায় কিতাব পাঠান

এই আলো বিতরণ করার জন্যে তথা আল্লাহর পথের পরিচয় মানুষকে জানানোর জন্যে আল্লাহ পাক রসূলগণের কাছে তাঁদের নিজ নিজ কওমের ভাষায় তাদের কাছে বার্তা (কিতাব) পাঠিয়েছেন। রসূলগণ তাঁদের জাতির ভাষায় জাতিকে আল্লাহর কিতাব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন :

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থ: আমি একজন রসূলও পাঠাইনি তার কওমের ভাষায় ছাড়া, যাতে করে সে (তাদেরকে) আমার বার্তা পরিষ্কারভাবে (ব্যাখ্যা করে) বুঝিয়ে দিতে পারে। অতপর (বুঝিয়ে দেয়ার পরই) আল্লাহ যাকে চাইবেন বিপথগামী করবেন, আর যাকে চাইবেন সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী। এই প্রক্রিয়ায়ই আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ নিয়ে তার কওমরে কাছে পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে : তোমার কওমকে বের করে আনো অন্ধকার রাশি থেকে আলোতে.....।[৬]

এ দুটি আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, মহান আল্লাহ মানুষের জন্যে কিতাব বা বার্তা পাঠিয়েছেন মানুষের বুঝার জন্যে এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। এখান থেকে একথাও বুঝা গেলো যে, মানুষকে আল্লাহর বার্তা বুঝিয়ে দিতে হবে মানুষের মাতৃভাষায়, জাতীয় ভাষায়, যে ভাষা মানুষ সহজেই বুঝে।

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-কেও মানুষকে কুরআন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন :

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ: আর আমি তোমার প্রতি আয্ যিক্‌র (আল কুরআন) নাযিল করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে (ব্যাখ্যা করে) বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে-যা (যে বিধান) তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে করে তারা চিন্তা-ফিকির করে দেখতে পারে।[৭]

সুতরাং কুরআন নিয়ে ভাবতে হলে এবং এর উপদেশ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যি কুরআন জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে।

মানুষের বুঝার জন্যেই আল্লাহ পাক কুরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন :

---

৬. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইবরাহিম : আয়াত ০৪-০৫।
৭. আল কুরআন, সূরা ১৬ আল নহল : আয়াত ৪৪।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

কুরআন মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্যে প্রতিষ্ঠিত মদিনাস্থ বাদশা ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত The Noble Quran-এ আয়াতটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

"And indeed, We have made the Qur'an easy to understand and remember; then is there any that will remember (or receive admonition)?"[৮]

৪. কুরআন বুঝা এবং বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই তফসির

আমরা কুরআন থেকেই কুরআন বুঝার অপরিহার্যতা জানতে পারলাম। আর কুরআন সঠিকভাবে বুঝা ও অনুধাবন করার জন্যেই প্রয়োজন কুরআনের তফসির বা ব্যাখ্যা। বিশেষ বিশেষ শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য বুঝার জন্যে অবশ্যি সেগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, প্রেক্ষাপট ও পটভূমি, পূর্বাপর বক্তব্য ও বক্তার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর যথার্থ অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য উন্মুক্ত ও স্পষ্ট করতে হয়। আর এভাবে কুরআনের শব্দ, আয়াত ও বক্তব্যের অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য উন্মুক্ত ও স্পষ্ট করার নামই তফসির বা তাফসিরুল কুরআন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বক্তব্য সামনে আসছে।

এভাবে তফসির করা ছাড়া কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ নয়, কঠিন। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু:সাধ্য।

মুমিনদের জন্যে কুরআন অনুসরণ এবং অনুধাবন যেহেতু অপরিহার্য, সেজন্যেই রসূলুল্লাহ সা.-কে আল্লাহ পাক কুরআন বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি কুরআনের ব্যাখ্যা ও তফসির করে করে সাহাবিগণকে কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্যাখ্যা ও তফসির করে তিনি যে কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন সে কথাও কুরআনেই বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে। যেমন :

- সে তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দান করে (৩:১৬৪) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
- যেনো তুমি মানুষকে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও (১৬:৪৪) لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
- যেনো তুমি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও (১৬:৬৪) لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
- لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
- যেনো তুমি কিতাব দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়সালা করে দাও (৪:১০৫)

এ আয়াতগুলোর ভিত্তিতে কুরআন মজিদের তফসির করা রসূলুল্লাহ সা.-এর কেবল অধিকারই ছিল না; বরং এটা ছিলো তাঁর উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

৮. আল কুরআন, সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০।

অনুচ্ছেদ ২

রসূলুল্লাহ সা. নিজেই ছিলেন কুরআনের তফসির এবং মুফাস্‌সির

১. রসূল সা. কুরআন পরিষ্কার করে উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে পাঠাবার কালেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি যুগে যুগে মানুষের জন্যে হিদায়াত বা জীবন-যাপনের বিধান পাঠাবেন। মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের মধ্য থেকেই যুগে যুগে নবী রসূল নিযুক্ত করে তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জীবন-যাপনের জন্যে হিদায়াত ও পথ নির্দেশ পাঠাতে থাকেন।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্‌র সর্বশেষ রসূল। তাঁর মাধ্যমেই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে নিজের মনোনীত জীবন-যাপন পদ্ধতি আল কুরআন নাযিল করেছেন। এ আল কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন যাপনের একমাত্র 'গাইড বুক'। এ গ্রন্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং পরকালের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনা এবং এটিকে ভালোভাবে জানা, বুঝা ও মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ।

আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ সা.-কে তাঁর আখেরি রসূল নিযুক্ত করে তাঁর কাছে কুরআন নাযিল করেছেন। তবে মুহাম্মদ সা. কুরআনের শুধুমাত্র বাহকই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একাধারে-

১. আল কুরআনের বাহক – convayor (আল কুরআন ৫:৯২)।
২. কুরআনের ভিত্তিতে আল্লাহর দিকে আহবায়ক (one who invites) ৩৩:৪৬।
৩. সুসংবাদ দাতা (bearer of glad tidings) ৩৩ : ৪৫।
৪. সতর্ককারী (warner) ৩৩ : ৪৫।
৫. বাস্তব সাক্ষ্য (witness) ৩৩ : ৪৫।
৬. আল কুরআনের অনুসরণকারী (follower of the Quran) ৪৬:৭, ৭:২০৩।
৭. আল কুরআনের শিক্ষক (৩ : ১৬৪)।
৮. আল কুরআনের ব্যাখ্যাতা (১৬ : ৪৪)।
৯. কুরআন দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের পরিশোধনকারী (৩ : ১৬৪)।
১০. কুরআনের বিধান প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠাকারী (৫৭ : ২৫, ৯ : ৩৩)।
১১. আল কুরআনের বাস্তব নমুনা (৩৩ : ৪৫)।
১২. শরিয়া প্রণেতা (৭ : ১৫৭)।

রসূল সা.-এর এ দায়িত্বগুলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত :

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ○

অর্থ: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসূলের আনুগত্য করো আর সতর্ক হও (আল্লাহকে ভয় করো); এরপরও যদি অবাধ্য হও, তবে জেনে রেখো, আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেয়া।[১]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থ: হে নবী! আমি তোমাকে (রসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে (as witness), সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে (as a bearer of glad tidings and as a warner) এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী (and as one who invites to Allah by His leave) ও এক উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে (and as a lamp spreading light)।[২]

قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج

অর্থ: তুমি বলে দাও : আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি, আমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা আমাকে অহি করা হয়।[৩]

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

অর্থ: অবশ্যি আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়ে, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশুদ্ধ ও উন্নত করে, তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ্র প্রশিক্ষণ প্রদান (instruct) করে; যদিও এর পূর্বে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই নিমজ্জিত ছিলো।[৪]

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থ: আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে 'আল হুদা' (আল কুরআন) এবং সত্য ও বাস্তব জীবন-ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন অন্য সকল ব্যবস্থার উপর সেটিকে জয়যুক্ত করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা এ কাজকে অপছন্দ করে।[৫]

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

---

১. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৯২।
২. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ৪৫-৪৬।
৩. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াতাংশ ২০৩।
৪. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪। এছাড়া : ২:১২৯, ১৫১ এবং ৬২: ০২ আয়াত।
৫. আল কুরআন, সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৩৩। এছাড়াও দ্রষ্টব্য : আয়াত ৪৮:২৮ এবং ৬১:০৯।

الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

অর্থ: এই রসূল নিরক্ষর নবী তাদের নন্দিত-অনুমোদিত কাজের নির্দেশ দেয়, নিন্দিত-অবৈধ কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, তাদের জন্যে বৈধ ঘোষণা করে ভালো ও পবিত্র সবকিছু, অবৈধ ঘোষণা করে নোংরা-অপবিত্র সবকিছু এবং তাদের মুক্ত করে তাদের উপর চেপে থাকা বোঝা, বন্ধন ও শৃংখলসমূহ থেকে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান করবে, সাহায্য করবে এবং অনুসরণ করবে তার সাথে অবতীর্ণ নূর-এর, তারাই হবে সফলকাম।[৬]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

অর্থ: অবশ্যি আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে রয়েছে অনুসরণের জন্যে উত্তম উপমা (good example), যারা (সাক্ষাতের) আশা করে আল্লাহ্‌র এবং পরকালের আর অধিক অধিক স্মরণ করে আল্লাহকে।[৭]

২. রসূল সা. ছিলেন কুরআনের তফসির ও মুফাস্‌সির

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ সা. ছিলেন কুরআনের মুফাস্‌সির, মূল ও প্রকৃত মুফাস্‌সির, আল্লাহর নিযুক্ত মুফাস্‌সির। কুরআনের মুফাস্‌সির হিসেবেই তিনি আল্লাহর বার্তা আল কুরআন সুস্পষ্ট করে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, এর বাস্তব সাক্ষী হয়েছেন। এর আলোকে মানুষকে সুসংবাদ দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন। উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে এর আলো বিতরণ করেছেন। এর হুবহু অনুসরণ করেছেন, মানুষকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন মানুষকে এর অনুসৃত পন্থা শিখিয়েছেন। এর আলোকে মানুষকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করেছেন। মুমিনদেরকে এই কিতাব এবং কিতাবের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এই কিতাবের বিধানকে অন্যসব মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর জয়যুক্ত করার আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। এর আলোকে বিশ্বাসীদেরকে শরিয়া তথা বিধি বিধান প্রদান করেছেন। ভালো ও বৈধ কাজে নির্দেশ দিয়েছেন, মন্দ ও অবৈধ কজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ভালো এবং পবিত্র সবকিছু বৈধ ঘোষণা করেছেন, নোংরা ও অপবিত্র সবকিছু অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সমাজের ঘাড়ে চেপে থাকা মানব রচিত অন্যায় অবাস্তব প্রথা প্রচলন, রসম রেওয়াজ ও ঐতিহ্য সমূহের বন্ধন ও বোঝা থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত করেছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিজেকে আল কুরআনের বাস্তব নমুনা ও অনুসরণযোগ্য উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মূলত এসবই ছিলো আল কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। ফলে তাঁকে দেখে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে শুনে, তাঁর কর্মনীতি,

---

৬. আল কুরআন, সূরা ০৭ আল আ'রাফ : আয়াতাংশ ১৫৭।
৭. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আল আহযাব : আয়াত ২১।

পর্মপন্থা ও কর্মকৌশল অবলোকন করে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ অনুকরণ করে মুমিনরা সহজেই কুরআন উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি ছিলেন মূলত কুরআনেরই জীবন্ত তফসির, বরং তিনি ছিলেন বাস্তব কুরআন। এ জন্যেই উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেছিলেন :

'তাঁর জীবনাচরণ ছিলো (বাস্তব) কুরআন।'[৮] كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ .

আমাদের কাছে এখন একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রা. কুরআন অনুধাবন ও উপলব্ধি করেছিলেন তফসির পড়েই। আর তাঁদের তফসির ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা.। তাঁরা তাঁকে পড়ে পড়ে কুরআন উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাঁকে দেখে, শুনে, প্রশ্ন করে কুরআন বুঝেছেন, কুরআন অনুধাবন করেছেন। তিনিই ছিলেন তাঁদের তফসির।

মূলত তফসির ছাড়া কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। কুরআন বুঝার জন্যে প্রয়োজন তফসির। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তফসিরের সাহায্যেই কুরআন বুঝেছিলেন। আজো কুরআন বুঝতে হলে তফসিরের মাধ্যমেই কুরআন বুঝতে হবে এবং ভবিষ্যতেও।

৩. রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে তফসির হস্তান্তরিত হয়ে আসছে

রসূল সা. নিজেই কুরআনের প্রথম মুফাস্‌সির। তফসিরের সূচনা তাঁর থেকেই :

ولقد نشاء التفسير مبكرًا فى عصر النبى ص الذى كان اول شارح لكتاب الله.

অর্থ: তফসির শাস্ত্রের সূচনা হয় রসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে। তিনিই ছিলেন আল্লাহর কিতাবের প্রথম ব্যাখ্যাতা।[৯]

রসূল সা.-এর নিকট থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসিরুল কুরআন হস্তান্তরিত হয় সাহাবায়ে কিরামের নিকট। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াতুল্লাহু আনহুম আল কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট থেকেই-

১. কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন,
২. কুরআন বুঝে নিয়েছেন,
৩. তাঁর সংগি ও সাথি হিসেবে কুরআন বাস্তবায়ন করেছেন,
৪. কুরআন মানার ক্ষেত্রে তাঁর নমুনা অনুসরণ করেছেন,
৫. পরবর্তী লোকদের কাছে কুরআন বহন করেছেন,
৬. পরবর্তী লোকদের কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন,
৭. পরবর্তী লোকদের কাছে কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

যুগের পর যুগ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এ ধারা চলতে থাকে এবং থাকবে।

---

৮. হাফিজ আবু শাইখ ইসপাহানি : আখলাকুন নবী।
৯. ড. সুবহি সালেহ : মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন।

তবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে এবং এক যুগ থেকে পরবর্তী যুগে কুরআনের এই জ্ঞান ধারা হস্তান্তর (transfer) মাধ্যম-এর ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে। তাছাড়া প্রতি যুগেই কুরআনের ব্যাখ্যাও সমৃদ্ধতর হতে থেকেছে মানব ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার সমূহের বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ সন্নিবেশনের মাধ্যমে। আর এ সমৃদ্ধতর হতে থাকার বিষয়ে স্বয়ং কুরআনেই ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে :

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط

অর্থ: আমি মহাবিশ্বে (in the universe) এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের দেখাতে থাকবো, এমনকি তাদের কাছে একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এটি (কুরআন) মহাসত্য।"[১০]

এভাবে কুরআন শিক্ষা ও তফসিরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের যুগ থেকেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে যে-

ক. একদল মনিষী কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, অন্যরা তাদের নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

খ. একদল মনিষী কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বা তফসির করেছেন এবং অন্যরা তাদের থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তফসিরসহ কুরআন বুঝে নিয়েছেন।

কুরআনি জ্ঞানের এই হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে উন্নতি সাধিত হয়েছে :

১. প্রথম যুগে অর্থাৎ সাহাবি ও তাবেয়িগণের যুগে এ প্রক্রিয়া ছিলো প্রধানত মৌখিক বর্ণনাগত। লিখিত প্রক্রিয়া ছিলো নগণ্য।

২. পরবর্তীকালে মৌখিক প্রক্রিয়ার সাথে হস্তলিখিত প্রক্রিয়া যুক্ত হয়।

৩. এরপর মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কুরআনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা (তফসির) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হতে থাকে।

৪. আধুনিককালে মৌখিক ও প্রিন্টিং প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে ইলেক্ট্রোনিক অর্থাৎ অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া। বর্তমানে ভিসিডি, ডিভিডি, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ওয়েবসাইট ইত্যাদি মাধ্যমেও কুরআনের ব্যাখ্যা প্রচার হচ্ছে।

❖❖❖

১০. আল কুরআন, সূরা ৪১ হামিম আস সাজদা : আয়াত ৫৩।

অনুচ্ছেদ ৩

তফসির কী?

১. তফসির

কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম। এ কালামকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন। কেবল বেবুঝ তিলাওয়াত করার জন্যে এ কালাম নাযিল করা হয়নি। এ কালামকে বুঝতে হবে, অনুশীলন করতে হবে। এ কালাম নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি দিক পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ভাষা জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর কালাম বুঝা সম্ভব নয়। আল কুরআনকে বুঝতে হবে, বুঝতে হবে এ কালামের লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও মূল শিক্ষাকে। যে মহাপুরুষের প্রতি এ কালাম নাযিল হয়েছে তাঁকে জানতে হবে। তিনি এ কালাম যে অর্থে বুঝেছিলেন, সেটাই এর সঠিক ও একমাত্র অর্থ। তিনি তাঁর বাণী ও কর্মে এ কিতাবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা-ই এর সঠিক ও একমাত্র ব্যাখ্যা। মোট কথা, তাঁর চরিত্রই এ কুরআনের বাস্তব রূপ। এসব বিস্তারিত বিষয়ে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে কুরআন বুঝা সব মানুষের জন্যে সম্ভব নয়। তাই এসব বিষয়ে যারা জ্ঞানের অধিকারী হন, গোটা মানব সমাজের কাছে আল কুরআনের তাৎপর্য ও শিক্ষা তুলে ধরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা করে যে শিক্ষার আলোচনা করা হয় এবং যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় তা-ই হলো তফসির।

আল কুরআনের তফসির করার জন্যে একজন মুফাস্‌সিরকে কতিপয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তার মধ্যে থাকতে হয় কিছু প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য। সাথে সাথে কিছু শর্তও তার মধ্যে পাওয়া যেতে হয়। এ সবের পরিপূর্ণতাই তাকে মুফাস্‌সিরে পরিণত করে। এ সম্পর্কিত ব্যাপক জ্ঞান বিজ্ঞানকে বলা হয় 'উলূমুল কুরআন' ও 'উসূলুত তাফসির'।

কুরআন সংক্রান্ত ইল্‌ম এক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। খুব একাগ্র, সচেতন ও সত্যনিষ্ঠ বিবেকই এ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। ইল্‌ম ও আমলের খুলুসিয়াত ও উচ্চতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যেসব বান্দাহকে 'ইল্‌মে মুহিবাহ' বা দান হিসেবে যে বিশেষ ইল্‌ম দান করেন, কেবলমাত্র তারাই আল্লাহর কিতাবের তফসির করার যোগ্যতা হাসিল করেন। আর এ দান লাভের জন্য বান্দাহকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়।

২. তফসির-এর আভিধানিক অর্থ

তফসির (تفسير) শব্দটি ف- س - ر (ফাসারা) শব্দমূল (مادة) থেকে গঠিত হয়েছে। এর অর্থ- উন্মুক্ত করা, উন্মোচন করা, প্রকাশ করা, উদঘাটন করা। আল ইফরিকি তাঁর লিসানুল আরব গ্রন্থে তফসির (تفسير) শব্দের এ অর্থই করেছেন।

খ্যাতনামা কুরআন শাস্ত্র বিশারদ জালালুদ্দীন সুয়ুতির মতে فَسَرَ এবং سَفَرَ এই উভয় শব্দমূল থেকেই تفسير শব্দটি গঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, سفر মানে বাহ্যিক প্রমাণ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য দেখে মর্ম উদঘাটন করা। আর فسر মানে কারো বা কোনো কিছুর অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে তার তাৎপর্য উন্মোচন করা।[১]

এর উদাহরণ হলো ডাক্তার ও রোগী। ডাক্তার রোগীর বাহ্যিক লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রমাণাদি দেখেও রোগ নির্ণয় করেন। আবার কখনো বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও রোগ উদঘাটন করে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন।

এই উভয় প্রক্রিয়ায় কোনো কিছুর প্রকৃত তাৎপর্য উন্মুক্ত, উন্মোচন, উদঘাটন ও প্রকাশ করাকেই তফসির (تفسير) বলা হয়। এটা তফসির-এর আভিধানিক অর্থ। এটাই কুরআনের প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের সঠিক পন্থা।

৩. তফসির-এর পারিভাষিক অর্থ

বিভিন্ন মুফাস্‌সির এবং কুরআন শাস্ত্রবিদ তফসির-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত এবং কেউ কেউ প্রশস্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞা তুলে ধরলাম।

আল আযহারের খ্যাতনামা শায়খ যারকানির মতে তফসির হলো :

علم يبحث فيه عن احوال القران الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .

অর্থ: (তফসির) এমন একটি শাস্ত্র যাতে দলিল প্রমাণের নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষের সামর্থানুযায়ী বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ কুরআনুল করিম থেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য (বক্তব্য বিষয়) নির্ণয়ে আলোচনা গবেষণা করা হয়।[২]

প্রাচীন কুরআন বিশেষজ্ঞ আল্লামা যারকশি তফসিরের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ص وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه .

অর্থ: এটা এমন একটি শাস্ত্র, যার সাহায্যে নবী মুহাম্মদ সা.- এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবের সঠিক বুঝ (understanding) অর্জন, মর্ম উন্মোচন এবং হুকুম আহকাম ও সেগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি উদঘাটন করা যায়।[৩]

বিখ্যাত কুরআন বিশারদ জালালুদ্দীন সুয়ূতি তফসির-এর ব্যাপকভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে :

هو علم نزول الايات وشئونها واقاصيصها والاسباب النازلة فيها - ثم ترتيب مكيها ومدنيها، محكمها ومتشابها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها،

---

১. জালালুদ্দীন সুয়ূতি : আল ইতকান ফি উলূমিল কুরআন, ২য় খণ্ড।
২. মুহাম্মদ আব্দুল আযিম যারকানি : মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড, কায়রো।
৩. ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ যারকশি : আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ১ম খণ্ড।

ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وامرها ونهيها، وعبرها وامثالها .

অর্থ: এটি (তফসির) কুরআনি আয়াতের নাযিল প্রসংগ, সেগুলোর আলোচ্য বিষয়, ঘটনাবলী, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং মক্কী-মাদানি নির্ণয়, এছাড়া আয়াত সমূহের মুহকাম-মুতাশাবিহ, নাসিখ-মনসূখ, খাস্-আ'ম, মুতলাক-মুকায়্যাদ, মুজমাল-মুফাস্সার, হালাল-হারাম, ওয়াদা-ওয়ীদ (পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ধমক), আদেশ-নিষেধ এবং উপদেশ ও উপমা নির্ণয় ও উদঘাটন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।[৪]

৪. তা'বিল تاويل

তা'বিল শব্দটি 'আওয়াল' (اول) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো : প্রত্যাবর্তন করা বা উৎসস্থলে ফিরে যাওয়া। এ আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী কুরআনের তা'বিল করার অর্থ হচ্ছে কুরআনের শব্দাবলীর সেই মূল মর্ম ও শিক্ষার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা, যে অর্থে আল্লাহ তায়ালা তা নাযিল করেছেন।

কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে তা'বিল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؕ

অর্থ: এর তা'বিল (মূল অর্থ) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।[৫]

ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا۝

অর্থ: আপনি যে বিষয়ে সবর করতে পারছিলেন না- এটাই তার তা'বিল (ব্যাখ্যা)।[৬]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاوِيْلُهٗ .....

অর্থ: তারা কি শুধু এর তা'বিলের (পরিণামের) প্রতীক্ষা করছে? যেদিন এর তা'বিল প্রকাশ পাবে.....।[৭]

৫. তফসির ও তা'বিলের মধ্যে পার্থক্য

প্রাচীনকালের মুফাসসিরগণ তফসির এবং তা'বিল দুটোকে সমার্থক মনে করতেন।[৮] তবে পরবর্তীকালে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ তা'বিলের পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।

তফসির এবং তা'বিল উভয় শব্দের মূল অর্থ একই অর্থাৎ সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য উদঘাটন করা, উন্মোচন করা এবং প্রকৃত মর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু তারপরও পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন জন উভয় শব্দের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য নির্ণয় করেছেন :

৪. জালালুদ্দীন সূয়ূতি : আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড।
৫. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ০৭।
৬. আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ৮২।
৭. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৫৩।
৮. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, ২য় খণ্ড : প্রথম অধ্যায়।

১. যে শব্দের একাধিক অর্থ হবার সম্ভাবনা থাকেনা, বরং একটি অর্থই ব্যাখ্যা বা প্রকাশযোগ্য, সেই ব্যাখ্যাকে তফসির বলা হয়। অপরদিকে যে শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে, তার একটি অর্থ গ্রহণ করাকে তা'বিল বলে।
২. তা'বিল হলো, বাক্য বা বক্তব্যের একটি সম্ভাব্য তাৎপর্য নির্ধারণ করা। যেমন- স্বপ্নের তা'বিল (তাৎপর্য নির্ধারণ) করা হয়। আর তফসির হলো শব্দের সেই নির্দিষ্ট অর্থটি প্রকাশ বা উদঘাটন করা যা বক্তার উদ্দেশ্য, বা বক্তা যেটি বুঝাতে চেয়েছেন।
৩. মাতুরিদির মতে, তফসির হলো, শব্দের একটি নির্দিষ্ট ও অকাট্য অর্থ নির্ধারণ করা এবং মুফাস্‌সিরের একথা বলা যে, আল্লাহ এখানে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, অতপর তার মতটি যদি অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়, তবে এটাকেই বলা হয় তফসির বিল মাছুর। আর তার মতটি অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হলে, সেটাকে বলা হবে 'তফসির বির রায়'- যা ক্ষেত্রেভেদে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে তা'বিল হলো, সম্ভাব্য অর্থসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া। এক্ষেত্রে অকাট্য দলিল থাকবে না এবং আল্লাহকেও সাক্ষী বানানো হবে না।
৪. আবু তালিব সা'লাবির মতে, তফসির হলো, কোনো বাস্তব বা রূপক শব্দের অর্থ সমার্থক শব্দ দ্বারা করা। যেমন, 'রাস্তার' অর্থ করা 'পথ', 'মেঘের' অর্থ করা 'বৃষ্টি' এবং 'চিবানো ঘাসের' অর্থ করা 'নাস্তা নাবুদ'। পক্ষান্তরে, তা'বিল হলো শব্দের অন্তর্গত সম্ভাব্য অর্থ খুঁজে বের করা বা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা।
৫. তাফসির করতে হয় রেওয়ায়েতের (বর্ণনা বা হাদিসের) ভিত্তিতে, আর তা'বিল করতে হয় দিরায়াতের (মেধা ও বিচার বুদ্ধির) ভিত্তিতে।
৬. তফসিরের উৎস হলো, প্রাসংগিক আয়াত, হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের মতামত। আর তা'বিবেল উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা-ইজতিহাদ।
৭. শব্দের বাহ্যিক অর্থ বর্ণনা করাকে তফসির বলে এবং শব্দের উদ্দেশ্য বা তাতে কী বুঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করাকে তা'বিল বলে।
৮. ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিশ্চিত অর্থ প্রকাশ করাকে তফসির বলে এবং সঠিক অর্থ কোন্‌টি- সে ক্ষেত্রে অনিশ্চিত থাকাকে তা'বিল বলে।
৯. শব্দের ভাবার্থকে তফসির বলে। ভাবার্থ থেকে নির্গত শিক্ষাকে তা'বিল বলে।
১০. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনির মতে তফসির হলো আয়াতের স্পষ্ট অর্থ, যা আল্লাহর উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। আর তা'বিল হলো অন্তর্নিহিত অর্থ যা চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটন করা হয়।

৬. তফসির এবং তা'বিলের মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নয়

এযাবত তফসির এবং তা'বিলের মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখানো হলো, প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনো ভিত্তি নেই। কারণ-

১. যারা পার্থক্য করেছেন, এসব পার্থক্য তাদের নিজস্ব চিন্তার ফসল। কুরআন বা হাদিসে এসব পার্থক্যের পক্ষে কোনো দলিল নেই। সাহাবিগণও এধরনের কোনো পার্থক্য করেননি।

২. পার্থক্য সৃষ্টিকারীগণ নিজেরাও পার্থক্যের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোনো একটি ব্যাখ্যার ব্যাপারে তারা সবাই একমত নন।

৩. তারা তা'বিলের যে পৃথক অর্থ করেছেন, সে অর্থ তফসির-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার তফসির-এর যে পৃথক অর্থ করেছেন, সে অর্থ তা'বিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

এ প্রসংগে আবু উবায়েদ বলেছেন : ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তফসির ও তা'বিল-এর মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। যারা পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন, তাদের মতামতের ভিন্নতার উপর চিন্তা করলেই বুঝা যায় দুটি শব্দ ভিন্নার্থ প্রকাশ করে না। দুটির মধ্যে যদি পার্থক্য থাকতোই, তবে তাদের মধ্যে এতো মতভেদ হতো না। ব্যাপারটা হলো, কতিপয় আলেম নিজস্বভাবে দুটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, এতে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ফলে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থের পরিভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। প্রাচীন কাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সকল মুফাস্‌সিরই এ দুটি শব্দকে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। তারা একটিকে অপরটির অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন, পৃথক পৃথক অর্থে গ্রহণ করেননি।[৯]

৭. তফসির-এর বিষয়বস্তু

তফসির-এর বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কিতাব আল কুরআন, যা তিনি মানব জাতির হিদায়াতের জন্যে (هُدًى لِلنَّاسِ) নাযিল করেছেন এবং যা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, মানদণ্ড ও যাবতীয় কল্যাণের উৎস।[১০]

৮. তফসির শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম আল কুরআনের তাৎপর্য ও মর্মার্থ উদঘাটন ও উন্মোচনের মাধ্যমে আল্লাহর হিদায়াতেরও বিধানের উপলব্ধি ও অনুসরণের পথ সুগম করাই তফসির শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।[১১]

৯. তফসির শাস্ত্রের গুরুত্ব

প্রতিটি বিষয় ও শাস্ত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা তার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল বিষয় ও শাস্ত্রের অতি উর্ধ্বে চির অনুপম মর্যাদার অধিকারী হলো তফসির শাস্ত্র। কারণ, মহান

৯. আবু ওবায়েদ : মাজাযুল কুরআন
১০. মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজি খলিফা : কাশফুয যুনূন।
১১. মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজি ঝলিফা : কাশফুয যুনুন।

আল্লাহর কালাম আল কুরআন হচ্ছে এর বিষয়বস্তু আর এ কালামের তাৎপর্য ও মর্মার্থ উদঘাটন করা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। সুতরাং তফসিরই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। অন্য কোনো শাস্ত্রের তুলনা এর সাথে হয় না।

১০. তফসির-এর উপাদান বা আলোচ্য বিষয়

তফসির-এর মূল বিষয়বস্তু আল্লাহর কালাম আল কুরআন। তবে, তফসির-এর যেসব সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলো থেকে তফসির-এর বিস্তারিত উপাদান বা আলোচ্য বিষয়সমূহও আরো স্পষ্ট হয়েছে। তফসিরের বিস্তারিত আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার কালাম আল কুরআনের :

১. আয়াত সমূহের যথার্থ অর্থ ও মর্ম।
২. আয়াতের আলোচ্য বিষয়।
৩. উপদেশ হিসেবে আলোচিত কাহিনী, ইতিহাস বা ঘটনাবলী।
৪. শানে নযূল (নাযিলের প্রেক্ষাপট)।
৫. নাযিলের সময় ও স্থান (মক্কী-মাদানি)।
৬. মুহকাম।
৭. মুতাশাবিহ।
৮. নাসিখ-মানসূখ (এটির বিষয়ে মতভেদ আছে)।
৯. আ'ম ও খাস।
১০. হাকিকত ও মাজায।
১১. মুতলাক ও মুকায়্যাদ।
১৩. হালাল ও হারাম।
১৪. পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ধমক প্রসঙ্গ।
১৫. আহকাম (বিধি-বিধান)।
১৬. আমর-নাহি (আদেশ-নিষেধ)।
১৭. উপমা।
১৮. উপদেশ।
১৯. হিকমা (বাস্তবায়ন পদ্ধতি)।

এছাড়া আবু হাইয়ান উন্দুলুসি, শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ আলূসি এবং হাজি খলিফা প্রমুখ বিশেজ্ঞগণ মনে করেন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও তফসিরের আলোচ্য বিষয় :

২০. আরবি ভাষা বিজ্ঞান।
২১. আরবি ব্যাকরণ।
২২. কালাম শাস্ত্র।
২৩. উসূল আল ফিক্‌হ্।
২৪. ইলমুল কিরাত বা বিশুদ্ধ উচ্চারণ (কারো কারো মতে)।
২৫. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ (কারো কারো মতে)।

১১. এতো তফসির-এর প্রয়োজন কী?

সেই তাবেয়ী এবং তাবে' তাবেয়ীগণের যুগ থেকে কুরআন মজিদের তফসির লেখা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত দেড় হাজার শতাব্দীতে লেখা হয়েছে শত শত তফসির গ্রন্থ। এখনো কুরআনের তফসির লেখা চলছেই। প্রশ্ন হলো, মাত্র (কিছু বেশি) ছয় হাজার বাক্যের (আয়াতের) একখানা গ্রন্থের এতো অসংখ্য তফসির লেখার প্রয়োজন কী?

হাঁ, এটাও আল কুরআনের এক অলৌকিত্ব। মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সকল মানুষের জীবন বিধান হিসেবে তিনি নাযিল করেছেন এ কুরআন। মানব জীবনে উদ্ভূত সকল প্রসংগ এবং মানব মস্তিষ্কে সূচিত ও প্রকাশিত সকল জ্ঞানের প্রশস্ত কিংবা সূক্ষ্ম নির্দেশনা আল কুরআনে রয়েছে। অনন্ত জ্ঞানের ফল্গুধারা এ কুরআন।

একখানা আল কুরআন এক হাতে কিংবা একটি পকেটে বহন করাটা খুবই সহজ এবং হাল্কা। কিন্তু এর সমুদ্রসম জ্ঞানধারা সিঞ্চন করে নি:শেষ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, এ কুরআন অফুরন্ত জ্ঞানের ফল্গুধারা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মানুষের ক্রমোন্নতি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিজ্ঞান ও কারিগরি, যোগাযোগ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মানব জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে; এছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়সমূহকে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করে ফেলার কারণে সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে কুরআনে বর্ণিত মূলনীতি ও নির্দেশিকা উপস্থাপন করা জরুরি হয়ে দেখা দেয়। তাই কুরআন নিয়ে গবেষণা করা এবং কুরআনের তফসির করার ধারাবাহিকতা সব সময় চলে আসছে এবং এ ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে।

কুরআন এমনি এক জ্ঞানসমুদ্র, যার জ্ঞানের মনি মানিক্য বিচিত্র এবং অফুরান। তাই তো দেখা যায়, এযাবত যতো তফসির লেখা হয়েছে, প্রত্যেকটি তফসিরেরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রস-সৌরভ। প্রত্যেক মুফাস্‌সিরই উন্মুক্ত করেছেন কুরআনি জ্ঞানসমুদ্রের নতুন নতুন দুয়ার। ফলে প্রত্যেক যুগ ও সমাজের লোকেরাই পেয়ে আসছেন তাদের বাস্তব-স্থান কাল পাত্রের নিরিখে যথোপযুক্ত কুরআনি নির্দেশিকা।

কুরআনের পরবর্তী কোনো গবেষক এবং মুফাস্‌সিরেরই একথা বলার সুযোগ নেই যে, 'পূর্ববর্তী গবেষক এবং মুফাস্‌সিরগণ সব কথাই বলে গেছেন, সব ব্যাখ্যাই দিয়ে গেছেন, সব জ্ঞানই উন্মুক্ত করে গেছেন। আমাদের জন্যে কিছুই বাকি রেখে যাননি।'

বরং প্রতিটি যুগের গবেষণা এবং তফসিরেই বেরিয়ে আসছে জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত, নতুন নতুন নূরের ঝলক। তাইতো দেখা যায়, প্রত্যেক নিষ্ঠাবান বিশেষজ্ঞ আলেমের লেখা একেকটি তফসির যেনো একেকটি নতুন আলোর প্রদীপ।

১২. তফসির-এর ক্ষেত্রে ইখতেলাফ বা মতপার্থক্য

বিভিন্ন শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কখনো কখনো মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন কুরআন তফসিরের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হবে কেন? এতে কি কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না? আবার কেউ কেউ বলেন, এতে কি মুফাস্‌সিরগণের অজ্ঞতা প্রকাশ পায় না?

আমরা বলবো, জ্ঞানী ও বিচার-বুদ্ধির অধিকারী লোকদের কাছে এসব প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারণ, কুরআনের অনেক শব্দ ও আয়াত অবশ্যি সুস্পষ্ট অর্থ নির্দেশক- এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআনে এমন অনেক শব্দ এবং আয়াতও আছে যেগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। এই শেষোক্ত ধরনের শব্দ ও আয়াতসমূহের অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য নির্ণয়ে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে মতামতের বিভিন্নতা একটা স্বাভাবিক বিষয়। এটা অবশ্যি বৈধ। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, কুরআনের বক্তব্য ব্যাপক অর্থবোধক এবং তা যুগের চাহিদা পূর্ণকারী। এধরনের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম উদ্ধারে যারা আত্মনিয়োগ করেন তারা অবশ্যি জ্ঞানী। তাঁরা মর্যাদাবান। এজন্যে তাঁরা অবশ্যি আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবেন- যদি তাঁরা নিষ্ঠার সাথে একাজ করে থাকেন।

হাঁ, এক্ষেত্রে অবশ্যি ঐসব লোকেরা নিন্দিত এবং নিন্দনীয়, যারা নিজেদের ভ্রান্ত মত, পথ, দৃষ্টিভংগি ও মতবাদের পক্ষে কুরআনকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করে।

১৩. ব্যাখ্যার বিভিন্নতার কারণ এবং এর অবকাশ

কুরআনের কিছু কিছু শব্দ ও আয়াতের তফসিরের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা বা ইখতিলাফের বেশ কিছু বৈধ কারণ আছে। কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

১. একই প্রসংগের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ।

২. যেসব শব্দের উচ্চারণ (اعراب) -এর ক্ষেত্রে একাধিক উচ্চারণের অবকাশ আছে। সেগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক অর্থ করার অবকাশ।

৩. অভিধান বা ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে যেসব শব্দ একাধিক অর্থবোধক, সেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণের অবকাশ।

৪. কোনো কোনো শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের মতপার্থক্য।

৫. কোনো কোনো আয়াতের হুকুম খাস্ না আ'ম (বিশেষ না নির্বিশেষ) সে ব্যাপারে মতপার্থক্য।

৬. কোনো কোনো হুকুম মুতলাক নাকি মুকাইয়্যাদ অর্থ্যৎ সাধারণ (general) না সীমাবদ্ধ (limited) তা নিয়ে মতপার্থক্য।

৭. কোনো কোনো শব্দের রূপক বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহার হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য।

৮. কোনো কোনো শব্দের 'স্পষ্ট অর্থ' কিংবা 'অস্পষ্ট অর্থ' হওয়া নিয়ে মতভেদ।
৯. কোনো আয়াতের হুকুম মনসুখ হওয়া না হওয়া নিয়ে মতের ভিন্নতা।

এ প্রসংগে প্রখ্যাত মুফাসসির আবুল আ'লা মওদূদী রহ. বলেন :

"দীন ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একমত এবং ইসলামি দলীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থেকেও নিছক ইসলামি বিধান ও আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে আন্তরিক মত পার্থক্যের প্রকাশ ঘটে কুরআন তার বিরোধী নয়। বিপরীত পক্ষে কুরআন এমন ধরনের মতবিরোধের নিন্দা করে, যার সূচনা হয় স্বার্থান্ধতা ও বক্র দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অবশেষে তা দলাদলি ও পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এই দু'ধরনের মতবিরোধ মূলত একই পর্যায়ের নয় এবং ফলাফলের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কাজেই একই লাঠি দিয়ে উভয়কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং উভয়ের বিরুদ্ধে একই হুকুম জারি করা উচিত নয়। প্রথম ধরনের মতবিরোধ উন্নতির প্রাণকেন্দ্র ও মানুষের জীবনে প্রাণস্পন্দন স্বরূপ। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকদের সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই। এর অস্তিত্বই জীবনের আলামত। যে সমাজে বিচার বুদ্ধির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে বরং যেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে কাঠের মানুষেরা বিচরণ করছে একমাত্র সেখানেই এর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

আর দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধটির ব্যাপারে সারা দুনিয়ার মানুষই জানে, যে দেশে ও যে সমাজে তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার অস্তিত্ব স্বাস্থ্যের নয়, রোগের আলামত। কোনো উম্মতকে সে ধরণের মতবিরোধ শুভ পরিণতির দিকে এগিয়ে দিতে পারেনি। এই উভয় ধরনের মতবিরোধের পার্থক্যের চেহারাটি নিম্নোক্তভাবে অনুধাবন করুন :

এক ধরনের মতপার্থক্য আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ইসলামি সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বসম্মতিক্রমে বিধানের উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হবে। এরপর দুজন আলেম কোনো অমৌলিক তথা খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অথবা দুজন বিচারক কোনো মামলার সিদ্ধান্ত দানে পরস্পরের সাথে বিরোধ করবেন, কিন্তু তাদের কেউ-ই এই বিষয়টিকে এবং এর মধ্যে প্রকাশিত নিজের মতামতকে দীনের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত করবেন না। আর এই সংগে তার সাথে মতবিরোধকারীকে দীন থেকে বিচ্যুত ও দীন বহির্ভূত গণ্য করবেন না। বরং উভয়েই নিজেদের যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করে নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী অনুসন্ধানের হক আদায় করে দেবেন। সাধারণ জনমত অথবা বিচার বিভাগীয় বিষয় হলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত অথবা সামাজিক বিষয় হলে ইসলামি সমাজ সংগঠনই উভয় মতের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করে নেবে অথবা চাইলে উভয় মতই গ্রহণ করে

নেবে- এটা তাদের নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধরনের মত-পার্থক্য করা হবে দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে। অথবা যে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দীনের মৌলিক বিষয় বলে গণ্য করেননি এমন কোনো বিষয়ে কোনো আলেম, সূফী, মুফতি, নীতি শাস্ত্রবিদ বা নেতা নিজে একটি মত অবলম্বন করবেন এবং অযথা টেনে হিঁচড়ে সেটাকে দীনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত করে দেবেন, তারপর তার অবলম্বিত মতের বিরোধী মত পোষণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দীন ও মিল্লাত বহির্ভূত গণ্য করবেন। এই সংগে নিজের একটি সমর্থক দল বানিয়ে এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকবেন যে, আসল উম্মতে মুসলিমা তো এই একটি দলই মাত্র, বাদ বাকি সবাই হবে জাহান্নামের ভাগিদার। উচ্চকণ্ঠে তারা বলে যেতে থাকবে : মুসলিম হবে যদি এই দলে এসে যাও, অন্যথায় তুমি মুসলিমই নও।

কুরআনের ব্যাখ্যায় বা আলোচনায় এই দ্বিতীয় ধরনের মতবিরোধ, দলাদলি ও ফেরকাবন্দির বিরোধিতা করা হয়েছে। আর প্রথম ধরনের মতবিরোধের কতিপয় ঘটনা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের সামনেই উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি এটিকে কেবল বৈধই বলেননি বরং এর প্রশংসাও করেছেন। কারণ এ মতবিরোধ প্রমাণ করেছিল যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে চিন্তা ভাবনা করার, অনুসন্ধান-গবেষণা চালাবার এবং সঠিকভাবে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব রয়েছে। সমাজের বুদ্ধিমান ও মেধা সম্পন্ন লোকেরা নিজেদের দীন ও তার বিধানের ব্যাপারে আগ্রহী। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি দীনের বাইরে নয়, তার চৌহদ্দির মধ্যেই জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজতে তৎপর। ইসলামি সমাজ সামগ্রিকভাবে মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজের ঐক্য অটুট রেখে এবং নিজের জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল লোকদের সঠিক সীমারেখার মধ্যে অনুসন্ধান চালাবার ও ইজতিহাদ করার স্বাধীনতা দান করে উন্নতি ও অগ্রগতির পথ খোলা রাখার স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের পতাকাবাহী।"[১২]

১৪. ব্যাখ্যা গ্রহণে অগ্রাধিকার

উপরের আলোচনা অনুযায়ী দেখা যায়, কুরআনের বিভিন্ন শব্দ বা আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, কোন্ ব্যাখ্যাটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য? এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের নীতিমালা নিম্নরূপ :

১. কুরআন দিয়ে কুরআনের তফসির করতে হবে। কোনো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শব্দ বা আয়াতের সেই অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, অনুরূপ বিষয়ের অন্য কোনো শব্দ বা আয়াত যে অর্থ প্রকাশ করে বা যে অর্থের দিকে ইংগিত করে।

২. দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবে রসূলুল্লাহ্‌র হাদিস অর্থাৎ সুন্নাহ। হাদিসে রসূলুল্লাহ

১২. আবুল আ'লা মওদূদী : তফসির তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

সা. কর্তৃক যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে সে ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে শর্ত হলো হাদিস সহীহ হতে হবে।

৩. অধিকাংশ উলামা ও মুফাস্‌সির যে অর্থ ও ব্যাখ্যার পক্ষে মত প্রদান করেছেন, সেটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. সাহাবিগণের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মতামতকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

৫. আরবদের ভাষারীতি, বাকরীতি ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ অর্থ ও ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ ও ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ও প্রশান্ত হৃদয় মন যে ব্যাখ্যার প্রতি সায় দেবে, সেটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮. প্রকৃত অর্থকে রূপক অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এটা আবু হানিফার মত। কিন্তু আবু ইউসুফের মতে রূপক অর্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৯. 'বিশেষ' অর্থের উপর 'নির্বিশেষ' অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কারণ সেটাই মূল অর্থ। তবে বিশেষ অর্থ গ্রহণের পক্ষে দলিল থাকলে ভিন্ন কথা।

১০. সীমাবদ্ধ অর্থের উপর সাধারণ অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে সীমাবদ্ধ অর্থের পক্ষে দলিল থাকলে ভিন্ন কথা।

১১. অস্পষ্ট অর্থের উপর স্পষ্ট অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।[১৩]

❖❖❖

১৩. ইবনে তাইমিয়া : মুকাদ্দামা ফী উসূলিত তাফসির, মাকতাবাতুত তুরাসুল ইসলামি, কায়রো।

অনুচ্ছেদ ৪

কুরআন তফসির-এর মূলনীতি

১. কুরআন তফসির-এর ভিত্তি ও উৎস

মহান আল্লাহর কালাম কুরআনুল করিমের তফসির করার ঐচ্ছিক ও মনগড়া কোনো পদ্ধতি নেই। যার যেভাবে ইচ্ছে তফসির করার কোনো সুযোগ নেই। কুরআনুল করিমের তফসির-এর জন্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ভিত্তি ও উৎস। রয়েছে বিধিবদ্ধ মূলনীতি। কুরআন মজিদ-এর তফসির করার ভিত্তি ও উৎস ছয়টি :

১. স্বয়ং কুরআন মজিদ।
২. রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ (যা হাদিস আকারে সংরক্ষিত রয়েছে)।
৩. সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।
৪. তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।
৫. আরবি ভাষার 'বাক-রীতি'।
৬. সুস্থ নিষ্কলুষ বিচারবুদ্ধি, দীনের যথার্থ বুঝ-বুদ্ধি (تفقه فى الدين)।

এ ছয়টিই কুরআন তফসির-এর ভিত্তি।[১] এগুলো প্রয়োগ করতে হবে ধারাবাহিক ক্রমপর্যায়ে। প্রথমটিতে পাওয়া না গেলেই কেবল দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য। দ্বিতীয়টিতেও পাওয়া না গেলেই কেবল তৃতীয়টি প্রযোজ্য। পরবর্তীগুলোও অনুরূপ। এটাই কুরআন মজিদের তফসির করার মূলনীতি।

এবার উল্লেখিত ছয়টি ভিত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

২. ভিত্তি সমূহের দলিল ও যুক্তি

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা কুরআন ও ইল্‌মে দীনের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য তুলে ধরছি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

"কুরআন তফসির-এর বিশুদ্ধতম পন্থা হলো কুরআন দিয়ে কুরআনের তফসির করা। কারণ কুরআনের কোথাও যদি কোনো বিষয়ে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে, তবে অন্য জায়গায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোথাও যদি ইঙ্গিতে বলা হয়ে থাকে, তবে অন্যত্র সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে।

কিন্তু তুমি যদি শুধু কুরআন দিয়ে কুরআন বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হও, তবে সুন্নাহ্‌র সাহায্য গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ্ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং বাস্তব রূপ। এ প্রসঙ্গে চমৎকার কথা বলেছেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আশ্ শাফেয়ী। তিনি বলেছেন : 'রসূলুল্লাহ সা. আইন কানুন, বিধি বিধান, নিয়ম প্রথা, কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি যা কিছুই চালু করেছেন সবই মূলত তিনি কুরআন থেকে যা বুঝেছেন তারই বাস্তবায়ন।'

---

১. এ ছয়টি উৎস প্রমাণিত। দ্রষ্টব্য : মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই রসূলুল্লাহ সা.-কে কুরআন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ط

অর্থ: আমি সত্যসহ তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মাঝে ফায়সালা করো আল্লাহ তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার ভিত্তিতে।[২]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থ: আর আমি তোমার প্রতি 'আয যিক্‌র' (আল কুরআন) নাযিল করেছি যাতে করে তুমি মানুষের জন্যে সেটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করো যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে এবং তারা যেনো ভেবে চিন্তে দেখতে পারে।[৩]

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط

অর্থ: আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি তো কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তুমি তাদেরকে এটি সুস্পষ্টভাবে (ব্যাখ্যা করে) বুঝিয়ে দেবে।[৪]

আর এ প্রসঙ্গেই স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : ألا انى او تيت القُرآنَ ومثله معه

অর্থ: জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে, আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ জিনিস।[৫]

এখানে 'অনুরূপ জিনিস' মানে-সুন্নাহ। মোট কথা, তুমি কুরআনের তফসির সন্ধান করবে কুরআন থেকেই। যদি কুরআনে না পাও, তবে সন্ধান করবে সুন্নাহ্‌তে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সা. ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠাবার সময় মুয়ায বিন জাবাল রা.-কে বলেছিলেন :

بِمَ تحكم ؟ قال : بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال أجتهد رأيى. قال فضرب رسول الله ص فى صدره وقال: الحمد الله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله.

অর্থ: তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করবে? মুয়ায জবাব দেন : আল্লাহ্‌র কিতাবের ভিত্তিতে। তিনি সা. বললেন : যদি তাতে (কখনো কখনো ফায়সালা) না পাও? মুয়ায বললেন : তবে করবো রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : যদি তাতেও (কখনো কখনো ফায়সালা) না পাও? মুয়ায বললেন : সে ক্ষেত্রে আমি ইজতিহাদ করে আমার রায় (মত) ঠিক

২. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১০৫।
৩. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৪।
৪. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৬৪।
৫. সূত্র : মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ। কানযুল উম্মাল ১ম খণ্ড হাদিস নং ৮৮০। তিরমিযি বলেছেন হাদিসটি হাসান গরিব।

করবো। বর্ণনাকারী বলেন : তখন রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযের বুকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন : আল হামদুলিল্লাহ- আল্লাহর শোকর, তিনি আল্লাহ্‌র রসূলের দূতকে সেই অভিমত ব্যক্ত করার তৌফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট।[৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসগুলো থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, রসূলুল্লাহ সা.-কে আল্লাহ নিজেই কুরআনের ব্যাখ্যাতা নিয়োগ করেছেন এবং কুরআনের পরেই তাঁর সুন্নাহ্ কুরআন ব্যাখ্যার ভিত্তি।"[৭]

অতপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও মতামতের ভিত্তিতে তফসির করা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

"আর যেসব ক্ষেত্রে আমরা কুরআন কিংবা সুন্নাহ্ থেকেও তফসির পেতে অক্ষম হয়ে পড়বো, সেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের দিকে। কারণ তাঁরাই কুরআনের তফসির সংক্ষেপে অধিক অবগত ছিলেন। তাঁরাই অন্যসব মানুষের তুলনায় কুরআনের অধিকতর সমুঝদার ছিলেন। তাঁদের মাঝেই কুরআন নাযিল হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। রসূল সা. কিভাবে কুরআনের অনুসরণ, অনুবর্তন করেছিলেন, তাঁরা সচোক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা কুরআনের কোনো অংশ, কোনো বক্তব্য, কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে অক্ষম হলে রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বুঝ এবং শুদ্ধতম জ্ঞান তাঁরাই অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রগামী ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম।"[৮]

কুরআন তফসিরের তৃতীয় উৎস ও ভিত্তি সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলার পর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ্ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলেন :

"তুমি যদি কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের মধ্যে তফসির-এর সন্ধান পেতে অক্ষম হও, তবে জেনে রাখো এ ধরনের ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক ইমাম তাবেয়ীগণের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁদের মধ্যে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রগামী ছিলেন মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, আতা বিন আবি রিবাহ, হাসান বসরি, মাসরূক বিন আজদা, সায়ীদ বিন মুসাইয়্যেব, আবুল আলিয়া, মালেক ইবনে আনাস, কাতাদা, দাহ্‌হাক বিন মুযাহিম প্রমুখ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ। শো'বা বিন হাজ্জাজ প্রমুখ বলেছেন, আইন কিংবা তফসির-এর ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্য দলিল নয়। অর্থাৎ তাদের মত গ্রহণ

---

৬. হাদিসটি সবগুলো মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ইমাম বুখারি হাদিসটি সংকলন করেছেন সহীহ বুখারির 'জিহাদ', 'মাগাযি', 'আদব', ও 'আহকাম' অধ্যায়ে।

৭. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া : মুকাদ্দামাতুন ফী উসূলিত তাফসির, মাকতাবাতুত তুরাসুল ইসলামি, কায়রো।

৮. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া : মুকাদ্দাসাতুন ফী উসূলিত তাফসির, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

করা অন্যদের জন্যে অনিবার্য নয়। তাদের মতের সাথে মতভেদ মতবিরোধ করা যেতে পারে। তবে কোনো বিষয়ে যদি সকল তাবেয়ীর ইজমা (ঐকমত্য) হয়, তবে সেটি অবশ্যি একটি দলিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে একাধিক মত বা মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলিল নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে আরবি ভাষারীতি কিংবা আরবদের সাধারণ বাকরীতি অথবা সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে।"[৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসির রাহেমাহুল্লাহ তাঁর তফসিরের ভূমিকায় লিখেছেন : "কুরআন তফসিরের সর্বোত্তম পন্থা হলো, কুরআনের তফসির কুরআন দ্বারা করা। কারণ কুরআনের কোনো একটি কথা যদি কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়ে থাকে তবে অন্য স্থানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও যদি কোনো স্থানের মর্মার্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। কারণ সুন্নাহ কুরআনেরই ব্যাখ্যা, কুরআনেরই ভাব ও মর্মার্থের বিস্তারিত ও বাস্তব বিশ্লেষণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ

অর্থ: আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্যে নাযিল করেছি যেনো তুমি ঐ সত্য ব্যাপার লোকদের কাছে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিতে পারো, যে ব্যাপারে তারা ইখতেলাফে লিপ্ত।[১০]

এ জন্যেই রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : اَلَا اِنِّىْ اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ .

অর্থ: জেনে রেখো। আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে তারই মতো আর একটা জিনিস দেয়া হয়েছে।[১১]

এখানে তারই মতো আর একটা জিনিস বলতে সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা কুরআনের তফসির কুরআন দ্বারা করতে হবে। কোনো ব্যাখ্যা কুরআনে যদি পাওয়া না যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। যখন কোনো ব্যাখ্যা কুরআনেও পাওয়া গেল না এবং সুন্নাহতেও পাওয়া গেল না, তখন তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে। কারণ, কখন কোন্ অবস্থার প্রেক্ষিতে কি অহি নাযিল হয়েছে, তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা তার সঠিক জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ উপলব্ধি হাসিল করেছেন। আর তাঁরা ছিলেন সেই অনুযায়ী আমলে সালেহর নমুনা। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ তো কুরআনের মুখপাত্রই ছিলেন।

---

৯. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া : প্রাগুক্ত।

১০. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৬৪।

১১. আবু দাউদ।

যখন কোনো আয়াতের তফসির কুরআনেও পাওয়া না গেলো, হাদিসেও পাওয়া না গেলো এবং সাহাবিগণ থেকেও সুপ্রমাণিতভাবে পাওয়া না গেলো, সে অবস্থায় বহুসংখ্যক ইমাম তাবেয়ীগণের মতামত গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে তাবেয়ীগণের মধ্যে মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা, আতা, হাসান বসরি, মাসরূক, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কাতাদাহ, দাহ্হাক প্রমুখের ব্যাখ্যা ইমামগণ গ্রহণ করেছেন।"[১২]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাসসির সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহেমাহুল্লাহ বলেন:

"আপনি যে আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে চান, প্রথমে আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী সে আয়াতের গঠনপ্রণালী এবং শব্দসমূহের উৎপত্তি ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করুন। অত:পর পূর্বাপর আলোচনার (context) সাথে মিলিয়ে দেখুন। তারপর কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা একই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য আয়াতসমূহ একত্রিত করে দেখুন কোন্ অর্থটি গ্রহণ করলে এ আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে আর কোন্ অর্থ গ্রহণ করলে হবে বিপরীত অর্থ। একথা মনে রাখতে হবে যে, একই বক্তার কোনো কথা যদি দুই বা ততোধিক অর্থবোধক হয়, তবে তার ঐ অর্থই গ্রহণ করতে হবে, এ বিষয়ে তাঁর অন্যান্য বাণী ও বর্ণনা যে অর্থ প্রকাশ করে। এতোদূর পর্যন্ত আপনি কুরআনের অর্থ স্বয়ং কুরআনের আলোকে বুঝতে ও জানতে প্রচেষ্টা চালানোর পর আপনাকে দেখতে হবে, যে মহান ব্যক্তি সা. প্রকৃতপক্ষে এ কুরআনের বাহক ছিলেন, তাঁর আমল ও বাণী দ্বারা এ আয়াতের কি অর্থ বুঝা যায়। অত:পর দেখতে হবে, যে লোকগুলো তাঁর সংগি সাথি ও নিকটতম অনুসারী ছিলেন তাঁরাই বা আয়াতটির অর্থ কি বুঝেছিলেন। এ হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি।"[১৩]

কুরআন তফসির-এর ক্ষেত্রে সুস্থ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ প্রসঙ্গে এই উপমহাদেশের আরেকজন খ্যাতনামা আলেম জাস্টিস তকি উসমানি বলেন :

"সুস্থ বিচার-বুদ্ধি জগতের সব কাজেই প্রয়োজন। সুস্থ বিচারবুদ্ধি ছাড়া তো তফসির-এর প্রথম চারটি উৎসও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সুস্থ বিবেক বা বিচার-বুদ্ধিকে কুরআন তফসির-এর একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, কুরআন মজিদে এমন অনেক রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যেগুলোর উপর কিয়ামত পর্যন্ত মেধা ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। তফসির-এর প্রথম পাঁচটি উৎস দ্বারা এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি মোটামুটি এবং প্রয়োজনীয় ধারণা তো লাভ করা যায় বটে, কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত সমস্ত রহস্য কোনো যুগেই উদঘাটন করে শেষ করা সম্ভব নয়। এ এক স্বতসিদ্ধ কথা যে, কুরআনুল করিমের এ ধরনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণার দুয়ার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। যাদেরকে আল্লাহ

---

১২. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে কাসির : তাফসিরুল কুরআনিল আযিম-এর ভূমিকা।

১৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খণ্ড, আয়াতের তফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮।

পাক সুস্থ বিচারবুদ্ধি, দীনের নির্ভেজাল বুঝ এবং আল্লাহর প্রতি ভয় ও আনুগত্যের অমূল্য সম্পদ দান করেন, তারাই গভীর চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে এসব বিষয়ের গভীরে পৌঁছুতে সক্ষম হন। সকল যুগের মুফাস্‌সির ও কুরআন গবেষকগণই নিজ নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী এসব বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এটা হচ্ছে মূলত দীনের সেই বুঝ ও যথার্থ জ্ঞান, যেটা রসূলুল্লাহ সা. মহান আল্লাহর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর জন্যে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التاويل وفقهه فى الدين .

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাকে (ইবনে আব্বাসকে) কুরআনের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান এবং দীনের সঠিক বুঝ দান করো।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মেধা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা উদঘাটিত কোনো মত ও তথ্য যদি দীন ও শরিয়ার মূলনীতির সাথে এবং তফসির-এর প্রথম পাঁচটি ভিত্তি ও উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। দীন ও শরিয়ার মূলনীতির তোয়াক্কা না করে নিজের কোনো মত বা উদ্ভাবনকে অকাট্য মনে করাটা 'মনগড়া তফসির'। এ ধরনের মনগড়া মত বা ব্যাখ্যা দানকারীদের জন্যে রসূল সা. জাহান্নামের আবাস-এর সংবাদ দিয়েছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা বা মতামতের কোনো মূল্য ইসলামে নেই।"[১৪]

মূলত, কুরআন সংক্রান্ত ইল্‌ম এক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। খুব সূক্ষ্ম, সচেতন, আল্লাহভীরু ও সত্যনিষ্ঠ বিবেকই এ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। ইলম ও আমলের খুলূসিয়ত ও উচ্চতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যেসব বান্দাহকে বিশেষ ইল্‌ম দান করেন, তারাই আল্লাহর কিতাবের তফসির করার যোগ্যতা হাসিল করেন। আর এ দান লাভের জন্য বান্দাহকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়।

সাহাবিগণের কুরআন তফসির (ব্যাখ্যা) প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, কোনো শব্দ বা আয়াতের তফসির-এর ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে যদি দ্বিমত পাওয়া না যায়, সেই মতটিকেই উক্ত শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবে কোনো শব্দ বা আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মধ্যে যদি একাধিক মত পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সূত্র, দলিল ও যৌক্তিকতার নিরিখে যাচাই করে যে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার প্রদান করার মধ্যে দোষ নেই।

তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যার বিষয়েও একই কথা। তবে তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এবং পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণের ব্যাখ্যা ও মতামত দলিল নয়। কুরআন সুন্নাহর দলিল এবং দৃষ্টিভংগির আলোকে বিশ্লেষণ করে তাদের কারো মতামত গ্রহণ, বর্জন এবং অগ্রাধিকার প্রদানের মধ্যে কোনো দোষ নেই।

সকল ধরনের ইজতিহাদি ব্যাখ্যার ব্যাপারে এই একই কথা।

---

১৪. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

অনুচ্ছেদ ৫

কুরআন ব্যাখ্যার ভিত্তিসমূহের প্রয়োগ

আমরা তফসির বা কুরআন ব্যাখ্যা ভিত্তি ও উৎসমূহ আলোচনা করেছি। এবার সেগুলোর কিছু উদাহরণ এখানে আলোচনা করবো।

১. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়ে

কুরআন ব্যাখ্যার পয়লা ভিত্তি ও উৎস হলো স্বয়ং আল কুরআন। কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমেই অনুসন্ধান করতে হবে কুরআনে। কুরআন কিভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা করে? কয়েকটি উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

উদাহরণ ০১ : কুরআন মজিদের একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط

অর্থ: অতরপর আদম তার রব-এর নিকট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো, তখন তিনি তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন।[১]

আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুলের ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট থেকে কী বাণী প্রাপ্ত হলেন, তা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তা উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনেরই অন্য এক স্থানে এভাবে :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

অর্থ: তখন তারা (আদম ও হাওয়া) উভয়েই বললো : আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করে দাও এবং আমাদের প্রতি রহম (mercy) না করো, তাহলে তো নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।[২]

এখন বুঝা গেলো, আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে আদম এবং হাওয়ার তীব্র অনুতাপ এবং অনুশোচনা জাগ্রত হয়। কিন্তু কীভাবে কী ভাষায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, তা তাঁদের জানা ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা অহির মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালামকে তা জানিয়ে দেন। ক্ষমা প্রার্থনার বক্তব্য নাযিলের কথা সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ইঙ্গিতে। আর সূরা আ'রাফে সে বক্তব্যটি কী ছিলো, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সূরা বাকারার সেই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো সূরা আ'রাফের এই আয়াত।

উদাহরণ ০২ : কুরআন মজিদের একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ط

১. আল কুরআন, সূরা ০২ আল বাকারা : আয়াত ৩৭।

২. আল কুরআন সূরা, সূরা ৭ আ'রাফ : আয়াত ২৩।

অর্থ: আর তালাকপ্রাপ্তারা (পরবর্তী বিয়ের জন্যে) তিন ঋতুকাল অপেক্ষা করবে।[৩]

(And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three menstrual periods.)

কিন্তু কুরআন মজিদেরই অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ○

অর্থ: হে মুমিনরা! তোমরা যখন মুমিন নারীদের বিয়ে করার পর স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে দিবে, তখন তোমাদের জন্যে তাদের ইদ্দত পালন করার কোনো দায়িত্ব নেই- যা তোমরা গণনা করবে। তবে তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী দিয়ে দেবে এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় দেবে।[৪]

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতটিতে রয়েছে তালাক প্রাপ্তাদের ইদ্দতের মেয়াদ সংক্রান্ত সাধারণ আদেশ, আর শেষোক্ত আয়াতটিতে সাধারণ তালাক প্রাপ্তাদের থেকে বিশেষ ধরনের তালাক প্রাপ্তাদের পৃথক করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের ইদ্দত পালন করতে হবে না। সুতরাং প্রথমটির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আয়াতটির উল্লেখ জরুরি। প্রথমোক্ত নির্দেশটি সাধারণ, শেষোক্তটি খাস্।

উদাহরণ ০৩ : সূরা আল বাকারার একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীরা (পরবর্তী বিয়ে করার জন্যে) চার মাস দশদিন অপেক্ষা করবে।[৫]

কিন্তু কুরআন মজিদেই অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط

অর্থ: আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।[৬]

এখানে প্রথম আদেশটি সাধারণ এবং পরবর্তী আদেশটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথমোক্ত আয়াতে এবং উপরে উল্লেখিত যে আয়াতে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের তিন রজস্রাব কাল অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, সাধারণ নির্দেশ সম্বলিত সেই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় এ আয়াতটির উল্লেখ জরুরি।

উদাহরণ ০৪ : কুরআনুল করিমের একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ .

---

৩. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২২৮।
৪. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৪৯।
৫. আল কুরআন, সূরা ০২ আল বাকারা : আয়াত ২৩৪।
৬. আল কুরআন, সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ৪।

অর্থ: তোমাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হলো মৃত প্রাণী, রক্ত, শুয়োরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে জবাই করা পশু.....।[৭]

এ আয়াতে সাধারণভাবে রক্তকে হারাম করা হয়েছে বলে বুঝা যায়। কিন্তু অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ ۔

অর্থ: (হে নবী!) বলো : আমার প্রতি যে অহি করা হয়েছে, তাতে লোকেরা যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না-মৃত প্রাণী, কিংবা প্রবাহিত রক্ত, অথবা শুয়োরের মাংস ছাড়া.....।[৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, সব রক্ত হারাম নয়, কেবল প্রবাহিত রক্তই (blood poured forth) হারাম। সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় শেষোক্ত আয়াতটির উল্লেখ অত্যাবশ্যকীয়।

উদাহরণ ০৫ : সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○

অর্থ: আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করো, তাদের পথে যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো.....।[৯]

এখানে আল্লাহ তায়ালা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথে পরিচালিত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু অনুগ্রহ প্রাপ্তরা কারা? তাঁদের পরিচয় কী-তা এখানে উহ্য রয়েছে। অপর আয়াতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

অর্থ: এবং যারাই আল্লাহর এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে, তারাই সাথি হবে নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সত্যপন্থীদের, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। কতোইনা চমৎকার সাথি তারা।[১০]

আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এ আয়াত থেকে তাদের পরিচয় জানা গেলো। সুতরাং সূরা ফাতিহার 'তুমি যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছো'-এর ব্যাখ্যা হিসেবে এ আয়াত উল্লেখ্য এবং আলোচ্য।

উদাহরণ ০৬ : একটি সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে :

৭. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ০৩।
৮. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আন'আম : আয়াত ১৪৫।
৯. আল কুরআন, সূরা ১ আল ফাতিহা : আয়াত ৫-৬।
১০. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৬৯।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ○

অর্থ: তোমার কাছে কি 'গাশিয়ার' সংবাদ পৌঁছেছে?[১১]

এই আয়াত পাঠের সাথে সাথেই পাঠকের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়- গাশিয়া কী? কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলোতেই রয়েছে গাশিয়ার তফসির (ব্যাখ্যা)। বলা হয়েছে :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ○ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ○ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ○ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ○ لَّايُسْمِنُ وَلَايُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ○

অর্থ: সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে হীন-অবনত-অপমানিত (humiliated), কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদের পান করানো হবে টগবগে গরম ঝর্ণা থেকে। তাদের জন্যে বিষাক্ত কাঁটাদার গুল্ম ছাড়া আর কোনো খাদ্য থাকবে না। এগুলো তাদের পুষ্টও করবে না, ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।[১২]

উদাহরণ ০৭ : সূরা আল কারিয়ায় বলা হয়েছে :

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ○ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ○

অর্থ: কিন্তু যার (নেক কাজের) ওজন হবে হাল্কা, তার আবাস হবে হাবিয়া।[১৩]

হাবিয়া কী? পাঠকের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে :

وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ○ نَارٌحَامِيَةٌ○

অর্থ: তুমি কিভাবে জানবে সেটা কী? সেটা হলো জ্বলন্ত আগুন।[১৪]

উদাহরণ ০৮ : সূরা হুমাযায় বলা হয়েছে : وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ○

অর্থ: দুর্ভোগ-ধ্বংস প্রত্যেক হুমাযা লুমাযার জন্যে।[১৫]

হুমাযা লুমাযা কোন্ ধরনের লোককে বলা হয়, তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে পরবর্তী দুই আয়াতেই : الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ○ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ○

অর্থ: যে ব্যক্তি অর্থ সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। তার ধারণা, তার অর্থ সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।[১৬]

উদাহরণ ০৯ : সূরা কদর-এ বলা হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ○

---

১১. আল কুরআন, সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ০১।
১২. আল কুরআন, সূরা ৮৮ আল গাশিয়া : আয়াত ২-৭।
১৩. আল কুরআন, সূরা ১০১ আল কারিয়া : আয়াত ৮-৯।
১৪. আল কুরআন, সূরা ১০১ আল কারিয়া : আয়াত ১০-১১।
১৫. আল কুরআন, সূরা ১০৪ আল হুমাযা : আয়াত ০১।
১৬. আল কুরআন, সূরা ১০৪ হুমাযা : আয়াত ২-৩।

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি এটি (আল কুরআন) নাযিল করেছি 'কদর রাতে'। আর তুমি কিভাবে জানবে 'কদর রাত' কী? 'কদর রাত' হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। তাতে ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরিল) নাযিল হয় তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল হুকুম-ফায়সালা নিয়ে।[১৭]

এ রাতের আরো তফসির করা হয়েছে সূরা দুখানে। সেখানে বলা হয়েছে :

حٰمٓ ○ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ○ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا.

অর্থ: হা-মিম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ। আমি এটি নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ক করতে চেয়েছি। সেই রাতে ফায়সালা করা হয় প্রত্যেক নির্দেশিত বিষয় আমার আদেশক্রমে।[১৮]

কুরআন নাযিলের রাত সংক্রান্ত এই দুই স্থানের একটি অপরটির তফসির।

২. কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাহ্ বা হাদিস

কুরআন ব্যাখ্যার দ্বিতীয় ভিত্তি হলো রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ- যা হাদিস ও সিরাত গ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি কুরআন নাযিল হয়। তিনি ছিলেন কুরআনের মূল শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা। তিনি ছিলেন বাস্তব কুরআন। রসূল হিসেবে তাঁর যাবতীয় কার্যক্রমই ছিলো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই কুরআনের তফসির হিসেবে কুরআনের পরেই রসূলুল্লাহ সা.-এর সিরাত ও সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে সুন্নাহ দ্বারা কুরআন তফসির-এর কয়েকটি নমুনা ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ ১ : কুরআন মজিদের একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ .

অর্থ: হে মুমিনরা! তোমরা রুকু করো, সাজদা করো এবং তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো.....।[১৯]

এ আয়াতে সালাতে রুকু ও সাজদা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কয়টি রুকু এবং কয়টি সাজদা করতে হবে- তা কুরআনে কোথাও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার জন্যে অবশ্যি রসূলুল্লাহ্ সা.-এর সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি বলেছেন : صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ .

অর্থ: সালাত আদায় করো, যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো আমাকে।[২০]

সাহাবিগণ রসূলুল্লাহ সা.-এর সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে যেসব হাদিস বর্ণনা

---

১৭. আল কুরআন, সূরা ৯৭ আল কদর : আয়াত ১-৫।
১৮. আল কুরআন, সূরা ৪৪ আদ দুখান : আয়াত ১-৫।
১৯. আল কুরআন, সূরা ২২ আল হাজ্জ : আয়াত ৭৭
২০. সহীহ বুখারি ও মুসনাদে আহমদ।

করেছেন, সেগুলো থেকে জানা যায় তিনি সালাতে একটি রুকু এবং দুটি সাজদা করতেন। এখানে সহীহ বুখারির একটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

عن ابى قلابة ان مالك ابن الحويرث قال لاصحابه الا انبئكم صلوة رسول الله قال وذالك فى غير حين صلوة فقام – ثم ركع فكبر. ثم رفع رأسه فقام هنية. ثم سجد ثم رفع رأسه هنية. ثم سجد ثم رفع رأسه هنية. فصلى صلوة عمرو بن سلمة شيخنا .

অর্থ: আবু কেলাবা বর্ণনা করেন, একবার মালেক ইবনে হুয়াইরিছ তার সাথিদের বললেন : আমি কি তোমাদের বলবো, রসূলুল্লাহ সা.-এর সালাত কেমন ছিলো? (বর্ণনাকারী বলেন, সেটা কোনো সালাতের সময় ছিল না)। অতপর তিনি দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহু আকবর বলে রুকু করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর সাজদা করলেন, অতপর সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। অতপর পুনরায় সাজদা করলেন এবং সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এভাবে তিনি আমাদের শাইখ আমর বিন সালামার মতোই পুরোটা সালাত আদায় করলেন।[২১]

এভাবে সালাত আদায়ের সামগ্রিক নিয়ম পদ্ধতি, আরকান আহকাম, সালাত সহীহ হওয়া এবং সালাত নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ সুন্নাহর মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অথচ কুরআন মজিদে তো কেবল বলা হয়েছে : اقيموا الصلوة 'সালাত কায়েম করো।' সালাত কায়েমের সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে সুন্নাহ থেকেই।

উদাহরণ ২ : কুরআন মজিদে বলা হয়েছে : وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত প্রদান করো।' এছাড়া কুরআন মজিদে যাকাত প্রাপ্যদের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।[২২]

কিন্তু কুরআন মজিদে যাকাতের নিসাব উল্লেখ নেই। তাছাড়া কোন্ ধরনের অর্থ সম্পদের নিসাব কতো, তাও কুরআনে উল্লেখ নেই। যাকাত কি জীবনে একবার প্রদেয়, না বার্ষিক, নাকি মাসিক- তাও কুরআনে উল্লেখ নেই। কিন্তু রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ্তে কুরআনের নির্দেশ 'যাকাত প্রদান করো'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছে। সুন্নাহ্র ব্যাখ্যা ছাড়া সালাতের মতোই 'যাকাত প্রদান করো' এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। একই কথা হজ্জের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উদাহরণ ৩ :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ○

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।[২৩]

---

২১. সহীহ বুখারি, ২য় খণ্ড (আধুনিক প্রকাশনী), হাদিস নম্বর ৭৭৩, অনুচ্ছেদ : দুই সাজদার মাঝখানে কিছুটা অপেক্ষা করা।

২২. আল কুরআন, সূরা ৯ আত তাওবা : আয়াত ৬০।

২৩. আল কুরআন, সূরা ৬ আন আম : আয়াত ৮২

এ আয়াতটি যখন নাযিল হলো, তখন 'নিজেদের ঈমানকে যলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই' কথাটি সাহাবিগণের কাছে কঠিন মনে হলো। তারা ভাবলেন, এমন কে আছে, যে নিজের ঈমানকে যুলুম-এর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত পবিত্র রাখতে পারে? তারা রসূলুল্লাহ সা.-কে বিষয়টি জানালেন :

قَالُوْا اَيُّنَالَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص : لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ - اِنَّمَا هِىَ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ لِابْنِهٖ يَابُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ: তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! নিজের প্রতি যুলুম করে না- আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? তখন রসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমরা যা ভেবেছো, বিষয়টি তা নয়। এটা হলো, আল্লাহর নেক বান্দা (লুকমান) তার পুত্রকে অসিয়ত করতে গিয়ে যা বলেছিলেন তাই : 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। কারণ শিরক মহা যুলুম।'[২৪]

অর্থাৎ এখানে যুলুম মানে-শিরক। সুতরাং এই আয়াতে যুলুম-এর তফসির যে 'শিরক' সুন্নাহ দ্বারা এ ব্যাখ্যা চূড়ান্ত।

সূরা আলে ইমরানে অহুদ যুদ্ধের, সূরা আল আনফালে বদর যুদ্ধের এবং সূরা তাওবায় তবুক যুদ্ধের যে পর্যালোচনা করা হয়েছে, এছাড়া সূরা আল ফাত্হ-এ হুদাইবিয়ার সন্ধির যে পর্যলোচনা করা হয়েছে, হাদিস এবং সীরাতে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া-এসব পর্যালোচনা যথার্থভাবে বুঝা কঠিন। গোটা কুরআনের ব্যাপারেই একথা প্রযোজ্য।

হাদিস গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুত তাফসির' বা 'তফসির অধ্যায়' সংকলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানা যাবে হাদিস গ্রন্থসমূহের উক্ত অধ্যায়ে। এছাড়া 'তাফসির বিল মা'ছুর' সমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উদাহরণ পাওয়া যাবে।[২৫]

❖❖❖

২৪. সহীহ বুখারি, মুসনাদে আহমদ, ইবনে আবি হাতিম। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য : তফসিরে ইবনে কাসির - সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসির।

২৫. এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : ১. তাফসিরে তাবারি ২. তাফসিরে ইবনে কাসির ৩. তাফসিরে ইবনে আতিয়া।

অনুচ্ছেদ ৬

কুরআন তফসির-এর বাতিল ভিত্তি

তফসির-এর সঠিক উৎস, ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহ আলোচনা করার পর এবার জানা দরকার তফসির করার বাতিল, প্ররিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য উৎস, ভিত্তি ও পদ্ধতি কি কি? প্রাথমিক কাল থেকেই কিছু লোক বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য ভিত্তি ও পদ্ধতিতে তফসির করে আসছেন, যা তফসির হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কাজ করা হয়েছে কয়েকটি কারণে। সেগুলো হলো :

১. অসতর্কতার কারণে। অর্থাৎ কিছু লোক অসচেতনভাবে এসব প্রক্রিয়ায় তফসির করেছেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নয়।

২. অযোগ্যতার কারণে।

৩. অজ্ঞতার কারণে।

৪. কুরআনকে নিজের চিন্তার অধীন করার অর্থাৎ ভ্রান্ত ধারণার কারণে।

৫. পরিকল্পিতভাবে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে।

তফসির করার বাতিল ভিত্তি, উৎস ও পদ্ধতিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ইসরায়িলি সূত্রের বর্ণনা ভিত্তিক তফসির

এর অর্থ ইহুদি ও খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় গ্রন্থাবলি এবং ধর্মীয় প্রথা প্রচলনকে ভিত্তি করে বা সেগুলোকে জ্ঞানের উৎস ধরে নিয়ে কুরআনের তফসির করা। পরিভাষা হিসেবে এগুলোকে বলা হয় 'ইসরায়িলিয়াত'।

বিশেষজ্ঞগণ ইসরায়িলিয়াতকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো :

১. কুরআন সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত। অর্থাৎ কুরআন এবং হাদিসে যেসব ইসরায়িলিয়াতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন মূসা আ. ম্যাজেসিয়ানদের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

২. কুরআন সুন্নাহর মানদণ্ডে অসত্য প্রমাণিত। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক অসংখ্য ইসরাইলি বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো অসত্য মিথ্যা বানোয়াট। যেমন, সুলাইমান আ. জীবন সয়াহ্নে মূর্তি পূজা করেছিলেন। দাউদ আ. পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ইত্যাদি।

৩. সেসব ইসরায়িলিয়াত যেগুলো কুরআন, সুন্নাহ দ্বারা সত্যায়িতও নয় আবার মিথ্যাও প্রমাণিত নয়। এগুলোকে সত্য বলাও ঠিক নয়, মিথ্যা বলাও ঠিক নয়। এগুলোর ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করাই উত্তম।

প্রাথমিক যুগে কা'বুল আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস ইসলামের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসরায়িলিয়াত আমদানি করেন।

ইসরায়িলিয়াতের ভিত্তিতে তফসির করা নিষিদ্ধ। তবে কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত সত্যকে সত্য বলার জন্যে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করার জন্যে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে। তফসিরের ভিত্তি বানানো যাবে না। এ ধরনের কাজ যারা করেছেন, তাদের তফসির পরিত্যাজ্য।

২. সুফিবাদ ভিত্তিক তফসির

সুফিরা যে বাতেনি চিন্তাধারা পোষণ করেন, কুরআনকে সেগুলোর ভিত্তি বানানোর জন্যে, সেই দৃষ্টিভংগিতে কুরআন তফসির করাকে সুফিবাদী তফসির বলা হয়। তাদের তফসিরকে তফসিরে ইশারিও বলা হয়। সুফিবাদী দৃষ্টি ভংগিতে কয়েকটি তফসির প্রনয়ণ করা হয়েছে। তাদের তফসির তিন প্রকার :

১. বাতিল।

২. সহীহ এবং বাতিলের মিশ্রণ সম্বলিত।

৩. তাফসির বির রায়। (বিবেক বুদ্ধি প্রসূত মনগড়া তফসির আল ফাসিদ)।

৩. স্বাধীন বিবেক বুদ্ধি প্রসূত মনগড়া তফসির

কুরআনের অর্থ বিকৃতির ক্ষেত্রে এ ধরণের তফসির করা সবচেয়ে মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ومن قال فى القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار

অর্থ: যে নিজের খেয়াল খুশির ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, সে যেনো জাহান্নামে নিজের আবাস গ্রহণ করে।[১]

নিজের স্বাধীন ভ্রান্ত বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি সঠিক ব্যাখ্যাও করে, তবু তা ভ্রান্ত বলেই আখ্যায়িত হবে।

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : من تكلم فى القران برأيه فاصاب فقد اخطاء .

অর্থ: কেউ যদি কুরআন সম্পর্কে নিজের স্বাধীন মত মতো কোনো কথা বলে, আর যদি সেটি ঠিকও হয়, তবু সে ভুল করেছে বলেই ধরা হবে।[২]

স্বাধীন বুদ্ধি প্রসূত মনগড়া তফসির কয়েক প্রকারের হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশি তাঁর 'আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন', আল্লামা সুয়ূতি তাঁর 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' এবং মুহাম্মদ তকি উসমানি তাঁর 'উলূমুল কুরআন' গ্রন্থে এর কয়েকটি ধরণ উল্লেখ করেছেন :

"১. যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তফসির করা এবং শুধুমাত্র নিজের রায়ের উপর ভিত্তি করে তফসির করা।

২. রসূলুল্লাহ সা. সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং তাবেয়ীগণের নিকট থেকে কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট তফসির স্থিরকৃত থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোনো অর্থ বর্ণনা করা।

৩. যেসব আয়াতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম রা. ও তাবেয়ীগণ থেকে কোনো

---

১. তফসিরে কুরতুবি : বর্ণনা- ইবনে আব্বাস রা.।

২. আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খণ্ড।

সুস্পষ্ট তফসির বর্ণিত হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে আরবি ভাষা, সাহিত্য, অভিধান ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে মনগড়া ব্যাখ্যা বর্ণনা করা।

৪. কুরআন-হাদিস থেকে বিধি বিধান নির্ণয় করার জন্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদ শুরু করা।

৫. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এবং সেগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করা।

৬. কুরআনের এমন ব্যাখ্যা করা যার দ্বারা ইসলামের সর্বস্বীকৃত আকিদা-বিশ্বাস ও বিধি বিধান লংঘিত হয়।

৭. তফসির করার জন্যে ইজতিহাদ-গবেষণা ও বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের যেসব বৈধ ক্ষেত্র রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে অকাট্য দলিল ছাড়া নিজের মতকে অকাট্য, নিশ্চিত ও একমাত্র সঠিক মনে করা এবং অন্যান্যদের মতকে বাতিল বলা।

এগুলোকেই বলা হয় তফসির বির রায় (মনগড়া তফসির)। হাদিসে এ ধরনের তফসির থেকেই বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

তবে, তফসির-এর মূলনীতিসমূহ এবং ইসলামের সর্বসম্মত নিয়মনীতির অনুসরণ করে যদি তফসির-এর ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করা হয়- যা কুরআন সুন্নাহ এবং কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিভংগির পরিপন্থী না হয়, তবে তা হাদিসে উল্লেখিত শাস্তির আওতায় পড়বে না।"[৩]

৪. ভ্রান্ত মতবাদ ভিত্তিক তফসির

কুরআন তফসিরের আরেকটি বাতিল ভিত্তি হলো, কোনো ভ্রান্ত মতবাদ ভিত্তিক তফসির। বিষয়টি হলো এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো একটি আকিদা বা মতবাদ আবিষ্কার করলো, অথবা কোনো ভ্রান্ত আকিদা, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভংগি বা মতবাদকে সঠিক বলে গ্রহণ করলো, অতপর সেই আকিদা, দৃষ্টিভংগি ও মতবাদের পক্ষে কুরআনকে টেনে হিচঁড়ে, জোর করে অপব্যাখ্যা দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলো, বা কুরআনের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করলো। এ ধরনের তফসির মূলত মনগড়া তফসিরেরই অন্তর্ভুক্ত। অতীতে এ ধররেনর তফসির করেছে মু'তাযিলা, হাদিস অস্বীকারকারী কুরআননিয্যূন, কাদিয়ানি এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ পন্থীরা।

❖❖❖

৩. মুহাম্মদ তকি উসমানি : উলূমুল কুরআন, ২য় খণ্ড।

অনুচ্ছেদ : ৭

মুফাসসির : তফসির করার যোগ্যতা

১. মুফাসসির কে?

তফসির যিনি করেন, তাকে বলা হয় 'মুফাসসির'। ইসলামি জগতে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞদের জন্যে পরিভাষা চালু রয়েছে। যেমন আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ, মুফতি। তেমনি একটি পরিভাষা মুফাসসির। যিনি ইসলামি বিশ্বাস ও চরিত্রসহ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে বিধিবদ্ধ নিয়মে কুরআন মজিদের অর্থ, তাৎপর্য এবং মর্ম ও শিক্ষার ব্যাখ্যার প্রদান করেন, তাকেই বলা হয় মুফাসসির। প্রথমত কুরআন মজিদ নিজেই নিজের মুফাসসির।

অতপর যাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. কুরআনের অবশ্য অনুসরণীয় মুফাসসির। এরপর রসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসারীদের মধ্যে প্রথম স্তরের এবং শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হলেন সাহাবায়ে কিরাম রা.। তাঁরা রসূল সা.-এর আমল এবং বাণী থেকে প্রত্যক্ষভাবে কুরআনের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

সাহাবিগণের পর মুফাসসির হিসেবে তাবেয়ীগণের অবস্থান। তাঁদের পর অবিচ্ছিন্নভাবে যুগের পর যুগ কুরআন মজিদের তফসির করা হয়েছে, হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। এই পরবর্তী যুগের মুফাসসিরদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এঁদের মধ্যে প্রকৃত মুফাসসির তাঁরাই, যারা আল্লাহ যে উদ্দেশ্য এবং যে মর্মার্থ ও তাৎপর্যসহ কুরআন মজিদ নাযিল করেছেন, কুরআন মজিদের সে উদ্দেশ্য, মর্মার্থ ও তাৎপর্য আল্লাহর বান্দাদের কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার প্রয়াস চালান।

২. বক্তা মুফাসসির

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি। আল্লাহর কালাম আল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই শুধু বাংলাভাষী লোকেরা কেন পৃথিবীর কোনো অনারবই আরবি ভাষা না শিখে সরাসরি কুরআনের ইলম হাসিল করতে পারে না। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় লেখা ও অনূদিত কুরআনের তফসির আজ আল্লাহর রহমতে শিক্ষিত জনগণের চাহিদা মিটাচ্ছে। কিন্তু যারা পড়েন না, যারা পড়ার সময় পান না এবং যারা তাফসির সংগ্রহ করে পড়তে অসমর্থ, অথচ সকল মুসলমানের জন্যই কুরআনের জ্ঞান লাভ করা ফরয; তাদের দিকে লক্ষ্য করেই দেশের উলামায়ে কিরাম জনগণের মধ্যে কুরআনের ইলম প্রচার করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আকারে কুরআনের তফসির করে থাকেন।

আবার অনেকেই জনগণকে কুরআনের শিক্ষায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মহল্লায়, মসজিদে, অফিসে দরসে কুরআনের ব্যবস্থা করে থাকেন।

এরা সকলেই বক্তা মুফাসসির। এদের সকলকেই কুরআন তফসিরের শর্তাবলী পূর্ণ করা ও প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়া এবং প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুনের অনুসরণ করা উচিত।

৩. পূর্ণাঙ্গ মুফাসসির এবং আংশিক মুফাসসির

অতীতকাল থেকে নিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত দেখা গেছে, যাঁরা কুরআন মজিদের তফসির লিখে আসছেন, তাঁদের অনেকেই পুরো কুরআনের তফসির লিখেছেন, আবার অনেকেই কুরআনের অংশ বিশেষ বা সূরা বিশেষের তফসির লিখেছেন। আবার অনেকে বিষয় ভিত্তিক তফসির লিখেছেন।

বক্তা মুফাসসিরদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ শ্রোতাদের ধারাবাহিকভাবে পুরো কুরআনের তফসির উপস্থাপন করেন, আবার অনেকেই অংশ বিশেষের তফসির উপস্থাপন করেন।

উভয় ধরনের মুফাসসিরকেই তফসির করার শর্তাবলী অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যোগ্যতার ক্ষেত্রে তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে মৌলিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

৪. তফসির করার বা মুফাসসির হবার শর্ত

যে কোনো ব্যক্তি কুরআনের তফসির করার উদ্যোগ নেবেন, তার মধ্যে অবশ্যি কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত বর্তমান থাকতে হবে। পাঁচটি শর্ত মৌলিক।

১ম শর্ত : মুফাসসিরকে ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাসের অনুসারী হতে হবে। সেই সাথে সুস্থ চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে।

২য় শর্ত : তাকে ইসলামী আইন বিধান এবং নিয়ম কানুনের পূর্ণ অনুসারী ও অনুবর্তনকারী হতে হবে।

এ দুটো শর্ত এ জন্যে অপরিহার্য যে, তার আকিদায়ই যদি গলদ থাকে তাহলে তফসিরে তার নিজের আকিদারই বহি:প্রকাশ ঘটবে। এমন ব্যক্তির তফসির কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ ও অনুবর্তনের মতো আমানতদারীই নেই, এমন ব্যক্তি যতো বড় আলেমই হোক না কেন, আল্লাহর কালামের তফসির করার মত আমানতদারী তার মধ্যে থাকতে পারে না।

৩য় শর্ত : তাকে রসূলুল্লাহ সা., সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেয়ীগণের তফসিরের অনুসারী হতে হবে। কুরআনের ব্যাখ্যা তাদের থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

৪র্থ শর্ত : তাকে যাবতীয় বিদআত ও মুহদসাত বর্জন করে কেবল মাত্র প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে তফসির করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যাখ্যা যেনো কুরআনের কোনো শিক্ষা, রসূল সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যার সাথে অসামঞ্জস্যশীল না হয়।

৫ম শর্ত : তাকে খালিস নিয়্যতের অধিকারী হতে হবে। তাকে এমন আন্তরিকতা সম্পন্ন হতে হবে, যেনো তার প্রতিটি ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও কথাতেই নিয়্যতের খুলুসিয়াত ফুটে উঠে। আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই তাকে তফসিরের কাজে হাত দিতে হবে।[১]

৫. তফসির করার নৈতিক যোগ্যতা

কুরআন মজিদের তফসির করার জন্যে একজন মুফাসসির-এর বহুবিধ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এসব যোগ্যতা প্রধানত দুই প্রকার :

১. নৈতিক বা আখলাকি যোগ্যতা এবং

২. জ্ঞানগত বা ইল্‌মি যোগ্যতা।

মুফাসসিরের কতিপয় মৌলিক নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া জরুরি। নিম্নোক্ত গুণাবলীর অবর্তমানে কারো তফসির গ্রহণযোগ্য হতে পারে না :

১. তাকওয়া : তফসির করার জন্যে এটি প্রধান নৈতিক গুণ। মুফাসসিরকে অবশ্যি আল্লাহভীরু হতে হবে। আল্লাহর বাণী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, আল্লাহর বাণী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তার মনে এ ভয় থাকতে হবে, যেনো কোনো মনগড়া কথা তিনি না বলেন; কোনো মিথ্যা, কাল্পনিক, বানোয়াট ও অনির্ভরযোগ্য কথা যেনো তিনি না বলেন; নিজের ভ্রান্ত দর্শন ও আকিদার প্রতিফলন যেনো না ঘটান।

২. বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি : অর্থাৎ তার প্রতিটি ব্যাখ্যা ও বক্তব্য যেনো বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হয় সে ব্যাপারে তাকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

৩. আদল বা ন্যায়পরায়নতা : অর্থাৎ তাকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যার কথা ও কাজ হয়ে থাকে ন্যায্য ও যথাযথ, যার থেকে অন্যায়-অন্যায্য কথা ও কাজ কেউ কল্পনা করে না।

৪. সততা ও সত্যবাদিতা : অর্থাৎ তাকে হতে হবে সৎ, সত্যবাদী ও সত্যপন্থী। তাকে এমন হতে হবে যে, তার ব্যাপারে সত্যের খেলাফ অকল্পনীয়।

৫. কথা ও কাজের ঐক্য : অর্থাৎ তাকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি মুখে যা বলেন এবং কলমে যা লেখেন, কাজেও তাই করেন। তার কাজে এবং কথায় মিল থাকতে হবে। তার কথা ও কাজ একটি হবে আরেকটির প্রতিচ্ছবি।

৬. বিনয় : মুফাসসিরকে বিনয়ী হতে হবে। আল্লাহর কালাম যেনো তাকে বিনয়ী করে রাখে, জ্ঞানের অহংকার তার মধ্যে থাকবেনা।

৭. আত্মমর্যাদাবোধ : তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। তার মধ্যে মুমিনোচিত আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে হবে। যার ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ নেই, তার পক্ষে আল্লাহর কালামের তফসির করা সম্ভব নয়।

---

১. আবু তালিব আত তাবারি : জালালুদ্দিন সুয়ূতির আত ইতকান ফী উলূমিল কুরআন গ্রন্থের সূত্রে উদ্ধৃত।

৮. আনুগত্য : আত্মমর্যাদাবোধের সাথে সাথে তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুগত হতে হবে।

৯. নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা : কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার, কোনো ক্ষমতাবানের ধমক, কিংবা কোনো নির্যাতনকারীর নির্যাতন তাকে সত্য প্রকাশে বিরত রাখবে না। সত্য গোপন নয়, সর্বাবস্থায় সত্য প্রকাশই হবে তার নীতি।

৬. তফসির করার ইল্‌মি যোগ্যতা

তফসির করার জন্যে মুফাসসির-এর কতিপয় মৌলিক ইল্‌মি যোগ্যতা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্ত মৌলিক ইল্‌মি যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তিই কুরআন মজিদের তফসির করার যোগ্যতা অর্জন করেন :

১. দীনি ইল্‌ম : তফসির করার জন্যে মুফাসসিরকে দীনি ইল্‌মের অধিকারী হতে হবে। দীনের যথার্থ ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান, তাফাক্কুহ্ ফীদ্‌দীন এবং ঈমান আকিদা সংক্রান্ত সঠিক ধারণা ও বুঝ তার থাকতে হবে।

২. শরিয়া সংক্রান্ত ইল্‌ম : অর্থাৎ দীনের বিধি বিধান তার জানা থাকতে হবে।

৩. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সংক্রান্ত জ্ঞান তার থাকতে হবে।

৪. উসূলুত তাফসির সংক্রান্ত বিস্তারিত জ্ঞান তার থাকতে হবে।

৫. সীরাতুন্নবী সা.-এর সঠিক ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে।

৬. সুন্নতে রসূল সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা থাকতে হবে।

৭. হাদিস ও উসূলে হাদিসের জ্ঞান তার থাকতে হবে।

৮. যে সমাজে কুরআন নাযিল হয়েছিল, সে সমাজের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং তাদের জীবনধারা সম্পর্কে তার জানা থাকতে হবে।

৯. যাঁরা কুরআনের প্রথম অনুসারী ও বাহক ছিলেন তাদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর সীরাত ও ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে।

১০. কুরআনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা. মানুষের মধ্যে যে মানসিক ও নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন, সে বিপ্লব সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা থাকতে হবে।

১১. কুরআনের মাধ্যমে রসূল সা. যেভাবে একটি মানবদল গঠন ও পরিচালনা করেছিলেন, তার ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে।

১২. কুরআন প্রচার করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ সা. যেসব অপবাদ, তিরস্কার, বাধা বিপত্তি, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিগ্রহের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলোর ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে এবং এসবের মোকাবিলা করার জন্যে কুরআন তাঁকে কিভাবে গাইড করেছিল সে সম্পর্কেও সঠিক ধারণা তার থাকতে হবে।

১৩. কুরআনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সা. কিভাবে একটি পূর্ণাংগ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিপ্লব সাধন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে।

১৪. রসূলুল্লাহ সা. কুরআন দ্বারা কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, বিচার ফায়সালা করেছিলেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন, সে ইতিহাস তার জানা থাকতে হবে।

১৫. কুরআনের বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তার সঠিক ও যথাযথ ধারণা থাকতে হবে, এ সম্পর্কে থাকতে হবে সুস্পষ্ট জ্ঞান।

১৬. কুরআনের মূল আহ্বান সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

১৭. কুরআনের ভাষা জ্ঞান : কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষার অর্থাৎ আরবি ভাষার আভিধানিক ও পারিভাষিক জ্ঞান, বাকরীতি, বাগধারা, শব্দ ও বাক্যগঠন প্রণালী, অলংকার শাস্ত্র, ধ্বনিতত্ত্ব ইত্যাদির জ্ঞান তার থাকতে হবে।

১৮. তাকে উলূমুল কুরআন বা কুরআনের শাস্ত্রিক জ্ঞান-এর অধিকারী হতে হবে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

ক. কুরআনের বাচন ভঙ্গি সংক্রান্ত স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

খ. শানে নুযূল জানা থাকতে হবে।

গ. নাযিলের কাল এবং সন্নিবেশন পরম্পরার জ্ঞান থাকতে হবে।

ঘ. মুহকাম ও মুতাশাবেহ আয়াতের জ্ঞান থাকতে হবে।

ঙ. নাসিখ মানসুখের জ্ঞান থাকতে হবে, অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

চ. আ'ম ও খাসের জ্ঞান থাকতে হবে।

ছ. হাকিকত ও মাজাযের জ্ঞান থাকতে হবে।

জ. মুতলাক ও মুকাইয়্যাদের জ্ঞান থাকতে হবে।

ঝ. আমর ও নাহির জ্ঞান থাকতে হবে।

ঞ. মক্কী ও মাদানি সূরা এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য জানা থাকতে হবে।

ট. অহি সংক্রান্ত বিস্তারিত ধারণা তার থাকতে হবে। যেমন অহির পরিচয়, প্রকারভেদ, নাযিলের পদ্ধতি ও সত্যতা ইত্যাদি।

ঠ. কুরআনের বিভিন্ন ধরনের কিরাত সম্পর্কে তার ধারণা থাকতে হবে।

১৯. কুরআন ও মানব রচিত গ্রন্থের মধ্যকার পার্থক্য তার জানা থাকতে হবে। কুরআনের অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ তাকে জানতে হবে।

২০. অতীত মুফাসসিরগণের তফসির তার জানা থাকতে হবে। রসূলুল্লাহ সা.-এর তফসির, সাহাবিগণের তফসির, তাবেয়ীগণের তফসির এবং পরবর্তী শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরগণের তফসির তার জানা থাকা জরুরি।

২১. কুরআনের উপর বিরুদ্ধবাদীদের আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করার এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত করার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা তার থাকতে হবে।

২২. আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা : একজন মুফাসসিরকে অবশ্যি তার যুগ-কাল-সময়ের জ্ঞান বিজ্ঞান ধারণ করতে হবে। এ যাবত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেসব উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং যেসব আবিষ্কার গবেষণা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সাধারণ ও মৌলিক ধারণা তাকে অর্জন করতে হবে। আর

যেসব আবিষ্কার ও উন্নতি সম্পর্কে কুরআনে ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তার অর্জন করা উচিত। কালের প্রেক্ষিতে কুরআন বুঝা এবং বুঝানোর জন্যে এটা খুবই জরুরি।

২৩. মাতৃভাষা জ্ঞান : তিনি যে ভাষায় তফসির করবেন সে ভাষার সাহিত্য মানের জ্ঞান তার থাকতে হবে। যেমন, তিনি যদি বাংলা ভাষায় তফসির করতে চান, তাহলে বাংলা ভাষার আভিধানিক, পারিভাষিক জ্ঞান তার থাকতে হবে। বাংলাভাষীদের বাচনভঙ্গি ও বাকরীতি তার জানা থাকতে হবে। অলংকার শাস্ত্র জানা থাকতে হবে। শব্দ ও বাক্যগঠন প্রণালী সম্পর্কে তাকে দক্ষ হতে হবে। সর্বশেষ বানান রীতি তার জানা থাকতে হবে। তাকে বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের অধিকারী হতে হবে। এ ভাষার পণ্ডিতদের ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতি তার জানা থাকতে হবে। কারণ যে ভাষায় আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা করা হবে, সে ভাষার সর্বোন্নত ও বিশুদ্ধতম প্রয়োগই আল্লাহর বাণীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্যে শোভনীয়।

২৪. অর্থবহ শব্দ ও ভাষা প্রয়োগের যোগ্যতা : অর্থাৎ কুরআনের উদ্দেশ্য বা ভাব ব্যক্ত করার জন্যে সঠিক ও যথার্থ শব্দ প্রয়োগ করার যোগ্যতা তার থাকতে হবে। অযথা পেঁচানো বাক্য প্রয়োগের পরিবর্তে গুছানো অর্থবহ সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগের যোগ্যতা তার থাকতে হবে।

২৫. শ্রোতা বা পাঠকদের অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর যোগ্যতা : কুরআন মজিদ মানুষকে যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, আদ্যপান্ত সমস্ত ব্যাখ্যা ও বক্তব্য সে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত করার যোগ্যতা তার থাকতে হবে। যাতে করে তার ব্যাখ্যা ও বক্তব্য দ্বারা মানুষের পক্ষে কুরআনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সহজতর হয়।

৭. শর্ত ও যোগ্যতাসমূহের ভিত্তি ও গুরুত্ব

এখন প্রশ্ন হতে পারে তফসির করার জন্যে এ যাবত যেসব শর্ত ও যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে সেগুলার : ১. ভিত্তি কী? এবং ২. সবগুলো যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া কি তফসির করা যাবে না?

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, কুরআন তফসিরের জন্যে এ যাবত যেসব শর্ত ও যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, কুরআন বিশেষজ্ঞগণ সেগুলো নির্ধারণ করেছেন কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও বাস্তবতার ভিত্তিতে। এর কোনো একটিও মনগড়া, অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয়। এগুলোর প্রমাণ ও ভিত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কুরআন মজিদে এবং রসূলুল্লাহ সা.-এর বাণীতে। যেমন :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ○

অর্থ: তোমরা যা করনা, তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে বড়ই অসন্তোষ উদ্রেককারী।[২]

وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ○

২. আল কুরআন, সূরা ৬১ আস সফ : আয়াত ০৩।

অর্থ: (শয়তানই) আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা যা জানো না তা বলার নির্দেশ দেয়।[৩]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ○

অর্থ: আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুগামী হয়ো না। কান, চোখ, অন্তর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৪]

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

অর্থ: যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া কুরআনের ব্যাপারে কথা বলে, সে যেনো তার আবাস বানায় জাহান্নামে।[৫]

এছাড়া ইতিহাস ও অতীতের বাস্তবতা সাক্ষ্য, এসব শর্ত ও যোগ্যতা ছাড়া যারা তফসির করেছেন, তাদের দ্বারা কতো ভ্রান্ত তফসির হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যায় কতো ব্যাপকভাবে তাদের দ্বারা ভিত্তিহীন, অনির্ভরযোগ্য ও মনগড়া কথাবার্তা ঢুকে পড়েছে। তাছাড়া কতো লোকই তো কুরআনের ব্যাখ্যায় তাদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা এবং নষ্ট আকিদা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এছাড়া অনেক ব্যক্তিই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুরআনের ভুল অর্থ করেছে এবং ব্যাখ্যা কুরআনের অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে।

এসব কারণে কুরআন মজিদের তফসির করার জন্যে উল্লেখিত শর্ত ও যোগ্যতাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. কুরআন তফসির-এর জন্যে সব যোগ্যতাই কি জরুরি?

কুরআন মজিদের তফসির করার জন্যে যেসব শর্ত ও নৈতিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ছোট বড় প্রত্যেক মুফাসসির-এর জন্যে সেগুলো অপরিহার্য।

বাকি থাকলো ইল্‌মি যোগ্যতাসমূহের কথা। সে প্রসঙ্গে জরুরি কথা হলো :

১. নির্ভরযোগ্য তফসির করার জন্যে সবগুলো ইল্‌মি যোগ্যতাই জরুরি।

২. যারা সংক্ষিপ্ত তফসির করেন, তাদেরকেও বিশেষ বিশেষ ইল্‌মি যোগ্যতা অর্জন করা জরুরি।

৩. যারা মৌখিক তফসির করেন বা দরসে কুরআন পেশ করেন তাদেরকেও কিছু মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া জরুরি।

তবে কোনো অবস্থাতেই কুরআনের ব্যাপারে অজ্ঞতা নিয়ে কোনো কথা বলা উচিত নয়।

❖❖❖

৩. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১৬৯।
৪. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৩৬।
৫. সূত্র : সুনানে আবু দাউদ।

অনুচ্ছেদ : ৮

কুরআন তফসির-এর পদ্ধতি

১. অনারবি ভাষায় তফসির করলে অনুবাদ করতে হবে

সূচনাকাল থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত আরবি ভাষাতেই কুরআনের তফসির হয়েছে। পরেও কুরআনের অধিকাংশ তফসির আরবি ভাষাতেই হয়েছে। অতপর ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় তফসির হয়েছে এবং হচ্ছে।

যারা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের তফসির করবেন, তাদেরকে কুরআন ব্যাখ্যার পূর্বেই অনুবাদ করে নিতে হবে। এটা অতি আবশ্যকীয়। কারণ, অনুবাদ ছাড়া শুধু ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা পাঠকদের বোধগম্য হবে না।

২. শানে নুযূল বা অবতীর্ণের পটভূমি উপস্থাপন

ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বেই মুফাসসিরকে দুটি বিষয় আলোচনা করে নেয়া জরুরি :

১. অবতীর্ণের কাল। অর্থাৎ সহীহ সূত্র থেকে যদি সূরাটি বা আয়াতগুলো অবতীর্ণের কাল জানা যায়, প্রথমেই তিনি সেটা উপস্থাপন করবেন।

২. অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট। কুরআন মজিদের বিভিন্ন সূরা এবং আয়াত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বেই সহীহ সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল উপস্থাপন করা জরুরি।

অবতীর্ণের কাল ও প্রেক্ষাপট প্রথমেই উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে আয়াতের ব্যাখ্যা ও মর্ম অনুধাবন করা পাঠকদের জন্যে সহজতর হবে।

৩. ব্যাখ্যা উপস্থাপন

এরপরই মুফাসসিরকে কুরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা উত্তম :

১. প্রথমেই মুফরাদাত বা শব্দার্থের ব্যাখ্যা, বিশেষ করে কঠিন শব্দাবলীর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে। এটা করতে হবে আরবি ভাষার অভিধান এবং আরবদের বাকরীতির আলোকে।

২. দ্বিতীয়ত, পরিভাষার অর্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে। কুরআন মজিদে অসংখ্য পরিভাষা রয়েছে, সেগুলোর প্রচলিত অর্থ উপস্থাপন করতে হবে।

৩. আলোচ্য অংশে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনার ইংগিত থাকলে সহীহ সূত্রের বর্ণনার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থাপন করতে হবে।

৪. কুরআনের অন্যান্য স্থানে আলোচ্য আয়াত বা বিষয় সম্পর্কে কোনো উল্লেখ থাকলে সেই আয়াত বা আয়াতগুলো ব্যাখ্যা হিসেবে যথাস্থানে এবং যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫. রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ (যা হাদিস আকারে সংরক্ষিত রয়েছে) এবং সীরাতে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা বিষয়ের কোনো বর্ণনা পাওয়া গেলে ব্যাখ্যা হিসেবে তা উল্লেখ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে হাদিস বা বর্ণনা অবশ্যি মুহাদ্দিস এবং মুজতাহিদগণের নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে সহীহ হতে হবে।

৬. অতপর কুরআন সুন্নাহ্তে যেসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যাখ্যা বিদ্যমান পাওয়া না যায়, সেসব ক্ষেত্রে কোনো সাহাবি থেকে সহীহ সূত্রে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে সেটি উল্লেখ করতে হবে।

৭. কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা যদি কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবিগণের বক্তব্য থেকে পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের কোনো সহীহ বক্তব্য পাওয়া গেলে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যা উত্তম।

৮. যেসব ক্ষেত্রে চিন্তা গবেষণা করে মতামত প্রদানের অবকাশ আছে, সেসব ক্ষেত্রে অতীতের মুফাসসির এবং মুজতাহিদগণের মতামত উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং দলিল প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে কোনো বিশেষ মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

৯. যেসব ক্ষেত্রে চিন্তা গবেষণা করে মতামত প্রদানের অবকাশ আছে, সেসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইল্ম এবং আমানতদারির সাথে নিজস্ব ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ ধরনের ব্যাখ্যার শর্তাবলী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

১০. সুপ্রমাণিত তথ্য এবং প্রচলিত সমাজ থেকে ব্যাখ্যা হিসেবে উদাহরণ উপমা উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৪. উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি আহ্বান

মুফাসসিরকে অবশ্যি সংশ্লিষ্ট আয়াত বা আয়াতগুলো নাযিলের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আয়াতের ব্যাখ্যা করা শেষ হলে তাকে তার পাঠক বা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে-

১. আয়াতগুলোর মর্মার্থ সার সংক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

২. যে লক্ষ্যে আল্লাহ পাক আয়াতগুলো নাযিল করেছেন, পাঠক বা শ্রোতাদের মনোযোগ সেই লক্ষ্যের উপর কেন্দ্রিভূত করতে হবে।

৩. পাঠক বা শ্রোতাদের সেই লক্ষ্যে ধাবিত হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। হিকমাহ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদের আহবান জানাতে হবে।

৪. অনুসরণ, অনুগমন বা বাস্তবায়নের হিকমত বা কর্মকৌশল (technique) বলে দিতে হবে। অনুসরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. অনুসরণ ও বাস্তবায়ন দ্বারা পার্থিব ও পারলৌকিক কী কী সুফল ও কল্যাণ লাভ করা যাবে, কুরআন হাদিসের আলোকে সংক্ষেপে তা তুলে ধরতে হবে।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ : ৯

কুরআন তফসির-এ সমকালকে ধারণ

কালানুক্রমে তফসির করার পদ্ধতি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার উপাদান এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

তফসিরও মূলত একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি। এটি কুরআন শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি। মানুষের সামনে আল্লাহর কালামের মর্মার্থ ও শিক্ষা সহজ-সুন্দরভাবে তুলে ধরা তফসিরের মূল উদ্দেশ্য।

সকল প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সাথে কুরআন শাস্ত্র এবং তফসির সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে।

প্রাচীন কালে যে পদ্ধতিতে তফসির করা হতো, বর্তমান কালে তার চাইতে অনেক উন্নততর পদ্ধতিতে তফসির করা হয়ে থাকে। বর্তমান কালের উপস্থাপনা পদ্ধতি কালের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

সাধনা গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে আমাদের কাল পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হয়েছে, এতে কুরআনু হাকিমের বাণী ও তত্ত্বসমূহ দিন দিনই উন্মোচিত হয়ে উঠছে, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। কুরআনের রহস্যসমূহ দিনে দিনে মাটির নিচের সোনা, রূপা এবং তেল-ফুয়েল-গ্যাসের মতোই মানুষের চোখের সামনে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

তাই আধুনিক কালে যারা আল কুরআনের তফসির করবেন তাদেরকে অবশ্যি জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য তাদের তফসির-এ সংযোজন করতে হবে এবং করতে হবে সর্বশেষ প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কুরআন মজিদে মাতৃগর্ভে মানব সন্তান জন্মের সূচনা প্রক্রিয়া এবং বেড়ে উঠার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।[১] কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে এতোকাল বিষয়টি ছিলো মানুষের একটি ধারণাগত জ্ঞান। কিন্তু আধুনিক কালে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে মানুষ মাতৃগর্ভে মানব শিশুর জন্মের সূচনা এবং বেড়ে উঠার স্তরগুলো অবলোকন করছে এবং প্রতিটি স্তরের বাস্তবরূপ দেখতে পাচ্ছে। শিশুটি নারী না পুরুষ তাও দেখতে পাচ্ছে। অথচ প্রাচীন মুফাসসিররা 'মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহই জানেন'[২] - আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মাতৃগর্ভের সন্তান নারী না পুরুষ তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' বর্তমান মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলবেন : 'মাতৃগর্ভে ভালো না মন্দ এবং কী চরিত্র ও কী গুণাবলীর সন্তান আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।'

---

১. আল কুরআন, সূরা ২৩ আল মুমিন : আয়াত ১২-১৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৩১ লুকমান, আয়াত ৩৪।

এই আবিষ্কারের ফলে কুরআনের এ ধরনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-

১. দিবালোকের মতো সত্য প্রমাণিত হয়েছে,

২. বুঝা সহজ হয়েছে,

৩. বুঝানো সহজ হয়েছে।

একজন মুফাসসিরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই উন্নতিকে ধারণ করেই কুরআনের তফসির করতে হবে। প্রাচীন মুফাসসিরদের পক্ষে এটা সম্ভব ছিলো।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ○ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

অর্থ: অবশ্যি তোমাদের উপর (নিযুক্ত) আছে পাহারাদার। তারা সম্মানিত লেখক। তোমরা যা করো সবই তারা জানে।[৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ط وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○
اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى ط بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○

অর্থ: আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম তার গলায় বেঁধে রাখি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্যে বের করে আনবো একটি গ্রন্থ- যা তার সম্মুখে উন্মুক্ত করে রাখা হবে। (তাকে বলা হবে :) পড়ো তোমার গ্রন্থ। আজ তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ফায়সালাকারী হিসেবে যথেষ্ট।[৪]

এ বিষয়ে সূরা যিলযালে বলা হয়েছে :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

অর্থ: সুতরাং যে কেউ একটি অণু (atom) পরিমাণ ভালো কাজ করবে, (সেদিন) সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ একটি অণু (atom) পরিমাণ দুষ্কর্ম করবে, সেও (সেদিন) তা দেখতে পাবে।[৫]

এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় প্রাচীন মুফাসসিরগণ যা লিখেছেন, আধুনিক মুফাসসিরগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে আধুনিক লোকদের জন্যে তার চাইতে উন্নততর ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

প্রাচীন মুফাসসিরগণ বলেছেন, মানুষের আমল 'লেখা' হয়। সম্মানিত ফেরেশতাগণ আমল লেখেন। তাদের লেখা থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার গ্রন্থ (আমলনামা) পড়তে বলা হবে। গ্রন্থ তার সামনে খুলে রাখা হবে।

---

৩. আল কুরআন, সূরা ৮২ আল ইনফিতার : আয়াত ১০-১২।

৪. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ১৩-১৪।

৫. আল কুরআন, সূরা ৯৯ যিলযাল : আয়াত ৭-৮।

কুরআনের শব্দাবলী থেকে বাহ্যিকভাবে এ অর্থই বুঝা যায়। কিন্তু যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে এ আয়াতগুলোর উন্নততর রূপক (مجازى) ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। বর্তমানকালে DV, HD ক্যামেরার মাধ্যমে অডিও ভিজুয়াল ছবি উঠানো হয় এবং সে ছবি মেশিনের সাহায্যে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয়।

'সম্মানিত ফেরেশতাগণ আমল লেখেন' এ কথার পরিবর্তে 'সম্মানিত ফেরেশতাগণ মানুষের আমল অডিও ভিজুয়াল রেকর্ড করেন' বলা যেতে পারে। কিয়ামতের দিন এ রেকর্ড পর্দায় উন্মুক্ত করে দেখানো হবে। এতে ছবি বড় (enlarge) করে দেখানো যাবে, যার ফলে অণু (atom) পরিমাণ ভালো বা মন্দ আমলও মানুষ দেখতে পাবে। অথচ মানুষ অণু (atom) দেখতে পায় না।

এ প্রক্রিয়ায় মানুষ তখন তার আমল শুধু চোখেই দেখবে না, নিজের সব কথাবার্তাও কানে শুনবে।

কুরআনে যে বলা হয়েছে : 'পড়ো তোমার গ্রন্থ', মূলত দেখে শুনে অনুধাবন এবং ফায়সালা করার কথাই এখানে বলা হয়েছে। কারণ আধুনিক কালের মানুষ এটা জানে যে, শুধু মুখে উচ্চারণ করার নামই পড়া নয়। কোনো কিছুর 'reading' বা 'পড়া' বলতে দেখা, শুনা, হিসাব করা, ফায়সালা করা, নির্ণয় করা, নির্ধারণ করা, মতামত স্থির করা, মর্ম উদ্ধার করা ইত্যাদি বুঝায়।

কুরআনের উল্লেখিত 'লেখা' 'পড়া' 'গ্রন্থ' ইত্যাদি শব্দগুলোকে যদি হাকিকি অর্থে (শব্দার্থে) ব্যাখ্যা করা হয় তবে আধুনিক যুব সমাজের কাছে আমল 'লেখা' 'পড়া' এবং তার ভিত্তিতে নিজের বিরুদ্ধে নিজে ফায়সালা করার বিষয়টি জটিল এবং সময় সাপেক্ষ মনে হতে পারে।

তাই কুরআন তফসির-এর ক্ষেত্রে সমকালকে ধারণ করা জরুরি। আর সমকালকে ধারণ করার সীমাহীন প্রশস্ততা স্বয়ং কুরআনের মধ্যেই রয়েছে। এ কারণে সকল যুগেই কুরআন সর্বাধুনিক।

এটাও কুরআনের একটি মুজিযা বা অলৌকিকত্ব। কুরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয়, এটা তার এক অকাট্য প্রমাণ।

কুরআনের যারা ব্যাখ্যা বা তফসির করবেন, তফসির-এর মূলনীতি ও শর্তাবলী অক্ষুণ্ন রেখে তাদেরকে অবশ্যি তফসির-এর মধ্যে যুগের উন্নতি ও আবিষ্কারকে যথাস্থানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে, যাতে করে আধুনিক মানুষের পক্ষে কুরআন বুঝা সহজ হয় এবং তারা যেনো কুরআনকে বাস্তব ও কার্যকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ ১০

একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ

আরবি ভাষায় ব্যাপক অর্থবহ বহু শব্দ রয়েছে। একেকটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা যায়। প্রাচীন ও বর্তমান আরবি সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কুরআন মজিদেও একই শব্দকে প্রচলিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মজিদে একটি শব্দকে কোথায় কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, একজন মুফাসসিরকে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখতে হবে। তা না হলে কুরআনের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কোন্ শব্দটি কোন্ আয়াতে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা শানে নুযূল এবং শব্দ ও আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার তাৎপর্য ও মমার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে জানা সহজ। তাছাড়া অনেক স্থানে সাহাবিগণের বর্ণনা থেকেও তা জানা যায়। সাহাবি আবুদ দারদা রা. বলেছেন, 'তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের পূর্ণ সমুঝদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না কুরআনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করতে পারবে।'[১]

কুরআন মজিদে অনেক শব্দই বিভিন্ন অর্থে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জালালুদ্দীন সুয়ূতির 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থের আলোকে কয়েকটি শব্দের বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগের উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করছি :

● اَلْهُدٰى আল হুদা

এ শব্দটি কুরআন মজিদে বিভিন্নরূপ ক্রিয়াপদে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন অর্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে এভাবে :

১. দৃঢ়, প্রতিষ্ঠিত এবং অটল অবিচল রাখা : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

অর্থ: আমাদের 'দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখো' সরল সঠিক পথের উপর।[২]

২. দীন, জীবন ব্যবস্থা, জীবন বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি :

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ط

অর্থ: (একদল আহলে কিতাব নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বলে.....:) 'এবং তোমাদের দীনের অনুসারী ছাড়া কাউকেও বিশ্বাস করো না।' তুমি তাদের বলে দাও : 'আল্লাহ প্রদত্ত দীনই একমাত্র দীন।'[৩]

৩. ঈমান, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা : وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ط

অর্থ: যারা সঠিক পথে চলে, আল্লাহ তাদের 'ঈমান' বৃদ্ধি করে দেন।[৪]

---

১. জালালুদ্দীন সুয়ূতির আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন।

২. আল কুরআন, সূরা ০১ আল ফাতিহা : আয়াত ০৬

৩. আল কুরআন, সূরা ০৩ আলে ইমরান : আয়াত ৭৩।

৪. আল কুরআন, সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ৭৬।

৪. আহ্বান, সতর্ক করা : إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ○

অর্থ: তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র, আর প্রত্যেক কওমের কাছেই পাঠানো হয়েছে একজন সতর্ককারী আহ্বায়ক।[৫]

৫. রসূল ও কিতাব : فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

অর্থ: অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হুদা অর্থাৎ 'রসূল ও কিতাব' আসবে, তখন যারা আমার 'রসূল ও কিতাবের' অনুসরণ করবে, তাদের নেই কোনো ভয়.....।[৬]

৬. গন্তব্যে পৌঁছা :

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

অর্থ: আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করে রেখেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং সৃষ্টি করে দিয়েছেন নদ-নদী ও পথসমূহ যাতে করে তোমরা 'গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে' পারো।[৭]

৭. পথ চিনে নেয়া, জেনে নেয়া : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ○

অর্থ: আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথ চিনে নেয়, পথ জেনে নেয়।[৮]

৮. আল কুরআন :

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ج وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ○

অর্থ: তারা তো অনুমান আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ তাদের প্রভুর নিকট থেকে তাদের কাছে আলহুদা অর্থাৎ 'কুরআন' এসেছে।[৯]

৯. তাওরাত : وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ○

অর্থ: আমি মূসাকে আল হুদা অর্থাৎ 'তাওরাত' দিয়েছিলাম আর বনি ইসরাঈলকে বানিয়েছিলাম সেই কিতাবের উত্তরাধিকারী।[১০]

১০. তাওহীদ : وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا.

অর্থ: তারা বলে : আমরা যদি তোমার সাথে আল হুদার অর্থাৎ 'তাওহীদের' অনুসরণ করি, তবে আমাদের ভূমি থেকে আমাদের উৎখাত করা হবে।[১১]

১১. তরিকা বা পথ-পন্থা অনুসরণ করা :

---

৫. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ০৭।
৬. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৩৮।
৭. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ১৫-১৬।
৮. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ১৬।
৯. আল কুরআন, সূরা ৫৩ আন নাজ্‌ম : আয়াত ২৩।
১০. আল কুরআন, সূরা ৪০ গাফির : আয়াত ৫৩।
১১. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৫৭।

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ○

অর্থ: বরং তারা বলে : আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের একটি তরিকার অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদের 'পথ ও তরিকারই' অনুসরণ করবো।[১২]

১২. সফল করা : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ .

অর্থ: এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্র 'সফল' করেন না।[১৩]

১৩. ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা :

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

অর্থ: (মূসা) বললো : আমার রব তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার (নির্দিষ্ট) আকৃতি দান করেছেন, অতপর 'ইলহামের মাধ্যমে তার (দায়িত্ব ও কর্তব্য তাকে) শিক্ষা দিয়েছেন।'[১৪]

১৪. তাওবা করা, প্রত্যাবর্তন করা :

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ط

অর্থ: আর আমাদের জন্যে নির্ধারণ করো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা তোমার দিকে হুদা অর্থাৎ তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।[১৫]

১৫. পথ দেখানো, পথ প্রদর্শন করা :/

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ○

অর্থ: যখন সে (মূসা) মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করলো, তখন বললো : আশা করি আমার প্রভু আমাকে সোজা 'পথ প্রদর্শন' করবেন।[১৬]

● اَلصَّلٰوةُ আস সালাত

সালাত (صلوة) শব্দটিকে কুরআন মজিদে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে সালাত শব্দের কিছু প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো :

১. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত :

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

অর্থ: যারা গায়েবে ঈমান আনে, 'সালাত কায়েম' করে এবং আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে।[১৭] এখানে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত বুঝানো হয়েছে।

---

১২. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ : আয়াত ২২।
১৩. আল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৫২।
১৪. আল কুরআন, সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ৫০।
১৫. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : ১৫৬।
১৬. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ২২।
১৭. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ০৩।

২. জুমার সালাত :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ .

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! জুমার দিন যখন 'সালাতের জন্যে' আযান দেয়া হয়, তখন আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও।[১৮] এখানে জুমার সালাত বুঝানো হয়েছে।

৩. আসর সালাত : تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ .

অর্থ: তোমাদের সন্দেহ হলে সালাতের পর তাদের অপেক্ষমান রাখবে। তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে.....।[১৯] নাযিলের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এখানে আসর সালাত বুঝানো হয়েছে।

৪. জানাযা : وَلَاتُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط

অর্থ: তাদের (মুনাফিকদের) কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্যে সালাত পড়ো না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়িও না।[২০]

৫. দোয়া : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

অর্থ: আর তুমি তাদের জন্যে সালাত ('দোয়া)' করো। নিশ্চয়ই তোমার সালাত (দোয়া) তাদের জন্যে প্রশান্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।[২১]

৬. কুরআন : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا○

অর্থ: তোমরা সালাতে (কুরআন পাঠে) স্বর বেশি উঁচুও করো না আবার বেশি ক্ষীণও করো না। এ দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।[২২]

৭. দীন, ধর্ম : قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَآ

অর্থ: তারা বললো : হে শুয়াইব! আমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসবের ইবাদত বন্দেগি করতো, তোমার সালাত (ধর্ম) কি আমাদেরকে তাদের ইবাদত বন্দেগি পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়?[২৩]

৮. অনুগ্রহ, ক্ষমা :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ○

অর্থ: আল্লাহ নবীর প্রতি সালাত (অনুগ্রহ) বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারাও তার জন্যে সালাত (অনুগ্রহ ও ক্ষমা) প্রার্থনা করে। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও তার প্রতি সালাত (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করো।[২৪]

---

১৮. আল কুরআন, সূরা ৬২ জুমুয়া : আয়াত ০৯।
১৯. আল কুরআন, সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ১০৬।
২০. আল কুরআন, সূরা ০৯ আত তাওবা : ৮৪।
২১. আল কুরআন, সূরা ০৯ আত তাওবা : ১০৩।
২২. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ১১০।
২৩. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৮৭।
২৪. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ৫৬।

৯. সালাতের স্থান, মসজিদ :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ○

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের (মসজিদের) নিকটবর্তী হয়ো না, যতোক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো...।[২৫]

এখানে সালাতের নিকটবর্তী না হওয়া মানে মসজিদ বা সালাত আদায়ের স্থানের নিকটবর্তী না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

● اَلرَّحْمَةُ রহমত

কুরআন মজিদে রহমত শব্দটিও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

১. ইসলাম : يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ○

অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্যে (ইসলামের জন্যে) বাছাই করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[২৬] এখানে রহমত মানে ইসলাম।

২. ঈমান, নবুয়্যত : اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ .

অর্থ: আমি যদি আমার প্রভুর প্রদত্ত স্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ রহমত (ঈমান এবং নবুয়্যত) দান করে থাকেন.....।[২৭]

৩. নবুয়্যত এবং অন্যান্য দান : اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ○

অর্থ: নাকি তাদের কাছে রয়েছে তোমার প্রভুর রহমতের ভাণ্ডার, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহান দাতা?[২৮]

৪. অনুগ্রহ : وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ○

অর্থ: তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) না থাকতো, তবে তোমরা কেউই রক্ষা পেতে না। অবশ্যি আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়।[২৯]

৫. দয়া অনুকম্পা :

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِّلّٰهِ ط كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط

অর্থ: বলো : আসমান যমিনে যা কিছু আছে সেগুলো কার? বলো : সবই আল্লাহর। রহমত (দয়া ও অনুকম্পা) তাঁর কর্তব্য বলে তিনি স্থির করে রেখেছেন।[৩০]

---

২৫. আল কুরআন, সূরা ০৪ আন নিসা : আয়াত ৪৩।
২৬. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৭৪।
২৭. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ : আয়াত ২৮।
২৮. আল কুরআন, সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ০৯।
২৯. আল কুরআন, সূরা ২৪ আন নূর : আয়াত ১০।
৩০. আল কুরআন, সূরা ০৬ আল আন'আম : আয়াত ১২।

৬. কুরআন : قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

অর্থ: বলো : এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমত (কুরআন)। এতে তারা আনন্দিত হোক। ওরা যা পুঞ্জিভূত করছে, সেগুলোর চাইতে এটা উত্তম।[৩১]

৭. জান্নাত : وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○

অর্থ: আর (সেদিন) যাদের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, তারা থাকবে আল্লাহর রহমতে (জান্নাতে)। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[৩২]

৮. বৃষ্টি : وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ط

অর্থ: তিনিই তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন।[৩৩]

৯. জীবিকা : قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ

অর্থ: বলো : তোমরা যদি আমার প্রভুর রহমতের (জীবিকার) ভাণ্ডারেরও অধিকারী হতে, তবু 'খরচ হয়ে যাবে'-এ আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে।[৩৪]

১০. সাহায্য: قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَبِكُمْ سُوْٓءًا اَوْاَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً

অর্থ: বলো : আল্লাহ যদি তোমাদের ধ্বংস ও অমঙ্গল করতে চান, তবে আল্লাহ থেকে তোমাদের রক্ষা করবে কে? আর তিনি যদি তোমাদের রহমত (সাহায্য) করতে চান, তবে তোমাদের ধ্বংস ও অমঙ্গল করবে কে?[৩৫]

১১. ক্ষমা : اَوْاَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ط

অর্থ: অথবা যদি তিনি (আল্লাহ) আমার প্রতি রহমত (ক্ষমা) করতে চান, তাহলে কি তারা (তোমাদের দেবতারা) সেই রহমত রোধ করতে পারবে?[৩৬]

১২. মহব্বত ও বন্ধুতার সম্পর্ক :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ: আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ এবং তার সাহাবিরা কাফিরদের প্রতি কঠোর নিজেদের পরস্পরের প্রতি রহমদিল।[৩৭]

১৩. মহানুভবতা :

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ○

---

৩১. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ৫৮।
৩২. আল কুরআন, সূরা ০৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৭।
৩৩. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াত ৫৭।
৩৪. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ১০০।
৩৫. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ১৭।
৩৬. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার আয়াত : ৩৮।
৩৭. আল কুরআন, সূরা ৪৮ আল ফাতহ : আয়াত ২৯।

অর্থ: এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি লাঘব এবং রহমত (মহানুভবতা)। কিন্তু এরপর যে সীমালংঘন করবে, তার জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৩৮]

১৪. জ্ঞান : فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا○

অর্থ: তারপর তারা (মূসা এবং তার সাথি) সাক্ষাত পেলো আমার এমন এক বান্দার যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত (জ্ঞান) দান করেছি...।[৩৯]

১৫. আন্তরিক সেবার মনোভাব : وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ○

অর্থ: রহমতের সাথে (আন্তরিক সেবার মনোভাব নিয়ে) তাদের (বৃদ্ধ পিতামাতার) প্রতি নম্রতা ও কোমলতার ডানা অবনমিত করো।[৪০]

১৬. নিয়ামত : فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ○

অর্থ: অতপর উভয় দলের মাঝখানে স্থাপন করে দেয়া হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে। সেটির অভ্যন্তরে থাকবে রহমত (নিয়ামত)।[৪১]

১৭. পুরস্কার : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ

অর্থ: হে (আহলে কিতাবের) বিশ্বাসওয়ালা লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মদ)-এর প্রতি ঈমান আনো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত (পুরস্কার) দেবেন।[৪২]

১৮. সুসময় : وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيٰتِنَا

অর্থ: দু:সময়ের আঘাতের পর আমি যখন মানুষকে রহমত (সুসময়) আস্বাদন করাই, তখনই সে আমার আয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।[৪৩]

১৯. দানশীলতা : وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمَةِ ط

অর্থ: তোমার প্রভু ধনী এবং দানশীলও।[৪৪]

● اَلذِّكْرُ যিকর

যিকর (ذكر) শব্দটিও কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি :

১. আলোচনা করা : فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ ○

৩৮. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৭৮।
৩৯. আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ৬৫।
৪০. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ২৪।
৪১. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ১৩।
৪২. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদিদ : আয়াত ২৮।
৪৩. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস : আয়াত ২১।
৪৪. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আন'আম : ১৩৩।

অর্থ: অতপর তোমরা যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে, তখন এমনভাবে আল্লাহর যিকর (আলোচনা) করো, যেভাবে যিকর (আলোচনা) করে থাকো তোমাদের বাপদাদার (কথা)।[৪৫]

২. ইবাদত :

৩. পুরস্কার : فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ○

অর্থ: তোমরা আমার যিক্‌র (ইবাদত) করো, আমি তোমাদের যিকর করবো (পুরস্কার দেবো) এবং আমার শোকর আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[৪৬]

৪. স্মরণ করা : اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ○

অর্থ: আমি আল্লাহ। কোনো ইলাহ্ নেই আমি ছাড়া। তাই আমারই ইবাদত করো এবং সালাত কায়েম করো আমাকে যিকর (স্মরণ) করার জন্যে।[৪৭]

৫. আল কুরআন : اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ○

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি আয যিক্‌র (আল কুরআন) এবং আমিই এর হিফাযতকারী।[৪৮]

৬. তাওরাত, কিতাব : فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ○

অর্থ: তোমরা যদি না জানো, তবে যিকর ওয়ালাদের (কিতাব, তাওরাত ওয়ালাদের) জিজ্ঞেস করো।[৪৯]

৭. হিফয করা : خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

অর্থ: আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে তা গ্রহণ করো এবং তাতে যা কিছু আছে তা হিফয করে রাখো, যাতে তোমরা সতর্ক হয়ে চলতে পারো।[৫০]

৮. রসূল : قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ○

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যিকর, তাহলো একজন রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে।[৫১]

৯. মনোযোগ দেয়া : وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَايَذْكُرُوْنَ○

অর্থ: তাদের যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তারা তাতে মনোযোগ দেয় না।[৫২]

১০. সালাত: وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

৪৫. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২০০।
৪৬. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ১৫২।
৪৭. আল কুরআন, সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ১৪।
৪৮. আল কুরআন, সূরা ১৫ আল হিজর : আয়াত ০৯।
৪৯. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৪৩।
৫০. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৬৩।
৫১. আল কুরআন, সূরা ৬৫ আত তালাক : আয়াত ১০-১১।
৫২. আল কুরআন, সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ১৩।

অর্থ: সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে। আর আল্লাহর যিকরই (সালাতই) শ্রেষ্ঠ।[৫৩]

১১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত : فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ ○

অর্থ: আর যখন তোমরা নিরাপত্তা অনুভব করবে, তখন আল্লাহর যিকর করবে (সালাতসমূহ আদায় করবে) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।[৫৪]

১২. সালাতুল জুমা : اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ○

অর্থ: জুমার দিন যখন সালাতের জন্যে ডাকা হয় (আযান দেয়া হয়), তখন আল্লাহর যিকর (সালাত)-এর দিকে ধাবিত হও।[৫৫]

১৩. সালাতুল আস্‌র :

اِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ○ فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ج حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ○

অর্থ: যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবনোদ্যত অশ্বরাজি উপস্থিত করানো হলো, তখন সে (সুলাইমান) বললো : আমি তো আমার প্রভুর যিক্‌র (আসরের সালাত) থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে তো সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো![৫৬]

১৪ উপদেশ : وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

অর্থ: এ এক কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটি নাযিল করেছি। তারপরও কি তোমরা এটি অস্বীকার করবে?[৫৭]

১৫. বুঝা, অনুধাবন করা : وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ○

অর্থ: অবশ্যি আমি এ কুরআন যিক্‌র-এর অর্থাৎ বুঝা ও অনুধাবন করার জন্যে সহজ করেছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?[৫৮]

১৬. সংবাদ : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا○

অর্থ: তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো : আমি অচিরেই তার যিক্‌র (সংবাদ) তোমাদের বর্ণনা করবো।[৫৯]

১৭. গুণ প্রশংসা করা : لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا○

অর্থ: যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ গুণ-প্রশংসা করে।[৬০]

---

৫৩. আল কুরআন, সূরা ২৯ আনকাবুত : ৪৫।
৫৪. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২৩৯।
৫৫. আল কুরআন, সূরা ৬২ জুমুয়া : আয়াত ৯।
৫৬. আল কুরআন, সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৩১-৩২।
৫৭. আল কুরআন, সূরা ২১ আল আম্বিয়া : আয়াত ৫০।
৫৮. আল কুরআন, সূরা ৫৪ আল কামার : আয়াত ১৭, ২২, ৩২, ৪০।
৫৯. আল কুরআন, আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ৮৩।
৬০. আল কুরআন, সূরা ৩৩ আহযাব : আয়াত ২১।

১৮. অবহিত করা, জানানো :

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ ○

অর্থ: তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে (ইউসুফ) মনে করলো, তাকে বললো : 'তোমার মনিবকে আমার বিষয়টি যিক্‌র (অবহিত) করো।' কিন্তু শয়তান তার মনিবের কাছে ইউসুফের বিষয়টি যিক্‌র (অবহিত) করতে ভুলিয়ে দেয়।[৬১]

১৯. সম্মান, মর্যাদা : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ○

অর্থ: আর আমি কি তোমার যিকরকে (মর্যাদাকে) উঁচু করিনি?[৬২]

২০. সমালোচনা করা :

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج

অর্থ: কাফিররা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে তারা কেবল বিদ্রুপের পাত্র হিসেবেই গ্রহণ করে এবং বলে : এই কি সে, যে তোমাদের ইলাহ্‌দের (দেব দেবীদের) যিক্‌র (সমালোচনা) করে?[৬৩]

২১. অহি :

২২. বাণী : ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ج

অর্থ: তারা বলে : আমাদের মধ্যে কি শুধু তার উপরই যিকর (অহি) অবতীর্ণ হলো? বরং তারা আমার যিকর (বাণী) সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করছে।[৬৪]

২৩. কিতাব : فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا○

অর্থ: অতপর সেই ফেরেশতাদের শপথ যারা কিতাব বহন করে।[৬৫]

● اَلرُّوْحُ রূহ :

রূহ শব্দটিও কুরআন মজিদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১. নির্দেশ, আদেশ, ফরমান :

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز

অর্থ: মরিয়ম তনয় ঈসা মসিহ তো আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী- যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রক্ষেপ করেছিলেন আর (সে) তাঁর একটি নির্দেশ।[৬৬]

২. অহি : يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ ○

অর্থ: তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশ সম্বলিত রূহ অর্থাৎ অহি নিয়ে ফেরেশতা পাঠান।[৬৭]

---

৬১. আল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ৪২।
৬২. আল কুরআন, সূরা ৯৪ ইনশিরাহ : আয়াত ০৪।
৬৩. আল কুরআন, সূরা ২১ আম্বিয়া : আয়াত ৩৬।
৬৪. আল কুরআন, সূরা ৩৮ সোয়াদ : আয়াত ৮।
৬৫. আল কুরআন, সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ০৩।
৬৬. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭১।
৬৭. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ০২।

৩. কুরআন : وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط

অর্থ: এভাবেই (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমার প্রতি অহি করেছি আমার নির্দেশের একটি রূহ অর্থাৎ কুরআন।[৬৮]

৪. রহমত : اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط

অর্থ: এদের অন্তরে তিনি মজবুত করে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের সাহায্য করেছেন তাঁর রূহ (রহমত) দ্বারা।[৬৯]

৫. জিবরিল ফেরেশতা : فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ○

অর্থ: অতপর আমি তার (মরিয়মের) কাছে পাঠালাম আমার রূহকে (জিবরিলকে)। সে তার নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে।[৭০]

৬. সর্বাপেক্ষা বড় ফেরেশতা : يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ○

অর্থ: সেদিন রূহ (বড় ফেরেশতা) এবং সকল ফেরেশতা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে...।[৭১]

৭. প্রাণ (life) : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ ○

অর্থ: তারা তোমাকে রূহ (প্রাণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো : রূহ বা প্রাণ আমার প্রভুর একটি নির্দেশ।[৭২]

● اَلسُّوْءُ আস্ সূ

سوء শব্দটিও কুরআন মজিদে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১. কঠিন, নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক : وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ○

অর্থ: স্মরণ করো, আমি যখন ফেরাউনি সম্প্রদায় থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম- যারা তোমাদের নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক শাস্তি দিচ্ছিল।[৭৩]

২. খারাপ, মন্দ, নিকৃষ্ট : اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

অর্থ: তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে আরো রয়েছে নিকৃষ্ট এবং মন্দ আবাস।[৭৪]

৩. অপরাধ, পাপ : اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ○

অর্থ:আল্লাহ তাদের তওবাই কবুল করবেন যারা ভুলবশত পাপ করে ফেলে....।[৭৫]

---

৬৮. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশ শুরা : আয়াত ৫২।
৬৯. আল কুরআন, সূরা ৫৮ মুজাদালা : আয়াত ২২।
৭০. আল কুরআন, সূরা ১৯ মরিয়ম : আয়াত ১৭।
৭১. আল কুরআন, সূরা ৭৮ আন নাবা : আয়াত ৩৮।
৭২. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা : আয়াত ৮৫।
৭৩. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ৪৯।
৭৪. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রা'দ : আয়াত ২৫।
৭৫. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ১৭।

৪. ব্যভিচার, কুকর্ম : قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا ○

অর্থ: সে (অযীযের স্ত্রী) বললো : যে তোমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করার এরাদা করেছে তার কী শাস্তি হতে পারে....।[৭৬]

৫. শিরক :

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط

অর্থ: ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের উপর যুলুম (শিরক) করতে থাকা অবস্থায়, পরে তারা বলবে : আমরা তো 'আমলে সূ' (শিরক) করতাম না।[৭৭]

৬. হত্যা করা :

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ ○

অর্থ: এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন, এটিকে আল্লাহর যমিনে চরে খেতে দাও এবং এটিকে স্পর্শ করো না হত্যার উদ্দেশ্যে।[৭৮]

৭. চরম যন্ত্রণা : قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○

অর্থ: যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল, সেদিন তারা বলবে : আজ লাঞ্ছনা আর চরম যন্ত্রণা (misery, extreeme pain) কাফিরদের জন্যে।[৭৯]

৮. শ্বেত রোগ : وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى○

অর্থ: আর তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, সেটি বেরিয়ে আসবে উজ্জ্বল হয়ে কোনো প্রকার ক্ষতি বা শ্বেতরোগ ছাড়াই।[৮০]

এভাবে কুরআন মজিদে আরো বহু শব্দ রয়েছে যেগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং পূর্বাপর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে আরেকটি শব্দের অর্থ নির্দেশিকা পেশ করা হলো। শব্দটি হলো :

● تِلَاوَةٌ তিলাওয়াত

এ শব্দটিও কুরআন মজিদে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

১. পাঠ করা : وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

অর্থ: অথচ তারা কিতাব পাঠ করে।[৮১]

২. বর্ণনা করা : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ

---

৭৬. আল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ : আয়াত ২৫।
৭৭. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ২৮।
৭৮. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ : আয়াতাংশ ৭৩।
৭৯. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ২৭।
৮০. আল কুরআন, সূরা ২০ তোয়াহা : আয়াত ২২।
৮১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা : আয়াত ১১৩।

অর্থ: তাদের কাছে ইবরাহিমের সংবাদ বর্ণনা করো।[৮২]

৩. বহন করা : فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا

অর্থ: শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা অহি বহন করে।[৮৩]

৪. পেছনে আসা :

৫. অনুসরণ করা :

৬. আলো গ্রহণ করা : وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ○ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ○

অর্থ: সূর্যের শপথ আর তার আলোর এবং চাঁদের শপথ যখন সে তিলাওয়াত করে সূর্যকে।[৮৪] এখানে চাঁদ সূর্যকে তিলাওয়াত করে মানে- চাঁদ সূর্যের পেছনে আসে, অনুসরণ করে এবং সূর্যের আলো গ্রহণ করে।

৭. নাযিল করা : تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ ○

অর্থ: এগুলো আল্লাহর আয়াত আমি নাযিল করছি তোমার প্রতি।[৮৫]

৮. অধ্যয়ন করা :

৯. শিক্ষা দেয়া :

১০. মেনে চলা : اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ .....○

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহর কিতাব এবং কায়েম করে সালাত।[৮৬] এখানে তিলাওয়াত করে মানে-অধ্যয়ন করে, মেনে চলে, শিক্ষা দেয়।

১১. আবৃত্তি করে শুনানো : وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ○

অর্থ: তোমার প্রভুর যে কিতাব তোমার প্রতি অহি করা হয়েছে তা (মানুষকে) আবৃত্তি করে শুনাও।[৮৭]

১২. উপলব্ধি করা, বুঝা এবং বুঝিয়ে দেয়া : وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

অর্থ: যখন তাদের আল্লাহর আয়াত বুঝিয়ে দেয়া হয়, তখন তা (আল্লাহর আয়াত) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয়।[৮৮]

১৩. বলা, জানানো : اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ○

অর্থ: তোমাদের জন্যে পশু হালাল করে দেয়া হয়েছে, তবে যেগুলোর কথা আগেই তিলাওয়াত করা (বলা) হয়েছে সেগুলো ছাড়া।[৮৯]

---

৮২. আল কুরআন, সূরা ২৬ শোয়ারা : আয়াত ৬৯।
৮৩. আল কুরআন, সূরা ৩৭ আস সাফফাত : আয়াত ০৩।
৮৪. আল কুরআন, সূরা ৯১ আশ শামস : আয়াত ১-২।
৮৫. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ১০৮।
৮৬. আল কুরআন, সূরা ৩৫ ফাতির : আয়াত ২৯।
৮৭. আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ : আয়াত ২৭।
৮৮. আল কুরআন, সূরা ৮ আনফাল : আয়াত ০২।
৮৯. আল কুরআন, সূরা ২২ হজ্জ : আয়াত ৩০।

অনুচ্ছেদ : ১১

শানে নুযূল

কুরআনুল করিম বুঝার ও তফসির করার ক্ষেত্রে শানে নুযূল জানা জরুরি। কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশ যে প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে সে প্রেক্ষিতটাকেই বলা হয় 'শানে নুযূল'।[১]

কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনো আয়াত নাযিল হয়ে থাকলে, সে ঘটনাটা সে আয়াত বা আয়াতসমূহের শানে নুযূল। রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট কেউ কোনো শরয়ী ব্যাপার জানার জন্য প্রশ্ন করলে, তার প্রেক্ষিতে যে আয়াত নাযিল হয়েছে ঐ প্রশ্নটাই সে আাতের শানে নুযূল। নাযিলের উপলক্ষটাই শানে নুযূল।[২]

কেউ কেউ শানে নুযূল জানার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। কিন্তু তাদের এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রখ্যাত মুফাসসির আল ওয়াহেদী বলেছেন : আয়াতের শানে নুযূল ও ঘটনা জানা না থাকলে আয়াতের তফসির জানা সম্ভব নয়। ইবনে দাকিকুল ঈদ বলেছেন : কুরআনের মর্ম উপলব্ধির জন্য শানে নুযূলের বর্ণনা একটা শক্তিশালী পন্থা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : শানে নুযূল জানা কুরআন উপলব্ধির প্রমাণ। এ উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা বুঝা গেলো কুরআনের তাৎপর্য, মর্ম ও ব্যাখ্যা উপলব্ধির জন্য শানে নুযূল জানা জরুরি।[৩]

সাহাবায়ে কিরাম রা. শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে 'নুযিলাত ফী কাযা' (এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে) বলতেন। তারা এরূপ পরিভাষা যে উপলক্ষে রসূল সা.-এর সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, কেবল সে জন্যেই ব্যবহার করতেন না। বরং সে যুগে এ আয়াত দ্বারা যা কিছু বুঝানো হয়েছে, সেসব কিছুর জন্যেই তারা এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করতেন। আয়াতের হুকুম যে যে ব্যাপারে প্রযোজ্য সেসব ক্ষেত্রেই তারা এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করতেন।

কখনো এমন হতো যে, রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কিংবা তাঁর পবিত্র জীবনকালে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেছে এবং যে ব্যাপারে তিনি কুরআনের কোনো আয়াত থেকে কোনো হুকুম বের করে সঙ্গে সঙ্গে আয়াতটি পড়ে শুনালেন। সাহাবাগণ এরূপ ক্ষেত্রেও সে পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। সে আয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তাঁরা বলতেন 'নুযিলাত ফী কাযা' কিংবা 'ফাআনযালাল্লাহু তায়ালা কওলুহু' (তক্ষুণি আল্লাহ

১. শাহ ওলি উল্লাহ দেহলবি : আল ফাওযুল কবির।
২. মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি : আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন।
৩. মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি : আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন।

তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন।) অথবা 'ফানাযালাত' (অতএব অবতীর্ণ হলো) প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করতেন।

রসূল সা.-এর কোনো আয়াত থেকে কোনো হুকুম বের করা কিংবা কোনো ব্যাপারে তাঁর খেয়াল কোনো আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আল্লাহর ইঙ্গিতেই হতো। আর আল্লাহ তায়ালার ইংগিতও তো এক প্রকার অহি। তাই সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক এসব পরিভাষা ব্যবহার করা সর্বদিক থেকেই যথাযথ হয়েছে।[৪]

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি দেখুন :

وَلَاتَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ -

অর্থ: তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। আর নি:সন্দেহে একজন মু'মিন দাসী একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, যদিও সে মুশরিক নারী তোমাদের আকৃষ্ট করে।[৫]

এ আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট হলো, জাহেলি যুগে ইনাক নামের এক নারীর সাথে মারসাদ ইবন আবু আরসাদ রা.-এর সম্পর্ক ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর মারসাদ রা. মদিনায় চলে গেলেন। আর সে নারী মক্কাতেই রয়ে গেলো। এক সময় তিনি কোনো প্রয়োজনে মক্কায় আসলেন। তখন ইনাক তাঁকে পাপকর্মের আহ্বান জানায়। মারসাদ রা. তাকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ইসলাম আমার এবং তোমার মাঝে অন্তরায়। কিন্তু তুমি চাইলে রসূলে করিম সা.-এর অনুমতিক্রমে তোমাকে আমি বিবাহ করতে পারি।' মদিনায় পৌঁছে মারসাদ রা. রসূল সা.-এর নিকট বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এ প্রসংগে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুশরিক নারীর সাথে মুমিনের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

এ ঘটনাটিই উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল বা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট।

আরেকটি আয়াত দেখুন। তাতে বলা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى ○

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।[৬]

শানে নুযূল যদি সামনে না থাকে, তাহলে স্বাভাকিভাবেই প্রশ্ন হবে, কুরআনু করিমের সুস্পষ্ট নির্দেশেই যখন মদ্যপান হারাম, তখন একথা বলার কী অর্থ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না? এ প্রশ্নের জবাব শুধু শানে নুযূলের মাঝেই পাওয়া যাবে। এ আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে একদা আবদুর রহমান ইবন

৪. শাহ ওলি উল্লাহ দেহলবি : আল ফাওযুল কবির।
৫. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : আয়াত ২২১
৬. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা : আয়াত ৪৩।

আউফ রা. কিছু সাহাবায়ে কিরামকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে মদ্যপানের অবস্থায় নামাযের সময় হলো। একজন সাহাবি ইমাম হলেন। নেশাগ্রস্ততার কারণে ভুল তিলাওয়াত করলেন। এ প্রসংগে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

আশা করি এ বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, কুরআন তফসির করার জন্যে এবং কুরআন বুঝার জন্যে শানে নুযূল জানা অতীব জরুরি।

আল্লামা যারকশি রহ. বলেন, শানে নুযূল দ্বারা জ্ঞানার্জনের প্রথম লাভ হচ্ছে যে, এর দ্বারা আহকামের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং এ সম্পর্কেও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এ হুকুমটা কোন্ প্রেক্ষাপটে কেন নাযিল করেছেন? [৭]

এখানে আমরা শানে নুযূলের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো একটি উদাহরণ পেশ করছি। যেমন কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ○

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই, যখন তারা ভবিষ্যতের জন্য সংযত রয়েছে এবং ঈমান এনেছে।[৮]

এ আয়াতের কেবল শব্দানুবাদ দ্বারা মনে হয় মুসলমানদের জন্যে কোনো পানাহারই হারাম নয়। যদি অন্তরে বিশ্বাস থাকে, আল্লাহর ভয় থাকে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাহলে মানুষ যা চায় তাই পানাহার করতে পারবে। আর যেহেতু এ আয়াতটি মধ্যপান হারাম হওয়ার আয়াতের পরপরই এসেছে, তাই একথা বলারও অবকাশ থাকে যে, এ আয়াতে ঈমানদার আল্লাহ ভীরু ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য মদ্যপানের অনুমতিও রয়েছে। এ শুধু সম্ভাবনার কথা নয়, বরং কোনো কোনো সাহাবা পর্যন্ত এমন অর্থ বুঝেছিলেন এবং উমর রা.-এর সামনে এই আয়াতের দলিল দিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, এ ধরনের লোকদের উপর মধ্যপানের শরয়ী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে না। পরবর্তীতে ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের শানে নুযূলের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের ভুল ধারণা নিরসন করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো, যখন মদ ও জুয়া হারাম হবার আয়াত নাযিল হলো, তখন কোনো কোনো সাহাবা জানতে চাইলেন, যারা এই নিষিদ্ধতার আগে মদে ও জুয়ায় লিপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পরিণাম কী হবে? এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে যে, যারা হারাম হওয়ার পূর্বে মদ-জুয়ায় লিপ্ত ছিলো তারা যদি মু'মিন হয়ে থাকে, আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে থাকে, তাহলে তারা শাস্তিযোগ্য নয়।

❖❖❖

৭ বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি : আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ১ম খণ্ড।

৮. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৯৩।

অনুচ্ছেদ : ১২

মুহকাম ও মুতাশাবেহ আয়াত

কুরআন মজিদে দু'ধরনের আয়াত রয়েছে। মুহকাম ও মুতাশাবেহ। একজন মুফাসসিরের নিকট এ দু'ধরনের আয়াতের পরিচয় পরিষ্কার থাকা দরকার। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط

অর্থ: তিনিই আল্লাহ যিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মুহকাম আয়াত। আর এগুলোই হলো, কিতাবের মূল বুনিয়াদ। আরেক প্রকার হলো মুতাশাবিহাত।[১]

১. মুহকাম আয়াত

আভিধানিক অর্থে মুহকাম অর্থ মজবুত, অটুট, পাকা পোক্ত বা সুদৃঢ় জিনিস।

কুরআনের পরিভাষায় আয়াতে মুহকামাত সেসব আয়াতকে বুঝায়, যেগুলোর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অর্থ গ্রহণে ও নির্ধারণে কোনো প্রকার অসুবিধা থাকে না। এগুলোর অর্থের মধ্যে নেই সন্দেহের কোনো অবকাশ। এগুলোর শব্দার্থ ও ভাব সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশমান। এগুলোর অর্থ গ্রহণে কেউ কোনো প্রকার কলাকৌশল অবলম্বনের সুযোগ পেতে পারে না।'[২]

শাহ অলি উল্লাহ দেহলবি বলেন : মুহকাম আয়াত বলতে সেসব আয়াতকে বুঝায়, যেগুলোর অর্থ বুঝতে আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট সেগুলোর পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট একই অর্থ ব্যতিরেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ হয় না।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আয়াতে মুহকামাত সম্পর্কে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'হুন্না উম্মুল কিতাব - এ আয়াতগুলোই কিতাবের মূল বুনিয়াদ।' অর্থাৎ কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে, সে উদ্দেশ্য এ আয়াতগুলোই পূর্ণ করে দেয়। এসব আয়াতেই গোটা দুনিয়াবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এসব আয়াতেই শিক্ষা ও উপদেশাবলি প্রদান করা হয়েছে। এগুলোতেই গোমরাহির প্রতিবাদ ও সিরাতে মুস্তাকিমের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আয়াতেই আকায়েদ, ইবাদত, আখলাক, ফারায়েয এবং আদেশ নিষেধের বিধিমালা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্য সন্ধানী হবেন এবং সত্যসমূহ জানার জন্যে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইবেন এবং কোন্ পথে চলবেন আর কোন্ পথে চলবেন না, আয়াতে মুহকামাতই তার

---

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ০৭।

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টীকা ৫।

৩. শাহ অলি উল্লাহ দেহলবি : আল ফাউযুল কবির।

জ্ঞান তৃষ্ণা পূর্ণ করে দেবে। আর এ ধরনের লোকদের দৃষ্টি স্বভাবতই মুহকাম আয়াতসমূহের উপরই নিবদ্ধ হবে এবং এসব আয়াত থেকেই লাভবান হবার জন্যে তিনি তার সমস্ত চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করবেন।[৪]

২. মুতাশাবেহ আয়াত

সেসব আয়াতকে মুতাশাবেহ আয়াত বলা হয়, যেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।[৫] আর বিভিন্ন কারণে এসব আয়াতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কখনো দ্ব্যর্থবোধক অর্থ প্রকাশের কারণে, কখনো এমন শব্দ ব্যবহারের কারণে, যা আগে পরের দু'টো বাক্যের সাথেই সংযুক্ত হবার অবকাশ থাকে, অথবা মানুষের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়সমূহ বুঝানোর জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণে।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআন মজিদে মুহকাম আয়াত সমূহের সাথে মুতাশাবেহ আয়াতসমূহও নাযিল করেছেন। তিনিই এ আয়াতগুলোর নাম মুতাশাবেহাত (সঠিক অর্থ নির্ণয়ে সন্দেহের অবকাশ যুক্ত) রেখেছেন।[৬] সুতরাং যে ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহই এ আয়াতসমূহে সন্দেহের অবকাশ রেখে দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যাখ্যা ও গবেষণা করার চেষ্টা করা কেবল গোমরাহির দিকে অগ্রসর হবার পথই খুলে দেয়। মুতাশাবেহ আয়াতের বিধান হলো, আল্লাহর কালাম হিসেবে এগুলোর প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে, মুহকাম আয়াতসমূহই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ○

অর্থ: যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই মুতাশাবেহাত-এর পিছনে লেগে থাকে এবং এর অর্থ (তাবিল) বের করার চেষ্টা করে। অথচ এসব আয়াতের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।[৭]

৩. মুতাশাবেহ আয়াত কোন্‌গুলো?

মুতাশাবেহ আয়াত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসংগে বর্ণিত মতামতসমূহ নিম্নরূপ :

১. মুহকাম হলো সেসব আয়াত যেগুলোর অর্থ স্বত:ই প্রকাশিত, অথবা ব্যাখ্যার

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টীকা ৫।
৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, টীকা ৬।
৬. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৭।
৭. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান : আয়াত ৭।

মাধ্যমে উদ্দিষ্ট মর্ম পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যায়। এগুলো মূলত দীন ও শরিয়া সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। মুতাশাবেহ হলো সেসব আয়াত যেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তায়ালা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন এবং তিনি ছাড়া কেউই সেগুলোর প্রকৃত অর্থ জানে না। কোনো প্রকার ব্যাখ্যার মাধ্যমেই সেগুলোর সঠিক মর্ম প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মূলত সেগুলো হলো :

এক : কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবার কাল সংক্রান্ত আয়াতসমূহ।

দুই : বিভিন্ন সূরার সূচনায় ব্যবহৃত হারূফে মুকাত্তায়াত এবং

তিন : আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত কোনো কোনো আয়াত।

২. মুহকাম হলো সেসব আয়াত যেগুলোর একটিই মাত্র ব্যাখ্যা হয়ে থাকে, অন্য কোনো অর্থ বা ব্যাখ্যা হয় না। আর মুতাশাবেহ হলো সেসব আয়াত যেগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বক্তব্য।

৩. মুহাকাম হলো সেসব আয়াত, যেগুলোর যুক্তিসংগত ও অকাট্য ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। আর মুতাশাবেহ হলো সেসব আয়াত যেগুলোর কোনো যুক্তি সংগত ও অকাট্য ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না।

৪. নাসিখ আয়াতসমূহ হলো মুহকাম আয়াত। এর মধ্যে রয়েছে হালাল হারাম, হুদুদ, ফারায়েয এবং ঈমান ও আমল সংক্রান্ত আয়াতসমূহ। আর মুতাশাবেহ হলো মনসুখ আয়াতসমূহ। এর মধ্যে রয়েছে মিসাল ও কসমের আয়াতসমূহ। আর সেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট না হবার কারণে সেগুলোর উপর আমল ওয়াজিব নয়। এটা হলো ইবনে আব্বাস রা.-এর মত।

৫. হালাল হারাম-এর বর্ণনা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ মুহকাম আর বাকিগুলো মুতাশাবেহ। এ বক্তব্য মুজাহিদ-এর।

৬. যেসব আয়াত মনুসখ হয়নি, সেগুলো মুহকাম। যেসব আয়াত মনুসুখ হয়েছে সেগুলো মুতাশাবেহ। এ মত দাহ্হাক-এর।

এ ছয়টি মতামতের মধ্যে উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ প্রথম মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। এ মতের উপরই ইজমা হয়েছে। তাই প্রথমটিই মুহকাম ও মুতাশাবেহ আয়াতের সঠিক পরিচয়। বাকি মতগুলো যারা দিয়েছেন, সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত মত। এর চাইতে বেশি কোনো গুরুত্ব সেগুলোর নেই।

৪. কতিপয় মুতাশাবেহ আয়াত

কিয়ামত সংক্রান্ত মুতাশাবেহ আয়াতের উদাহরণ :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۝ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝

অর্থ: তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে কিয়ামত সম্পর্কে, কখন অনুষ্ঠিত হবে তা?

এ বিষয়ে আলোচনার কী অবস্থানে আছো তুমি? এর চূড়ান্ত জ্ঞান কেবল তোমার প্রভুর নিকট।[৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিয়ামতের সময় আলোচনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

হারূফে মুকাত্তায়াতের উদাহরণ : الم الرا طه يس كهيعص ص طسم

এই রকম বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর সঠিক অর্থ মানুষ জানে না। তাই এগুলোর ব্যাখ্যা অর্থহীন।

আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত মুতাশাবেহ আয়াত :

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○

অর্থ: রহমান সমাসীন আরশের উপর।[৯]

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط

অর্থ: তাঁর মুখ মণ্ডল ছাড়া প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে।[১০]

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ○

অর্থ: এবং বাকি থাকবে কেবল তোমার অতিশয় সম্মানিত মর্যাদাবান প্রভুর মুখমণ্ডল।[১১]

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا ○

অর্থ: (হে নূহ!) তুমি তৈরি করো নৌকা আমার চোখের সামনে।[১২]

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ط

অর্থ: কিয়াতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে আর আসমানগুলো থাকবে ভাজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।[১৩]

وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ○

অর্থ: এবং যখন উপস্থিত হবেন তোমার প্রভু আর সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতারাও।[১৪]

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج

অর্থ: আল্লাহর হাত ছিলো তাদের হাতের উপর।[১৫]

এসব আয়াতে বর্ণিত আরশের উপর আল্লাহর সমাসীন হওয়া, আল্লাহর মুখমণ্ডল, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহর হাত ইত্যাদির সঠিক ব্যখ্যা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এগুলো মুতাশাবেহ আয়াত।

❖❖❖

---

৮. আল কুরআন, সূরা ৭৯ আন নাযি'আত : আয়াত ৪২-৪৪।
৯. আল কুরআন, সূরা ১০ তোয়াহা : আয়াত ৫।
১০. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস : আয়াত ৮৮।
১১. আল কুরআন, সূরা ৫৫ আর রাহমান : আয়াত ২৭।
১২. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ : আয়াত ৩৭।
১৩. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার : আয়াত ৬৭।
১৪. আল কুরআন, সূরা ৮৯ আল ফাজর : আয়াত ২২।
১৫. আল কুরআন, সূরা ৪৮ আল ফাত্হ : আয়াত ১০।

অনুচ্ছেদ : ১৩

তফসির-এর প্রকারভেদ

১. বিভিন্ন প্রকারের তফসির

যাঁরা কুরআন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ তাঁদের অনেকেই ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কুরআনের তফসিরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন :

১. তাফসির বির রেওয়ায়াত। এ ধরনের তফসিরকে 'তাফসির বিল মাছুর' এবং 'নকলি তফসির'ও বলা হয়। কুরআন সুন্নাহ এবং সাহাবিগণের ব্যাখ্যা দ্বারা যে তফসির করা হয়, সেগুলোকেই বলা হয় তফসির বির রেওয়ায়াত।[১]

২. তাফসির বির রায়। এ ধরনের তফসিরকে আকলি তফসিরও বলা হয়। ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে যেসব তফসির করা হয় সেগুলোকে 'তাফসির বির রায়' বা 'আকলি তফসির' বলা হয়।

৩. তাফসির বিদ্‌দিরায়াত। রেওয়ায়াত ও রায় বা নকল ও আকলের (প্রথম ও দ্বিতীয়টির) সমন্বয়ে যে তফসির করা হয়, সেসব তফসিরকে বলা হয় 'তাফসির বিদ্ দিরায়াত।'

৪. তাফসিরে ইশারি বা সুফিবাদি তফসির। এটা হলো তরিকতপন্থি সুফিদের তফসির। তারা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, যা তারা ইলহাম বা মুজাহাদার মাধ্যমে উলব্ধি করেন বলে দাবি করেন।[২]

৫. তাফসিরুল আহকম। কোনো কোনো মুফাসসির কুরআনের বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলোর আলাদা তফসির করেছেন। বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলোর পৃথক তফসিরকেই 'তাফসিরুল আহকাম' বলা হয়।

অনেকেই আবার তফসিরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ

১. তাফসির বিল মা'ছুর বা তাফসির বির রেওয়ায়াত।

২. তাফসির বির রায়।

অন্যান্য প্রকারের তফসিরগুলোকে তাঁরা এই দুই ভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

২. তাফসির বির রেওয়ায়াত

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এই প্রকারের তফসির-এর জন্যে তিনটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হলো :

১. তাফসির বির রেওয়ায়াত।

২. তাফসির বিল মা'ছুর।

৩. তাফসির বিন নাক্‌ল।

---

১. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি : আত তিরয়ানু ফী উলূমিল কুরআন।

২. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি : আত তিরয়ানু ফী উলূমিল কুরআন।

এই প্রকার তফসির-এর ভিত্তি বা উৎস হলো চারটি। সেগুলো হলো :

১. আল কুরআন। অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের তফসির।

২. রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ (বা হাদিস)। অর্থাৎ সুন্নাহ্‌র সাহায্যে তফসির।

৩. সাহাবিগণের বাণী বা ব্যাখ্যা।

৪. তাবেয়ীগণের বাণী বা ব্যাখ্যা।

তাবেয়ীগণের বাণী ও ব্যাখ্যা তাফসির বির রেওয়ায়াতের ভিত্তি বা উৎস কিনা সে বিষয়ে কিছুটা মতভেদ হয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এর পক্ষে এবং অল্প কিছু বিশেষজ্ঞ এর বিপক্ষে মত দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, তাবেয়ীগণ সাহাবিগণের সূত্রে যেসব ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন সেগুলোই তফসির বির রেওয়ায়াতের ভিত্তি। আর তাঁদের ব্যক্তিগত মতামতসমূহ তাফসির বির রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

তফসির বির রেওয়াতের ক্ষেত্রেও অনেক দুর্বল তফসির রয়েছে। এমনকি অগ্রহণযোগ্য তফসিরও রয়েছে। সেগুলো হলো, যেগুলোতে-

১. ইসরায়িলিয়াতের ভিত্তিতে তফসির করা হয়েছে।

২. মওজু ও মসনু হাদিসের ভিত্তিতে তফসির করা হয়েছে।

৩. সাহাবি ও তাবেয়ীগণের সূত্রবিহীন অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলে রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে লিখিত তফসির গ্রন্থাবলি তিন ভাগে বিভক্ত :

১. সহীহ (অর্থাৎ রেওয়ায়াতি দুর্বলতা নেই বা থাকলেও খুবই কম)।

২. গায়রে সহীহ (সহীহ রেওয়াতের পরিমাণ কম)।

৩. সহীহ ও গায়রে সহীহ বর্ণনা মিশ্রিত তফসির।

রেওয়ায়াত ভিত্তিক অধিকতর সহীহ তফসির কোন্‌গুলো? এ প্রসংগে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন : কুরআনও সুন্নাহ্‌র অধিকতর নিকটবর্তী তফসির হলো,

১. তাফসিরে তাবারি।

২. তাফসিরে ইবনে আতিয়া।

৩. তাফসিরে ইবনে কাসির।[৩]

রেওয়ায়াত ভিত্তিক অনেক তফসির লেখা হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটি বিখ্যাত তফসির-এর নাম উল্লেখ করছি :

১. জামেউল বয়ান ফী তাফসিরিল কুরআন, সংক্ষেপে বলা হয় 'তাফসিরে তাবারি'। লিখেছেন মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারি (মৃত্যু ৩১০ হি.)।

২. বাহরুল উলূম। তিন খণ্ডের এ তফসিরটি লিখেছেন নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দি (মৃত্যু : ৩৭৩ হি.)। এটিকে তফসিরে সমরকন্দিও বলা হয়।

৩. আল কাশফু ওয়াল বয়ান। চার খণ্ডের এই তফসিরটি লিখেছেন আহমদ সা'লাবি নিশাপুরি (মৃত্যু : ৪২৭ হি.)। এটি তফসিরে সা'লাবি নামে খ্যাত।

---

৩. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া : মুকাদ্দামাতুন ফী উসূলিত তাফসির।

৪. আন নোকাত ওয়াল উয়ূন। 'তাফসিরে মাওয়ারদি' হিসেবে খ্যাত। ছয় খণ্ডে এই তফসিরটি লিখেছেন আবুল হাসান আলী আল মাওয়ারদি (মৃত্যু : ৪৫০ হি.)।

৫. আল বয়ান ফী তাবিলাতিল কুরআন। তফসিরে কুরতবি নামে খ্যাত। এটি লিখেছেন হাফেয আবু উমর ইউসুফ আল কুরতবি (মৃত্যু ৪৬৩ হি.)।

৬. মুয়ালিমুত তানযিল। তাফসিরে বগবি নামে খ্যাত। লিখেছেন আল হুসাইন ইবনে মাসুদ বগবি (মৃত্যু ৫১০ হি.)।

৭. আল মুহাররিরুল আযীয ফী তাফসিরিল কিতাবিল আযিম। এটি 'তাফসিরে ইবনে আতিয়া' হিসেবে খ্যাত। দশ খণ্ডের এই বিশাল তফসিরটি লিখেছেন 'ইবনে আতিয়া' নামে পরিচিত আবদুল হক উন্দুলুসি (মৃত্যু ৫৪৬ হি.)।

৮. তাফসিরুল কুরআনিল আযিম। 'তাফসিরে ইবনে কাসির' নামে খ্যাত। এটি লিখেছেন ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে উমর দামেস্কি (মৃত্যু ৭৭৪ হি.)।

৯. জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসিরিল কুরআন। তাফসিরে জাওয়াহের নামে পরিচিতি। লিখেছেন আবদুর রহমান আস্ সা'লাবি (মৃত্যু ৮৭৬ হি.)।

১০. আদ দুররুল মানসূর ফী তাফসিরিল মা'ছুর। এটি লিখছেন 'আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন' প্রণেতা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (মৃত্যু ৯১১ হিজরি)।

৩. তাফসির বির রায়

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এ ধরনের তফসির দুটি পরিভাষা দ্বারা পরিচিত :

১. তফসির বির রায়।

২. তফসির বিল আকল।

এ ধরনের তফসির করা হয় চিন্তা গবেষণা এবং ইজতিহাদ ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে। এ ধরনের তফসির তিন ভাগে বিভক্ত :

১. সহীহ : এ ক্ষেত্রে সহীহ হলো সে তফসির যা মুফাসসির নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করেন না এবং অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি নিয়েও করেন না। বরং তিনি আরবি ভাষাজ্ঞান, আরবদের বাকরীতি, সম্বোধন পদ্ধতি, ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, বালাগাত, উসূলে ফিকহ, শানে নুযূল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে তফসির করেন। তিনি পরিপূর্ণ ঈমানদারি ও তাকওয়ার সাথে কালামুল্লার উপলব্ধির জন্যে তফসির করেন। সুন্নাহ এবং সাহাবাগণের বাণী থেকে কুরআনের কোনো আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত না থাকা অবস্থায় এরূপ ব্যাখ্যা জায়েয বরং প্রশংসনীয়।[৪]

২. বাতিল : বাতিল ও ভ্রান্ত তফসির বির রায় হচ্ছে সেসব তফসির যা মুফাসসির অজ্ঞতা ও খেয়াল খুশি অনুযায়ী এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করে

৪. বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি : আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন।

থাকে। তার ভ্রান্ত দর্শনের দলিল ও বিদআতের প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে। রসূলে করিম সা. এরূপ মুফাসসিরদের জন্যে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিংবা ভাষা, ব্যাকরণ ও শরিয়তের জ্ঞানহীন অবস্থায় যেসব তফসির করা হয়ে থাকে।[৫] সেগুলোও এ প্রকারের অন্তরভুক্ত।

রসূল সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করলো সে যেনো জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।" তিনি আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেনো জাহান্নামে থাকার জায়গা বানিয়ে নেয়।[৬]

৩. সহীহ ও বাতিলের সংমিশ্রণ : যারা রায় বা আকল দ্বারা তফসির করেন, তাদের তফসির যেমন সহীহও হয়ে থাকে, বাতিলও হয়ে থাকে; তেমনি সহীহ বাতিলের মিশ্রণ যুক্তও হয়ে থাকে। এধরনের তফসিরও রয়েছে অনেক।

তাফসির বির রায়-এর অধিকাংশ তফসিরই তাফসির বিদ দিরায়াতের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রায় ভিত্তিক কয়েকটি তফসির-এর নাম উল্লেখ করা হলো :

১. তাফসিরে খাযিন : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খাযিন (মৃত্যু ৭৪১ হি.)।
২. ফাতহুল কাদির : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মাকদাসি (মৃতু ৭২৮ হি.)।
৩. তাফসিরে বায়দাবি : আবদুল্লাহ ইবনে উমর বায়দাবি (মৃত্যু ৬৮৫ হি.)।
৪. তাফসিরুন নসফি : আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নসফি (মৃত্যু ৭০১ হি.)।
৫. গারায়িবুল কুরআন বা তাফসিরে নিশাপুরি : নিযামুদ্দিন নিশাপুরি (মৃ.৭২৮ হি.)।
৬. তাফসিরে ইসফাহানি : মাহমুদ ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু ৭৪৯ হি.)।
৭. আল বাহরুল মুহিত বা তাফসিরে ইবনে হাইয়্যান : মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে হাইয়্যান (মৃত্যু ৭৪৫ হি.)।
৮. তাফসিরে জালালাইন : জালালুদ্দিন সুয়ূতি (মৃত্যু ৯১১ হি.) এবং জালালুদ্দিন মাহেল্লি (মৃত্যু ৮৬৪ হি.)।
৯. তাফসিরে আবিস সউদ : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাবি (মৃত্যু ৯৫২ হি.)।
১০. সিরাজুম মুনির : মুহাম্মদ শারবিনি আল খতিব (মৃত্যু ৯৭৭ হি.)।

৪. তাফসির বিদ্ দিরায়াত

কেউ কেউ মনে করেন, তাফসির বির রায় এবং তাফসির বিদ দিরায়াত একই প্রকার তফসিরের দুটি নাম। প্রকৃতপক্ষে এগুলো দু'প্রকারের তফসির। কুরআন মজিদ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাফসির বিদ দিরায়াত অধিকতর সহায়ক। তাফসির বিদ দিরায়াতের ভিত্তি ও উৎস হলো :

১. কুরআন।

---

৫. মুহাম্মদ আলী আস্ সাবুনি : আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন
৬. সূত্র : জালালুদ্দিন সুয়ূতি : আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন।

২. সুন্নাহ।
৩. সাহাবিগণের ব্যাখ্যা ও অভিমত।
৪. তাবেয়ীগণের ব্যাখ্যা ও অভিমত।
৫. আরবি ভাষারীতি।
৬. ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত (গবেষণা ও উদ্ভাবন)।

কুরআন তফসির-এর এই সবগুলো ভিত্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে তফসির করা হয়, তাকেই বলা হয় তফসির বিদ দিরায়াত। মূলত এগুলো হলো নকল ও আকল বা রেওয়াত ও রায়ের সমন্বিত তফসির। তফসির বিদ্ দিরায়াতের আরো বৈশিষ্ট্য হলো :

১. কুরআনের ব্যাখ্যায় কুরআনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথার্থতা যাচাই করে প্রয়োগ। অর্থাৎ যথাস্থানে যথা প্রয়োগ। অবতীর্ণের কাল ভিত্তিক প্রয়োগ।

২. কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাহ তথা হাদিস প্রয়োগের ক্ষেত্রে সনদ যাচাই বাছাই করে এবং একাধিক বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকলে তাতে সামঞ্জস্য বিধান (তাতবিক) করে প্রয়োগ।

৩. কুরআনের ব্যাখ্যায় সুন্নাহ বা হাদিস প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের যৌক্তিকতা যাচাই করে যথার্থ প্রয়োগ।

৪. সাহাবিগণ ও তাবেয়ীগণের অভিমত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একাধিক মত বা মতভেদ পাওয়া গেলে সবগুলো যুক্তি সংগত মতের উল্লেখ।

৫. আরবি ভাষারীতির ক্ষেত্রে অতীতে কেউ ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তা খণ্ডন করে সঠিক অর্থ প্রয়োগ।

৬. ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইজতিহাদি ব্যাখ্যায় নিজের মতকে অকাট্য এবং একমাত্র সঠিক মত হিসেবে উপস্থাপন না করা।

৭. জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বশেষ উন্নতি (latest development) সমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাস্থানে কুরআনের ব্যাখ্যা, বাস্তবতা ও সত্যতা প্রমাণে প্রয়োগ করা।

তাফসির বিদ দিরায়াতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো :

১. 'মাফাতিহুল গায়েব' বা তাফসিরে কবির : এ তফসিরটি রচনা করেছেন ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে যিয়াউদ্দিন উমর আর রাযি মৃত্যু (৬০৬ হি.)। ইনি ইমাম রাযি নামে বেশি প্রসিদ্ধ। তাঁর এ গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে মুদ্রিত। এটি আরবি ভাষায় লেখা। তবে অনেকে তফসিরটিতে চিন্তাগত ত্রুটি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

২. 'ইরশাদুল আক্‌লুস সালিম ইলা মাযায়াল কুরআন।' তাফসিরে আবিস সউদ নামে অধিক পরিচিতি। এটি লিখেছেন কাজী আবুস সউদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ মুস্তফা আত তাহাবি (মৃত্যু ৯৫২ হি.)। এটি মূল আরবি ভাষায় লেখা।

৩. রূহুল মুআনি ফী তাফসিরিল কুরআনিল আযিম। 'রূহুল মুআনি' নামেই অধিক পরিচিত। এটি লিখেছেন আল্লামা শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলূসি (মৃত্যু ১২৭০ হি.)। মূল আরবি ভাষায়।

৪. আল মানার। এটি লিখেছেন শাইখ রশিদ রেজা। এটি মূলত শাইখ মুহাম্মদ আবদুহুর তফসির হিসেবেই পরিচিত। কারণ শিক্ষক মুহাম্মদ আবদুহুর (১৮৭৯-১৯০৫ খৃ.) নির্দেশনার আলোকেই রশিদ রেজা তফসিরটি লিখেছেন। মূল আরবি ভাষায় লিখিত।

৫. ফী যিলালিল কুরআন। এটি লিখেছেন শহীদ সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.)। মূল আরবি ভাষায়। এটি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছে।

৬. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.)। মূল উর্দু ভাষায়। আধুনিক কালে এটি খুবই জনপ্রিয় তফসির।

৭. তাফসিরে মারাগি। এটি লিখেছেন শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা মারাগি (১৮৮১-১৯৪৫ খৃ.)। মূল আরবি ভাষায়।

৮. মা'আরিফুল কুরআন। এটি লিখেছেন মুফতি মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-১৩৯৬ হিজরি)। মূল উর্দূ ভাষায়।

৯. তাদাববুরে কুরআন। এটি লিখেছেন মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী। এটি মূলে উর্দূ ভাষায় লিখিত।

১০. সাফাওয়াতুত তাফাসির। এটি লিখেছেন মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি। প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ খৃ. ৩ খণ্ডে। আরবি ভাষায় লিখিত।

এগুলো দিরায়াত ভিত্তিক প্রাচীন ও আধুনিককালে লেখা কতিপয় মৌলিক তফসির। এছাড়াও এ ধরনের তফসির অনেক আছে।

৫. তাফসিরে ইশারি

আমরা আগেই বলেছি, তাফসিরে ইশারি হলো সুফিবাদী তফসির। সুফিরা কুরআনের স্পষ্ট অর্থ এড়িয়ে গিয়ে মুজাহাদার মাধ্যমে অন্তরে উদ্ভূত ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেসব তফসির লিখেছেন, সেগুলোই তাফসিরে ইশারি। তারা দাবি করেন ইলহাম ও আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ অন্তরদৃষ্টি দ্বারা তারা কুরআনের রহস্য উন্মোচন করেন।[৭]

তবে এধরনের তফসির গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই এধরনের তফসিরকে তফসির হিসেবে গ্রহণ করতেই অস্বীকার করেন। অবশ্য সুফিরা এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

এখানে কয়েকটি সুফিবাদী তফসির-এর নাম উল্লেখ করা হলো :

---

৭. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি : আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন।

১. তাফসিরে তসতরি : সহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরি।
২. হাকায়েকুত তাফসির : আবু আবদুর রহমান আস সুলামি।
৩. তাফসিরে নিশাপুরি : আহমদ ইবনে ইবরাহিম নিশাপুরি।
৪. তাফসিরে ইবনুল আরবি : মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবি।
৫. রূহুল মু'আনি/তাফসিরে আলুসি : শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ আলূসি।

৬. তাফসিরুল আহকাম

কুরআনের বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলোর যারা আলাদা তফসির করেছেন, তাদের তফসিরকেই 'তাফসিরুল আহকাম' বলা হয়। তবে এ ধরনের প্রায় সব তফসিরই মাযহাব কেন্দ্রিক লেখা হয়েছে।

নিম্নে কয়েকটি 'তাফসিরুল আহকাম'-এর নাম উল্লেখ করা হলো :

১. আহকামুল কুরআন/তাফসিরে জাস্‌সাস, আহমদ ইবনে আলী আল জাস্‌সাস, হানাফি মাযহাব, মৃত্য ৩৮০ হিজরি।
২. আহকামুল কুরআন, আলী ইবনে মুহাম্মদ তাবারি, শাফেয়ি মাযহাব, মৃত্য ৫০৪ হিজরি।
৩. আল ইকলিলু ফী ইস্তেম্বাতিত তানযিল, জালালুদ্দিন সুয়ূতি, শাফেয়ি মাযহাব, মৃত্য ৯১০ হিজরি।
৪. আহকামুল কুরআন/তাফসিরে ইবনুল আরবি, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ উন্দুলুসি, মালেকি মাযহাব, মৃত্য ৫৪১ হিজরি।
৫. জামেউল আহকাম/তাফসিরে কুরতবি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবি, মালেকি মাযহাব, মৃত্য ৬৭১ হিজরি।
৬. কানযুল ইরফান/তাফসিরে সুয়ূরি, মেকদাদ ইবনে আবদুল্লাহ সুয়ুরি, শিয়া মাযহাব, মৃত্য ৯ম হিজরি।
৭. তাফসিরে যায়েদি, ইউসুফ ইবনে আহমদ, যায়েদি মাযহাব, মৃত্য ৮৩২ হিজরি।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ : ১৪

কুরআনের অনুবাদ

১. অনারবি ভাষায় কুরআন অনুবাদের গুরুত্ব

একজন আরবকে রসূল নিযুক্ত করে আল্লাহ তায়ালা আরবি ভাষায় আল কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতা ও পাঠক আরবরা হলেও গোটা বিশ্ববাসীর জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদ নাযিল করেছেন। সুতরাং সব ভাষাভাষী মানুষেরই কুরআন বুঝা জরুরি। কিন্তু সব ভাষাভাষী সব মানুষের পক্ষে আরবি ভাষা শিখা বাস্তব সম্মত নয়। অবশ্য যারা কুরআনের-

১. শিক্ষক,

২. মুফাসসির ও

৩. গবেষক,

তাদেরকে আরবি ভাষা শিখতে হবে এবং আরবি ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই কুরআনের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। অন্য সকলের পক্ষে আরবি ভাষা শিক্ষা বাস্তব সম্মত নয়। সে জন্যে প্রচলিত সকল ভাষায়ই কুরআন মজিদের অনুবাদ ও তফসির হওয়া জরুরি। তা না হলে সাধারণভাবে বিশ্ববাসীর পক্ষে কুরআন বুঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। অথচ কুরআন বুঝা সব মানুষের জন্যেই জরুরি এবং কুরআনের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যেই অত্যাবশ্যক। আল্লাহর বাণী হিসেবে কুরআনের ব্যাপারে যৌক্তিকতার দাবি হলো :

১. সব মানুষেরই আল্লাহর বাণী ও বক্তব্য পড়া এবং জানা উচিত।

২. সবাইর পড়া এবং জানার জন্যে আল্লাহর বাণী আল কুরআনের সব ভাষায় অনুবাদ ও তফসির হওয়া উচিত।

২. অনুবাদের প্রকারভেদ

একটি ভাষা থেকে কোনো কিছু অপর ভাষায় অনুবাদ করতে হলে সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে অনুবাদ করা যায়। যে কোনো অনারবি ভাষায় কুরআন মজিদের অনুবাদও সেই দুটি পদ্ধতিতেই হতে পারে। পদ্ধতিগুলো হলো :

১. ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের ভিত্তিতে শাব্দিক অনুবাদ।

২. কুরআনের প্রকৃত মর্মার্থ ও ভাবধারা প্রকাশ করে ভাবানুবাদ।

মুফাসসির ও কুরআন বিশেষজ্ঞগণ ভাবানুবাদকেই কুরআন অনুবাদের জন্যে সঠিক মনে করেন। শাব্দিক অনুবাদ গ্রহণযোগ্য হবার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। খ্যাতনামা মুফাসসির আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বিখ্যাত তফসির তাফহীমুল কুরআনের সূচনাতে নিজের অনুসৃত অনুবাদ পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন :

"শাব্দিক অনুবাদের লাভ হলো, পাঠক কুরআনের প্রতিটি শব্দের মানে জানতে পারে। প্রতিটি আয়াতের নিচে তার অনুবাদ পড়ে তার মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে তা জানতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির এই লাভজনক দিকের সাথে সাথে এর মধ্যে এমন কিছু অভাব থেকে যায়, যার ফলে একজন আরবি অনভিজ্ঞ পাঠক কুরআন মজিদ থেকে ভালোভাবে উপকৃত হতে পারেন না।

১. শাব্দিক অনুবাদ পড়তে গিয়ে সর্বপ্রথম রচনার গতিশীলতা, বর্ণনার শক্তি, ভাষার অলংকারিত্ব ও বক্তব্যের প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়। কুরআনের প্রতিটি ছত্রের নিচে শাব্দিক অনুবাদের আকারে পাঠক এমন একটি নিষ্প্রাণ রচনার সাথে পরিচিত হয়, যা পড়ার পর তার প্রাণ নেচে ওঠে না, গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় না, চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হয় না এবং তার আবেগের সমুদ্রে তরংগও সৃষ্টি হয় না। কতকগুলো নিষ্প্রাণ বাক্য পড়ার পর সে মোটেও অনুভব করে না যে, কোনো বস্তু তার বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিকে জয় করে হৃদয় ও মনের গভীরে নেমে যাচ্ছে। এ ধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা, বরং অনুবাদ পড়ার সময় অনেক সময় মানুষ ভাবতে থাকে, এটি কি সেই গ্রন্থ যার একটি বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করার জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল? এর কারণ, শাব্দিক অনুবাদ সব সময় নিরস হয়। এর মাধ্যমে মূল বিষয়ের রসাস্বাদন কোনোক্রমেই সম্ভব হয় না। কুরআনের মূল রচনার প্রতিটি বাক্য যে গভীর সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ, অনুবাদে তার সামান্যতম অংশও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অথচ কুরআনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তার পবিত্র ও নিষ্কলুষ শিক্ষা এবং তার উন্নত বিষয়বস্তুর অবদান যতটুকু, তার সাহিত্যিক অবদানও সে তুলনায় মোটেই কম নয়। কুরআনের এ বস্তুটিই তো পাষাণ হৃদয়ের মানুষের দিলও মোমের মতো নরম করে দেয়। এটিই বজ্রপাতের মতো আরবের সমগ্র ভূখন্ডকে কাঁপিয়ে তোলে। এর চরম শত্রুরাও এর প্রভাব বিস্তারের যাদুকরি ক্ষমতার স্বীকৃতি দিতো। তারা এর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। কারণ তারা মনে করতো, যে ব্যক্তি একবার এই যাদুকরি বাণী শুনবে সে এই বাণীর কাছে তার হৃদয়-মন বিক্রি করে বসবে। কুরআনের মধ্যে যদি এই সাহিত্যিক অলংকার না থাকতো এবং অনুবাদের ভাষার মতো নিরস ও অলংকারহীন ভাষায় তা নাযিল হতো, তাহলে কুরআনের পরশে আরববাসীদের হৃদয় কোনো দিন উত্তপ্ত হতো না, কোনো দিন তাদের দিল বিগলিত হতো না।

২. শাব্দিক অনুবাদ প্রভাবহীন হবার আর একটি কারণ হলো, সাধারণত এই অনুবাদ মূলের প্রতিটি লাইনের নিচে বসানো হয়। অথবা নতুন স্টাইল অনুযায়ী পাতাকে মাঝখান থেকে ডানে বামে দুভাগে ভাগ করে একদিকে আল্লাহর কালাম এবং অন্যদিকে তার অনুবাদ বসানো হয়। শাব্দিক অনুবাদ পড়ার ও শেখার জন্য এ ব্যবস্থা তো ভালই। কিন্তু অন্যান্য বই একনাগাড়ে পড়ে মানুষ যেমন প্রভাবিত

হয় এখানে তেমনটি হওয়া সম্ভবপর হয় না। কারণ এখানে ধারাবাহিকভাবে একটি বক্তব্য পড়ার সুযোগ নেই। বার বার মাঝখানে অন্য একটি অপরিচিত ভাষা এসে যাচ্ছে। কাজেই অনুবাদের বক্তব্য বার বার হোঁচট খেয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি অনুবাদগুলোয় এর চাইতেও বেশি প্রভাবহীনতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কারণ সেখানে বাইবেলের অনুকরণে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের অনুবাদ নম্বর ভিত্তিক করা হয়েছে। আপনি কোনো একটি চমৎকার প্রবন্ধের প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা করে লিখুন। তারপর উপরে নিচে তার গায়ে নম্বর লাগিয়ে পড়ুন। আপনি নিজেই অনুভব করবেন, সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে লিখিত রচনাটি যেভাবে আপনাকে প্রভাবিত করতো, এই পৃথক পৃথক বাক্যগুলোর জন্য তার অর্ধেক প্রভাবও আপনার উপর পড়েনি।

৩. শাব্দিক অনুবাদের প্রভাবহীন হবার তৃতীয় একটি বড় কারণ হলো, কুরআন একটি রচনার আকারে নয়, বরং ভাষণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই ভাষান্তরিত করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে যদি রচনার ভাষায় রূপান্তরিত না করা হয় এবং যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রেখে শাব্দিক অনুবাদ করা হয়, তবে বক্তব্যগুলো অসংলগ্ন এবং পারস্পরিক সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে।

৪. সবাই জানেন, কুরআন মজিদ শুরুতে লিখিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বরং ইসলামি দাওয়াত প্রসংগে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি ভাষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হতো এবং তিনি ভাষণ আকারে তা লোকদের শুনিয়ে দিতেন। প্রবন্ধের ভাষা ও বক্তৃতার ভাষার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অনেক পার্থক্য থাকে। যেমন প্রবন্ধ লেখার সময় পাঠক সরাসরি সামনে থাকে না। তাই সেখানে কোনো সংশয়ের উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়। কিন্তু বক্তৃতার সময় শ্রোতা তথা সংশয়ী নিজেই সামনে হাযির থাকে। তাই সেখানে সাধারণত এভাবে বলার প্রয়োজন হয় না যে, "লোকেরা একথা বলে থাকে।" বরং বক্তা তার বক্তৃতার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে এমন একটি কথা বলে যায় যা সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধের বেলায় বক্তব্যের বাইরে কিন্তু তার সাথে নিকট সম্পর্ক রাখে এমন কোনো কথা বলতে হলে তাকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে কোনো না কোনোভাবে প্রবন্ধে মূল বক্তব্য থেকে আলাদা করে লিখতে হয় যাতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না হয়। অন্যদিকে বক্তৃতার মধ্যে শুধুমাত্র বক্তৃতার ধরণ ও ভংগি পরিবর্তন করে একজন বক্তা বিরাট বিরাট প্রাসংগিক বক্তব্য বলে যেতে পারেন। শ্রোতারা এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও সম্পর্কহীনতা খুঁজে পাবে না। প্রবন্ধে পরিবেশের সাথে বক্তব্যের সম্পর্ক জোড়ার জন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বক্তৃতায় পরিবেশ নিজেই বক্তব্যের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়। সেখানে পরিবেশের দিকে ইংগিত না করেই যেসব কথা বলা হয় তাদের মধ্যে কোনো শূন্যতা অনুভূত হয়

না। বক্তৃতায় বক্তা ও শ্রোতার বারবার পরিবর্তন হয়। বক্তা নিজের শক্তিশালী বক্তব্যের মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো একটি দলের উল্লেখ করে তৃতীয় পুরুষ হিসেবে। কখনো তাকে মধ্যম পুরুষ হিসেবে উপস্থাপিত করে সরাসরি সম্বোধন করে। কখনো বক্তব্য পেশ করে এক বচনে আবার কখনো বহু বচন ব্যবহার করতে থাকে। কখনো বক্তা নিজেই সরাসরি বলতে থাকে, আবার কখনো অন্যের পক্ষ থেকে বলতে থাকে। কখনো সে উচ্চতর ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার কখনো সেই উচ্চতর ক্ষমতা নিজেই তার মুখ দিয়ে বলতে থাকে। এ জিনিসটি বক্তৃতায় একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রবন্ধে এসে এটি সম্পূর্ণ একটি বেখাপ্পা বস্তুতে পরিণত হয়। এ কারণে কোনো বক্তৃতাকে প্রবন্ধ আকারে লিখলে পড়ার সময় তার মধ্যে বেশ সম্পর্কহীনতা অনুভূত হতে থাকে। মূল বক্তৃতার পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে পাঠকের দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে এই সম্পর্কহীনতার অনুভূতিও ততই বাড়তে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কুরআন মজিদের যে অসংলগ্নতার অভিযোগ করে তার ভিত্তিও এখানেই। সেখানে ব্যাখ্যামূলক টীকার মাধ্যমে বক্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ কুরআনের আসল বাক্যের মধ্যে কোনো প্রকার কমবেশি করা হারাম। কিন্তু অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের অর্থ প্রকাশ করার সময় বক্তৃতার ভাষাকে সতর্কতার সাথে প্রবন্ধের ভাষায় রূপান্তরিত করে অতি সহজে এই অসংলগ্নতা দূর করা যেতে পারে।

৫. কুরআন মজিদের সূরাগুলো আসলে ছিলো ভাষণ আকারে। ইসলামি দাওয়াতের বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ সময়ে প্রতিটি সূরা নাযিল হয়েছিল। প্রতিটি সূরা নাযিলের একটি প্রেক্ষাপট ছিলো। কিছু বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের বক্তব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তখন এগুলো নাযিল হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপট ও নাযিলের উপলক্ষের সাথে কুরআনের সূরাগুলো এত গভীর সম্পর্কযুক্ত যে, সেগুলো থেকে আলাদা হয়ে নিছক শাব্দিক অনুবাদ কারোর সামনে রাখা হলে অনেক কথা সে একেবারেই বুঝতে পারবে না। আবার অনেক কথার উল্টো অর্থ বুঝবে। কুরআনের পূর্ণ বক্তব্য সম্ভবত কোথাও তার আয়ত্তাধীন হবে না। আরবি কুরআনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দূর করার জন্য তফসিরের সাহায্য নিতে হয়। কারণ মূল কুরআনের কোনো কিছু বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। কিন্তু অন্য ভাষায় কুরআনের ভাব প্রকাশ করার সময় আমরা আল্লাহর কালামকে তার প্রেক্ষাপট ও নাযিলের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করতে পারি। এভাবে পাঠক তার পরিপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

৬. কুরআন সহজ সরল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হলেও সেখানে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রচলিত শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন

অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শাব্দিক অনুবাদ করার সময় তার মধ্যে এই পারিভাষিক ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ভাবধারা ফুটিয়ে না তোলা হলে অনেক সময় পাঠকরা বিভিন্ন সংকট ও ভুল ধারণার সম্মুখীন হন। যেমন কুরআনে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হচ্ছে 'কুফর'। কুরআনে এ শব্দটি যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মূল আরবি অভিধানে এবং আমাদের ফকীহ ও ন্যায় শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় ব্যবহৃত অর্থের সাথে তার কোনো মিল নেই। আবার কুরআনেও সর্বত্র এটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এর অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানবিহীন অবস্থা। কোথাও এর অর্থ নিছক অস্বীকার। কোথাও একে অকৃতজ্ঞতা ও উপকার ভুলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও ঈমানের বিভিন্ন দাবির মধ্য থেকে কোনো দাবি পূরণ না করাকে কুফরি বলা হয়েছে। কোথাও আকিদাগত স্বীকৃতি কিন্তু কর্মগত অস্বীকৃতি বা নাফরমানি অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোথাও বাহ্যিক আনুগত্য কিন্তু প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসকে কুফরি বলা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা 'কুফরি' শব্দের অর্থ 'কুফরি' লিখে যেতে থাকি বা এর কোনো একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে থাকি তাহলে নি:সন্দেহে অনুবাদ সঠিক হবে। কিন্তু পাঠকগণ কোথাও এর সঠিক অর্থ থেকে বঞ্চিত থাকবেন, কোথাও তারা ভুল ধারণার শিকার হবেন, আবার কোথাও সন্দেহ-সংশয়ের সাগরে হাবুডুবু খাবেন।

শাব্দিক অনুবাদের পদ্ধতিতে এই ত্রুটি ও অভাবগুলো দূর করার জন্য আমি মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশের পথ বেছে নিয়েছি। কুরআনের শব্দাবলিকে ভাষান্তরিত করার পরিবর্তে কুরআনের একটি বাক্য পড়ার পর তার যে অর্থ আমার মনে বাসা বেঁধেছে এবং মনের উপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। লেখ্য ভাষায় স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরেছি। আল্লাহর কালামের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে তার রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য এবং ভাব প্রকাশের প্রচণ্ড শক্তিকে যথাসম্ভব উপস্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই ধরনের মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য শব্দের শৃংখলে বন্দী না থেকে মূল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশের দু:সাহসিক প্রচেষ্টা চালানোই ছিল অপরিহার্য। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর কালামের ব্যাপার, সেজন্য আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে এপথে পা বাড়িয়েছি। আমার পক্ষ থেকে যতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব তা করেছি। কুরআন তার বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যতটুকু স্বাধীনতা দেয় তার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি।"[১]

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : তাফহীমুল কুরআন, তরজমা ও তফসির পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রাসংগিক কথা।

শাব্দিক ও ভাবানুবাদের বিষয়ে এর চাইতে চমৎকার বক্তব্য আর দেখা যায়নি। অনুবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে এগুলোই সর্বোত্তম কথা। ভাবানুবাদই যে উত্তম ও যথার্থ সে কথাও তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়েছে। তবে ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে তিনি নিজের যে ভয় ও সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছেন, সকল অনুবাদকের জন্যেই তা গুরুত্বপূর্ণ।

৩. অনুবাদের শর্ত

কুরআন মজিদ অনুবাদ করার জন্যে অনুবাদককে অবশ্যি দুটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। সেগুলো হলো :

১. একজন অনুবাদককে অবশ্যই মূল কুরআনের ভাষা (অর্থাৎ আরবি) এবং অনুবাদের ভাষা-এ দু' ভাষায় পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাকে এ দু' ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ হতে হবে। অনুবাদের ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও বাকরীতি সম্পর্কে তাকে অভিজ্ঞ হতে হবে।

২. অনুবাদে আল কুরআনের বক্তব্য বিষয় পূর্ণ প্রকাশিত হবে। আল্লাহর প্রতিটি বাণীর তাৎপর্য, মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য অনুবাদের ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে রূপান্তরিত হতে হবে। একজন আরব বা আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি আল কুরআন তিলাওয়াতের প্রাক্কালে কুরআনের যে মর্মার্থ তাঁর অনুভূতিতে জেগে ওঠে, অনুবাদের ভাষায়ও কুরআনের সে মর্মার্থ অনুভূত হতে হবে।

এ জন্যে উম্মতের অধিকাংশ আলেমের মতে কুরআনের শাব্দিক তরজমা না জায়েয।[২] কারণ, তাতে মর্মার্থ এভাবে প্রকাশ পায় না।

৪. অনুবাদ কুরআন নয়

আল কুরআনের তরজমা বা অনুবাদ 'কুরআন' নয়। অনুবাদ হচ্ছে কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্যের প্রকাশ। অনুবাদকে কুরআন বলা যাবে না। আল কুরআন হচ্ছে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ আল্লাহর অনুপম ও শাশ্বত বাণী। এর বিকল্প নেই।[৩]

কুরআনের অনুবাদকে কুরআন নয়, বলতে হবে : 'কুরআনের অনুবাদ।'

২. মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি : আত তিব্‌য়ানু ফী উলূমিল কুরআন।
৩. মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি : আত তিব্‌য়ানু ফী উলূমিল কুরআন।

অনুচ্ছেদ : ১৫

তফসির শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণী

১. সাহাবায়ে কিরাম

সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে নিয়ে সর্বযুগেই কুরআনের শিক্ষক ও মুফাসসির হিসেবে একদল লোক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠেন। তাঁদের মাধ্যমেই কুরআনি জ্ঞানের অনির্বাণ স্রোতস্বিনী অনন্তকালের দিকে বয়ে চলছে নিরবধি।

সকল যুগেই মুসলিম বিশ্বে কুরআন বিশেষজ্ঞদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো এবং থাকবে। সকল যুগেই বিরাট সংখ্যক মুফাসসিরে কুরআন মৌখিকভাবে কুরআন শিক্ষাদানে নিরত ছিলেন। সকল যুগেই বিশেষজ্ঞগণ কুরআনের তফসির লিখেও গিয়েছেন। এ ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

এভাবে সকল যুগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিরাট সংখ্যক আলিমকে কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শিতা দান করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা কুরআনের বিশেষজ্ঞ, মুফাসসির ও তফসির সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন :

১. আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু (প্রথম খলিফা)।
২. উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু (দ্বিতীয় খলিফা)।
৩. উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু (তৃতীয় খলিফা)।
৪. আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু (চতুর্থ খলিফা)।
৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৭. উবাই ইবনে কায়াব রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৮. যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু।
৯. আবু মূসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১০. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এ ক'জন ছাড়াও আরো বেশকিছু সংখ্যক সাহাবি থেকে কম বেশি তফসির সংক্রান্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

১১. আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১২. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

২. শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী মুফাসসিরগণ

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণের পর তাবেয়ীগণের মধ্যে কুরআন তফসিরের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর উসূলুত তাফসিরের মুকাদ্দমায় লিখেছেন: তাবেয়ীদের মধ্যে সর্বাধিক তফসির জানতেন মক্কাবাসীরা। কেননা তাঁরা সরাসরি ইবনে আব্বাস রা. থেকে তফসির শিখেছেন। এদের মধ্যে মশহুর ছিলেন :

১. মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৩ হিজরি।
২. আতা ইবনে আবি রিবাহ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৪ হিজরি।
৩. ইকরামা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
৪. তাউস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৬ হিজরি।
৫. আবুশ্ শা'শা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯৩ হিজরি।
৬. সায়িদ ইবনে জুবায়ের রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯৫ হিজরি।

কুফাবাসী তাবেয়ীগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে তফসির শিখেছেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন :

৭. আলকামা ইবনে কায়েস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৬ হিজরি।
৮. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৫ হিজরি।
৯. ইবরাহিম নখয়ী রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৫ হিজরি।
১০. আমির আশ শা'বি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
১১. মাসরূক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৬৩ হিজরি।
১২. মুররাতুল হামাদানি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৭৬ হিজরি।
১৩. হাসান বসরি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১০ হিজরি।

এছাড়া মদিনা এবং অন্যান্য স্থানের খ্যাতিমান তাবেয়ী মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন :

১৪. যায়িদ ইবনে আসলাম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৬ হিজরি।
১৫. আবদুর রহমান ইবনে যায়িদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৮২ হিজরি।
১৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৯ হিজরি।
১৭. দাহ্হাক বিন মুযাহিম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১০৫ হিজরি।
১৮. কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।
১৯. আতা ইবনে আবু সালামা খুরাসানি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৫ হিজরি।
২০. মুহাম্মদ ইবনে কায়াব রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।
২১. আবুল আলিয়া রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৯০ হিজরি।
২২. আতিয়াতুল আওফি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১১ হিজরি।
২৩. আবু মালিক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু

২৪. রবি ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৩৯ হিজরি।
২৫. মালিক ইবনে আনাস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৭৯ হিজরি।
২৬. আস সুদ্দি আল কবির রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১২৭ হিজরি।

৩. শ্রেষ্ঠ তাবে তাবেয়ী মুফাসসিরগণ

তবে তাবেয়ী মুফাসসিরগণের অধিকাংশই তফসির লিখে গেছেন। তাঁদের তফসির মূলত তাবেয়ী এবং সাহাবিগণের বর্ণনার সংকলন। তাঁদের মধ্য থেকে খ্যাতিমান মুফাসসিরগণের নাম উল্লেখ করা গেলো :

১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৮ হিজরি।
২. ওকী' ইবনুল জাররাহ্ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৯৭ হিজরি।
৩. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১৬০ হিজরি।
৪. ইয়াযিদ ইবনে হারূণ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ১১৭ হিজরি।
৫. আবদুর রাযযাক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২১১ হিজরি।
৬. আদম ইবনে আবু ইয়াস রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২২০ হিজরি।
৭. ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৩৭ হিজরি।
৮. রূহ ইবনে উবাদা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৮৫ হিজরি।
৯. আব্দ ইবনে হুমায়েদ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৪৯ হিজরি।
১০. আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৩৫ হিজরি।
১১. মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
১২. ইবনে আবি হাতিম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩২৭ হিজরি।
১৩. ইবনে মাজাহ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ২৭৫ হিজরি।
১৪. হাকিম রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৪০৫ হিজরি।
১৫. ইবনে মারদুইয়া রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৪১০ হিজরি।
১৬. ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৫৪ হিজরি।
১৭. আবু ইসহাক রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩১০ হিজরি।
১৮. আবু আলী আল ফারেসি রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৭৭ হিজরি।
১৯. আবু বকর আন নাক্কাশ রাহেমাহুল্লাহ, মৃত্যু ৩৫১ হিজরি।

সাহাবি, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে এঁরা ছিলেন মশহুর তফসির বিশারদ। এখানে নাম উল্লেখ হয়নি এরকমও অনেকে ছিলেন। তবে এঁরা ছিলেন খ্যাতিমান। পরবকর্তীকালে জন্ম হয়েছে আরো অসংখ্য মুফাসসিরের। এখানে কেবল মুতাকাদ্দিমিন (প্রাচীন) মুফাসসিরগণের নামই উল্লেখ করা হলো।[১]

---

১. সাহাবি, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী মুফাসসিরগণের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে রাগিব আত তাবাখের আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া গ্রন্থের সূত্রে।

৪. তাফসিরুল কুরআনের ক্রমবিকাশ ধারা

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা কুরআনের কোনো তফসির গ্রন্থ লিখে যাননি। এ ধরনের রেওয়াজও তখন চালু ছিল না। তবে কোনো কোনো সাহাবি বিচ্ছিন্নভাবে কুরআনের মর্যাদা ও কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

তাবেয়ীগণের অবস্থাও ছিলো প্রায় সাহাবিগণের মতোই। তাঁরা মৌখিকভাবেই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ কুরআন এবং কুরআনের তফসির সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত (হাদিস) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাছাড়া, তাঁরা কুরআনের যেসব ব্যাখ্যা ও তফসির প্রদান করেছেন, তাঁদের অনেক ছাত্রই সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাবে তাবেয়ীদের সময় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাকারে, কুরআনের তফসির লেখা হতে থাকে। তখন থেকে প্রত্যেক শতাব্দীতেই বিভিন্ন দেশে তফসির গ্রন্থ লেখা হয়ে আসছে। এর অধিকাংশই আরবি ভাষায় লিখিত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু তাফসির স্থানীয় ভাষায়ও লেখা হয়েছে।

বিগত তেরশ বছরব্যাপি লেখা তফসির সমূহের মধ্যে অনেকগুলোই বিশ্বব্যাপি খ্যাতি অর্জন করেছে। যেমন :

১. মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারির (মৃত্যু ৩১০ হিজরি) জামেউল বয়ান ফী তাফসিরিল কুরআন (বা তাফসিরে তাবারি)।

২. নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দির (মৃত্যু ৩৭৩ হিজরি) বাহরুল উলুম বা তাফসিরে সমরকন্দি।

৩. আহমদ ইবনে আলী আল জাস্সারের (মৃত্যু ৩৮০ হি.) আহকামুল কুরআন।

৪. আহমদ ছা'লাবি নিশাপুরির (মৃত্যু ৪২৭ হিজরি) আল কাশফু ওয়াল বয়ান।

৫. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ উন্দুলুসির (মৃত্যু ৫৪১ হিজরি) আহকামুল কুরআন বা তাফসিরে ইবনুল আরাবি।

৬. আবদুল হক উন্দুলুসির (মৃত্যু ৫৪৬ হি.) আল মুহাররিরুল আযীয ফী তাফসিরিল কিতাবিল আযিম বা তাফসিরে ইবনে আতিয়া।

৭. মুহাম্মদ ইবনে উমর আর রাযির (মৃত্যু ৬০৬ হিজরি) মাফাতিহুল গায়েব বা তাফসিরে রাযি।

৮. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কুরতবির (মৃত্যু ৬৭১ হিজরি) জামেউল আহকাম বা তাফসিরে কুরতবি।

৯. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বায়দাবির (মৃত্যু ৬৮৫ হিজরি) তাফসিরে বায়দাবি।

১০. ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসির দামেস্কির (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) তাফসিরুল কুরআনিল আযিম বা তাফসিরে ইবনে কাসির।

১১. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খাযেন-এর (মৃত্যু ৭৪১ হি.) তাফসিরে খাযেন।
১২. আবদুর রহমান ছা'লাবির (মৃত্যু ৮৭৬ হি.) তাফসিরে জাওয়াহের।
১৩. জালালুদ্দিন সুয়ূতির (মৃত্যু ৯১১ হি.) আদ্ দুররুল মানসূর ফিত্ তাফসির বিল মা'ছুর।
১৪. জালালুদ্দিন মাহেল্লি (মৃত্যু ৮৬৪ হি.) এবং জালালুদ্দিন সুয়ূতির যৌথ সম্পাদিত তাফসিরে জালালাইন।
১৫. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাবির (মৃত্যু ৯৫২ হি.) তাফসিরে আবিস্ সউদ।
১৬. শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ আলুসির (মৃত্যু ১২৭০ হি.) রূহুল মু'আনী।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করলেও তার আগের প্রায় দুই শতাব্দী ছিলো বিজাতীয়দের দ্বারা মুসলিম জাতিসমূহের পদানত থাকার যুগ। এ সময় বিভিন্ন মুসলিম দেশকে বৃটিশ ও ফরাসিরা এবং তাদের মানসিক গোলামরা বিভিন্ন মেয়াদে কবজা করে রাখে। এ সময় তারা মুসলিম দেশসমূহে তাদের নিজ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের ইসলাম বিরোধী কালচার মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে যখন মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করলো, তখন দেখা গেলো, প্রতিটি মুসলিম দেশেই আলো আঁধারের খেলা। তিন ধারার কালচার প্রবহমান। সেগুলো হলো :

১. পাশ্চাত্যের পুশ করা ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী কালচার,
২. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা মিশ্রিত জগাখিচুড়ি শঙ্কর কালচার এবং
৩. ইসলামি কালচার।

অবশ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধেই হিমালয়ান উপমহাদেশে সাইয়েদ মওদূদী রহ., মধ্যপ্রাচ্যে শহীদ হাসানুল বান্না রহ. এবং ইউরোপে সাইয়েদ জামালুদ্দিন নুরসি রহ. ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মজবুত ইসলামি আন্দোলন সৃষ্টি করে দেন, যা আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

৫. আধুনিক কালে লেখা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ তফসির

বিশ শতকে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হবার সাথে সাথে অনেকগুলো তফসিরও রচনা করা হয়। এর কয়েকটি খ্যাতনামা তফসির হলো :

১. আল মানার (আরবি) মুহাম্মদ রশিদ রেজা রাহেমাহুল্লাহ।
২. তাফসিরে কাসেমি(আরবি) জামালুদ্দিন কাসেমি রাহেমাহুল্লাহ।
৩. তাফসিরে মারাগি (আরবি) আহমদ মুস্তফা মারাগি রাহেমাহুল্লাহ।
৪. তাফহীমূল কুরআন (উর্দু) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহেমাহুল্লাহ।
৫. ফী যিলালিল কুরআন (আরবি) সাইয়েদ কুতুব রাহেমাহুল্লাহ।
৬. তাফসিরুল ওয়াহেদি (আরবি) মুহাম্মদ মাহমুদ হেযাযি রাহেমাহুল্লাহ।

৭. তাফসিরে জাওহারি (আরবি) তানতাবি জাওহারি।
৮. তাফসিরে ওয়াজেদি (আরবি) ফরিদ ওয়াজেদি রাহেমাহুল্লাহ।
৯. সফওয়াতুল বয়ান (আরবি) হাসনাইন মাখলুফ রাহেমাহুল্লাহ।
১০. ফতহুল বয়ান (আরবি) সিদ্দিক হাসান খান রাহেমাহুল্লাহ।
১১. বয়ানুল কুরআন (উর্দু) আশরাফ আলী থানবি রাহেমাহুল্লাহ।
১২. তাফসিরে ফারাহি (উর্দু) হামিদুদ্দিন ফারাহি রাহেমাহুল্লাহ।
১৩. মাআরিফুল কুরআন (উর্দু) মুফতি মুহাম্মদ শফী রাহেমাহুল্লাহ।
১৪. তাদ্দাববুরে কুরআন (উর্দু) আমিন আহসান ইসলাহী রাহেমাহুল্লাহ।
১৫. আল মিযান (আরবি) তাবাতাবায়ি (শিয়া) রাহেমাহুল্লাহ।
১৬. সফওয়াতুত তাফসির (আরবি) মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি রাহেমাহুল্লাহ।
১৭. তাফসিরে মাজেদি (উর্দু) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদি রাহেমাহুল্লাহ।
১৮. তরজমানুল কুরআন (উর্দু) আবুল কালাম আজাদ রাহেমাহুল্লাহ।
১৯. সাফওয়াতুত তাফসির (আরবি) মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি রাহেমাহুল্লাহ।
২০. তাফসিরে উসমানি (উর্দু) শাব্বির আহমদ উসমানি রাহেমাহুল্লাহ।

এছাড়াও আরো বহু তফসির রয়েছে, দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

৬. উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসির সংক্রান্ত মশহুর গ্রন্থাবলি

১. আল বুরহানু ফী উলূমিল কুরআন, বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যারকশি।
২. মাওয়াকেউল উলূম মিন মওয়াকিয়িন নুজুম,জালালুদ্দিন আবদুর রহমান।
৩. আত তাহবিরু ফী উলুমিত তাফসির, জালালুদ্দিন সুয়ূতি।
৪. আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, জালালুদ্দিন সুয়ূতি।
৫. মুকাদ্দমা উসূলুত তাফসির, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া।
৬. মানাহিলুল ইরফান, শাইখ আবদুল আযিম যারকানি।
৭. কাশফুয যুনন, মুস্তফা ইবনে আবদুল্লাহ হাজি খলিফা।
৮. মাজাযাতুল কুরআন, ইয্য ইবনে আবদুস সালাম।
৯. মুকাদ্দামাতুত তাফসির, আল্লামা রাগিব ইসফাহানি।
১০. আল ফাউযুল কবির, শাহ অলি উল্লাহ দেহলবি।
১১. ফাদায়েলুল কুরআন, হাফেয ইবনে কাসির।
১২. এজিফুল কুরআন, কাযি আবু বকর বাকেল্লানি।
১৩. ফনুনুল আফনান ফী উলুমিল কুরআন।
১৪. আল মুরশিদুল আযিয, আবু শামাহ।
১৫. আল বুরহানু ফি মুশকিলাতিল কুরআন, আবুল মুয়ালি।
১৬. আত তাফসিরু ওয়াল মুফাসসিরুন, ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবি।

১৭. আত তিবয়ানু ফী উলুমিল কুরআন, মুহাম্মদ আলী আস সাবূনি।
১৮. মুকাদ্দমা তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
১৯. মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন, মান্না' আল কাত্তান।
২০. দিরাসাতুন ফী উলুমিল কুরআন, ড. আমির আবদুল আযিয।
২১. উলূমুল কুরআন, মুহাম্মদ তকি উসমানি।
২২. Mile stone, Shaheed Sayyed Qutb.

৭. বাংলাদেশে আল কুরআনের চর্চা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও আল্লাহ্‌র কালাম আল কুরআনের ব্যাপক চর্চা তথা কুরআন গবেষণা, অনুবাদ, তফসির ও কুরআনের শিক্ষা প্রশিক্ষণ চলে আসছে। বাংলা ভাষায় কুরআনের চর্চা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। বাংলাদেশে কুরআনের চর্চা হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। যেমন :

১. আল কুরআনের পাঠ ও পঠন শিক্ষা দান।
২. তাজবিদের নিয়মানুসারে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা দান।
৩. হিফযুল কুরআন (স্মৃতিতে কুরআন ধারণ করা)।
৪. বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে কুরআনের অংশ বিশেষের অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দান।
৫. মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাফসিরুল কুরআন শিক্ষা দান।
৬. আল কুরআনের বংগানুবাদ করণ।
৭. বাংলা ভাষায় আল কুরআনের তফসির লিখন।
৮. আরবি ও উর্দু ভাষায় প্রণীত তফসির গ্রন্থাবলির বংগানুবাদ করণ।
৯. উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি রচনা।
১০. কুরআন মজিদ থেকে বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা।
১১. সাধারণ জনগণকে শুনানো ও শিক্ষা দানের জন্যে তাফসিরুল কুরআন মাহফিলের আয়োজন করা।
১২. পরিবারে, মসজিদে, অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরসুল কুরআন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
১৩. প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কুরআনের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা প্রচার।

এভাবে বাংলাদেশে আল কুরআনের শিক্ষা ও তাফসিরুল কুরআনের ব্যাপক চর্চা চলছে। কুরআনের কাজে উদ্যোগ নিচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। কুরআন চর্চা ও তাফসিরুল কুরআনের ইতিহাসে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের কথা একদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

❖❖❖

অনুচ্ছেদ : ১৬

কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত

১. কুরআন শিখা ও শিক্ষা দানের গুরুত্ব

কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এ কুরআনকে গোটা মানব জাতির মুক্তির পথ, কল্যাণের মহাসনদ এবং জীবন যাপনের সঠিক ব্যবস্থারূপে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং যেসব মানুষ আল্লাহর কালাম হিসেবে এ কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন, এ কুরআনকে জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করা, অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করা তাদের উচিত। রসূলুল্লাহ সা.-এর কয়েকটি হাদিসে এ বিষয়টির গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে:

১. কুরআনের ইলমের অধিকারীরা, আল্লাহর 'আইন' এবং একান্ত প্রিয়জন।[১]

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কুরআন অধ্যয়ন করে, তার নাম লেখা হয় সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ লোকদের সাথে। আর এরাই হলো সর্বোত্তম সঙ্গি।[২]

৩. যে ব্যক্তিই তার সন্তানদের কুরআন শিক্ষাদান করলো, কিয়াতমের দিন তাকে অবশ্যি জান্নাতের 'তাজ' পরিধান করানো হবে।[৩]

৪. যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করলো, অনুধাবন করলো, কুরআনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করলো, এ গ্রন্থে নির্দেশিত হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ এবং হারামকে হারাম জেনে বর্জন করলো, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার আহলের এমন দশজনের ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, যাদের প্রত্যেকের উপর (নেক আমলের কমতির কারণে) জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।[৪]

৫. যে ব্যক্তি কুরআনের বিশেষজ্ঞ হলো, সে পরকালে দুশ্চিন্তামুক্ত প্রফুল্ল সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে থাকবে।[৫]

৬. যে ব্যক্তি গোটা কুরআন আয়ত্ব করলো, তার দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত।[৬]

৭. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শিখলো এবং অপরকে শিক্ষাদান করলো।[৭]

---

১. নাসায়ী, ইবনে মাজাহ : আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত।
২. আহমদ : মুয়ায ইবনে আনাস রা. থেকে বর্ণিত।
৩. তাবারানি : আবু হুরাইয়া রা. থেকে বর্ণিত।
৪. তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ : আলী রা. থেকে বর্ণিত।
৫. বুখারি ও মুসলিম : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত।
৬. তাবারানি : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত।
৭. বুখারি ও মুসলিম : উসমান রা. থেকে বর্ণিত।

৮. যার পেটে কুরআনের কোনো ইলম নেই, সে যেনো একটা বিরাণ ঘর।[৮]

৯. প্রভাতে কুরআনের একটি আয়াতের ইলম অর্জন করো। একশ' রাকায়াত (নফল) নামাযের চাইতে এটা তোমার জন্যে উত্তম।[৯]

১০. যে ব্যক্তি কুরআনের ইলম শিখলো, অতপর তার অনুসরণ করলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে গোমরাহি থেকে দূরে রাখবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে অশুভ হিসাব থেকে নাজাত দান করবেন।[১০]

১১. কুরআনের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে, যেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না।[১১]

২. কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত মানে কুরআন পড়া, অধ্যয়ন করা, বুঝে পাঠ করা। রসূল সা. কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপক ফযিলতের কথা বর্ণনা করেছেন। এ প্রসংগে নিম্নে রসূলুল্লাহ সা.-এর কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

১. দুটি কাজে ঈর্ষা করা জায়েয। এক, ঐ ব্যক্তির কাজে যাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে দিন রাত তা তিলাওয়াত করে...।[১২]

২. যে ব্যক্তি কুরআনের একটি 'হরফ' পাঠ করলো সে জন্যে তার একটা নেকি হবে। আর প্রতিটি নেকিতে তার দশগুণ ধরা হবে।[১৩]

৩. তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথিদের জন্যে সুপারিশকারী হবে।[১৪]

৪. আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াত।[১৫]

৫. সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা তোমাদের ঘর আলোকিত করো।[১৬]

৬. বিশুদ্ধভাবে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর অনুগত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে।[১৭]

৭. আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে না, সে যদি গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনে, তবে তার জন্যে দ্বিগুণ নেকি লেখা হয়।

---

৮. তিরমিযি, হাকিম : ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।
৯. ইবনে মাজাহ : আবু যর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত।
১০. তাবারানি : ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত।
১১. দায়লমি : আলী রা. থেকে বর্ণিত।
১২. বুখারি ও মুসলিম।
১৩. তিরমিযি : ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত।
১৪. মুসলিম : আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত।
১৫. বায়হাকি : নু'মান ইবনে বশির রা. থেকে বর্ণিত।
১৬. বায়হাকি : আনাস রা. থেকে বর্ণিত।
১৭. বুখারি ও মুসলিম : আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত।

৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত : যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করলো, সে কুরআন বুঝেনি।[১৮]

৯. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে : তোমরা তিন দিনের কমে পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে শেষ করো না।[১৯]

১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল সা. আমাকে বলেছেন : এক মাসে কুরআন তিলাওয়াত করে খতম করবে। আমি বললাম আমি আরো অধিক পড়তে শক্তি পাই। তিনি বললেন, তাহলে দশ দিনে পড়বে। আমি বললাম, আমি আরো অধিক পড়তে শক্তি পাই। তিনি বললেন, তাহলে সাত দিনে পড়বে এবং এর চাইতে কম করো না।'[২০]

১১. সায়ীদ ইবনে মানযার বলেন, আমি বললাম : 'হে রসূলুল্লাহ! আমি তিন দিনে কুরআন খতম করি।' তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি যদি সক্ষম হও, তবে তাই করো।[২১]

পূর্ব যমানার আলেমগণ তিন দিনের কমে এবং এক মাসের অধিক সময়ে কুরআন খতম করা অপছন্দ করতেন। তাঁরা বলতেন, তিন দিনের চেয়ে কম সময়ে কুরআনুল করিমের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা আদৌ যথেষ্ট নয়। আর এক মাসের বেশি সময় নিয়ে খতম করার অর্থ হচ্ছে, কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আন্তরিক আগ্রহের অভাব।

'আসলে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা এক রকম হয় না। কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা ও সামর্থের উপর নির্ভর করে। তাই পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু কোনো একটি দিন যেনো বিনা তিলাওয়াতে অতিবাহিত না হয়, সেদিকে অবশ্যি গুরুত্ব দিতে হবে।'[২২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করলো না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করলো। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করলো অথচ মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করলো না, সে কুরআনের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করলো। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করলো এবং তা বুঝলো ও অনুধাবন করলো, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করলো না, সে কুরআনকে পরিত্যাগ করলো।[২৩]

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করা

---

১৮. আবু দাউদ, তিরমিযি : আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত।
১৯. আবু দাউদ।
২০. বুখারি ও মুসলিম।
২১. মুসনাদে আহমদ।
২২. ইমাম হাসান আল বান্না : তাযকিয়াতুন নফ্স।
২৩. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি : আত তিবয়ানু ফি উলূমিল কুরআন।

উচিত। মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ○

অর্থ: যখনই কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করবে, তখনই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নেবে।[২৪]

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে উলামায়ে উম্মত মনে করেন, কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করার সময়, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানের রাজীম পড়া ওয়াজিব।

কুরআন তিলাওয়াতের মাঝখানে কারো সালামের জবাব দিলে পুনরায় তিলাওয়াত করতে আউযুবিল্লাহ পড়া উত্তম।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না মুস্তাহাব। আর যার কান্না আসে না তার কান্নার ভান করা উচিত। রসূল সা. বলেছেন : 'এ কুরআন খুবই দুশ্চিন্তা ও ভীতি নিয়ে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমরা কুরআন পাঠকালে কেঁদো আর যাদের কান্না আসে না তারা কান্নার ভান করবে।'[২৫]

একই আয়াত বার বার পড়ার মধ্যে দোষ নেই। আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা. এক রাতে (নামাযে) একটি আয়াত বার বার পড়তে থাকেন। এমনি করে ভোর হয়ে যায়। আয়াতটি হচ্ছে :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ○

অর্থ: আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই দাস। আর যদি তাদের মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী।"[২৬]

৩. কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি

এ প্রসংগে এ কালের সেরা মুফাসসির আবু আ'লা মওদূদী রাহেমাহুল্লাহ বলেন :

"কুরআন একটি অসাধারণ গ্রন্থ। দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনের দিকে এগিয়ে আসে। এদের সবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোনো পরামর্শ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই বিপুল সংখ্যক অনুসন্ধানীর মধ্যে যারা কুরআনকে বুঝতে চান এবং এ কিতাবটি মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের ভূমিকা পালন করে এবং তাকে কিভাবে পথ দেখায় একথা জানতে চান, আমি কেবল তাদের ব্যাপারেই আগ্রহী। এ ধরনের লোকদের কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু পরামর্শ দেবো। আর সাধারণত মানুষ এ ব্যাপারে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারও সমাধান পেশ করার চেষ্টা করবো।

---

২৪. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নহল : আয়াত ৯৮।

২৫. বায়হাকি।

২৬. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়েদা : আয়াত ১১৮।

কোনো ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান রাখুন আর নাই রাখুন তিনি যদি এই কিতাবকে বুঝতে চান তাহলে সর্বপ্রথম তার নিজের মন-মস্তিষ্ককে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সব ধরনের চিন্তাধারা ও মতবাদ এবং অনুকূল-প্রতিকূল উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করতে হবে। এ কিতাবটি বুঝার ও হৃদয়ংগম করার নির্ভেজাল ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে এর অধ্যয়ন শরু করতে হবে। যারা মনের মধ্যে বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা লালন করে এ কিতাবটি পড়েন তারা এর বিভিন্ন ছত্রের মাঝখানে নিজেদের চিন্তাধারাই পড়ে যেতে থাকেন। আসল কুরআনের সামান্য বাতাসটুকুও তাদের গায়ে লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো বই পড়ার ব্যাপারেই এ ধরনের অধ্যয়ন রীতি ঠিক নয়। আর বিশেষ করে কুরআন তো এই ধরনের পাঠকদের জন্য তার অন্তর্নিহিত সত্য ও গভীর তাৎপর্যময় অর্থের দুয়ার কখনোই উন্মুক্ত করে না।

তারপর যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করতে চায় তার জন্য সম্ভবত একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি এর অর্থের গভীরে নামতে চান তার জন্য তো দুবার পড়ে নেয়াও যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্যি তাকে বার বার পড়তে হবে। প্রতি বার একটি নতুন ভংগিমায় পড়তে হবে। একজন ছাত্রের মতো পেন্সিল ও নোটবই সাথে নিয়ে বসতে হবে। জায়গা মতো প্রয়োজনীয় বিষয় নোট করতে হবে। এভাবে যারা কুরআন পড়তে প্রস্তুত হবেন, কুরআন যে চিন্তা ও কর্মধারা উপস্থাপন করতে চায় তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাটা যেন তাদের সামনে ভেসে উঠে কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যেই তাদের অন্ততপক্ষে দুবার এ কিতাবটি পড়তে হবে। এ প্রাথমিক অধ্যয়নের সময় তাদের কুরআনের সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের দেখতে হবে, এ কিতবাটি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তা পেশ করে এবং সে চিন্তাধারার উপর কিভাবে জীবন ব্যবস্থার অট্টালিকার ভিত গড়ে তোলে? এ সময়কালে কোনো জায়গায় তার মনে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে বা কোনো খট্‌কা লাগে, তাহলে তখনি সেখানে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বরং সেটি নোট করে নিতে হবে এবং ধৈর্য সহকারে সামনের দিকে অধ্যয়ন জারি রাখতে হবে। সামনের দিকে কোথাও না কোথাও তিনি এর জবাব পেয়ে যাবেন, এরি সম্ভাবনা বেশি। জবাব পেয়ে গেলে নিজের প্রশ্নের পাশাপাশি সেটি নোট করে নেবেন। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর নিজের কোনো প্রশ্নের জবাব না পেলে ধৈর্য সহকারে দ্বিতীয় বার অধ্যয়ন করতে হবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দ্বিতীয়বার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার পর কালেভদ্রে কোনো প্রশ্নের জবাব অনুদঘাটিত থেকে গেছে।

এভাবে কুরআন সম্পর্কে একটি ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লাভ করার পর এর বিস্তারিত অধ্যয়ন শুরু করতে হবে। এ প্রসংগে পাঠককে অবশ্যি কুরআনের শিক্ষার এক

একটি দিক অনুধাবন করার পর নোট করে নিতে হবে। যেমন মানুষের জন্যে কোন্ ধরনের আদর্শকে কুরআন পছন্দনীয় গণ্য করেছে অথবা কোন্ ধরনের আদর্শ তার কাছে ঘৃণার্হ ও প্রত্যাখ্যাত- একথা তাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়টিকে ভালোভাবে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নেয়ার জন্য তাকে নিজের নোট বইতে একদিকে লিখতে হবে 'পছন্দনীয় মানুষ' এবং অন্যদিকে লিখতে হবে 'অপছন্দনীয় মানুষ' এবং উভয়ের নিচে তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী লিখে যেতে হবে। অথবা যেমন, তাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে সে মানবতার জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক গণ্য করে- এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আগের পদ্ধতিই তাকে অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ নোট বইতে 'কল্যাণের জন্য অপরিহার্য বিষয়সমূহ' এবং 'ক্ষতির জন্য অনিবার্য বিষয়সমূহ' এ শিরোনাম দুটি পাশাপাশি লিখতে হবে। অত:পর প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয় দুটি সম্পর্কে নোট করে যেতে হবে। এ পদ্ধতিতে আকিদা বিশ্বাস, চরিত্র ও নৈতিকতা, অধিকার, কর্তব্য, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, দলীয় সংগঠন শৃংখলা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে কুরআনের বিধান নোট করতে হবে এবং এর প্রতিটি বিভাগের সামগ্রিক চেহারা কি দাঁড়ায়, তারপর এসবগুলোকে এক সাথে মিলালে কোন্ ধরনের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

আবার জীবনের বিশেষ কোনো সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে হলে এবং সে ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভংগি জানতে হলে সে সমস্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। মানুষ আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে কি কি চিন্তা করেছে এবং তাকে কিভাবে অনুধাবন করেছে? কোন্ কোন্ বিষয় এখনো সেখানে সমাধানের অপেক্ষায় আছে? মানুষের চিন্তার গাড়ি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে? এ সমাধানযোগ্য সমস্যা ও বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগী জানার এটিই সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এভাবে কোনো বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে এমনসব আয়াতের মধ্যে নিজের প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যাবে যেগুলো ইতিপূর্বে কয়েকবার পড়া হয়ে থাকলেও এই তত্ত্ব সেখানে লুকিয়ে আছে একথা ঘূর্ণাক্ষরেও মনে জাগেনি।

কিন্তু কুরআন বুঝার এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে কাজ করার বিধান ও নির্দেশ নিয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে, কার্যত এবং বাস্তবে তা না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি

কুরআনের প্রাণসত্তার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হতে পারে না। এটা নিছক কোনো মতবাদ ও চিন্তাধারার বই নয়। কাজেই আরাম কেদারায় বসে বসে এ বইটি পড়লে এর সবকথা বুঝতে পারা যাবার কথা নয়। দুনিয়ায় প্রচলিত ধর্ম চিন্তা অনুযায়ী এটি নিছক একটি ধর্মগ্রন্থও নয়। মাদ্রাসায় ও খানকায় বসে এর সমস্ত রহস্য ও গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। মূলত এটি একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। সে এসেই এক নীরব প্রকৃতির সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্জন ও নি:সঙ্গ জীবন ক্ষেত্র থেকে বের করে এনে আল্লাহ বিরোধী দুনিয়ার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার কণ্ঠে যুগিয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি। যুগের কুফরি, ফাসেকি ও ভ্রষ্টতার পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে তাকে প্রচণ্ড সংঘাতে লিপ্ত করেছে। সচ্চরিত্র সম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে প্রতিটি গৃহাভ্যন্তর থেকে খুঁজে বের করে এনে সত্যের আহবায়কের পতাকাতলে সমবেত করেছে। দেশের প্রতিটি এলাকার ফিতনাবাজ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে সত্যানুসারীদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তির আহবানের মাধ্যমে নিজের কাজ শুরু করে আল্লাহ নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশ বছর ধরে এ কিতাবটি এ বিরাট ও মহান ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছে। হক ও বাতিলের এ সুদীর্ঘ ও প্রাণান্তকর সংঘর্ষকালে প্রতিটি মনযিল ও প্রতিটি পর্যায়েই সে একদিকে ভাঙ্গার পদ্ধতি শিখিয়েছে এবং অন্যদিকে পেশ করেছে গড়ার নকশা।

এখন বলুন, যদি আপনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত এবং দীন ও কুফরির দ্বন্দ্ব সংগ্রামে অংশগ্রহণই না করেন, যদি এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মনযিল অতিক্রম করার সুযোগই আপনার ভাগ্যে না ঘটে, তাহলে নিছক কুরআনের শব্দগুলো পাঠ করলে তার সমুদয় তত্ত্ব আপনার সামনে কেমন করে উদঘাটিত হয়ে যাবে? কুরআনকে পুরোপুরি অনুধাবন করা তখনই সম্ভব হবে যখন আপনি নিজেই কুরআনের দাওয়াত নিয়ে উঠবেন, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজ শুরু করবেন এবং এ কিতাব যেভাবে পথ দেখায় সেভাবেই পদক্ষেপ নিতে থাকবেন। একমাত্র তখনই কুরআন নাযিলের সময়কালীন অভিজ্ঞতাগুলো আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। মক্কা, হাবশা ও তায়েফের মনযিলও আপনি দেখবেন। বদর এবং ওহুদ থেকে শুরু করে হুনাইন ও তাবুকের মনযিলও আপনার সামনে এসে যাবে। আপনি আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মুখোমুখি হবেন। মুনাফিক ও ইহুদিদের সাক্ষাতও পাবেন। ইসলামের প্রথম যুগের উৎসর্গীতপ্রাণ মুমিন থেকে নিয়ে দুর্বল হৃদয়ের মুমিন পর্যন্ত সবার সাথেই আপনার দেখা হবে। এটা এক ধরনের 'সাধনা'। একে আমি বলি 'কুরবানি'। এ সাধনার পথে ফুটে ওঠে এক অভিনব দৃশ্য। এর যতগুলো মনযিল অতিক্রম করতে থাকবেন তার প্রতিটি মনযিলে কুরআনের কিছু আয়াত ও সূরা আপনা আপনি আপনার সামনে এসে

যাবে। তারা আপনকে বলতে থাকবে- এ মনযিলে তারা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেখানের জন্যে এ বিধানগুলো এনেছিল। সে সময়গুলো অভিধান, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রীয় কিছু তত্ত্ব সাধকের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যেতে পারে, কিন্তু কুরআন নিজের প্রাণসত্তাকে এ ধরনের লোকদের সামনে উন্মুক্ত করতে কার্পণ্য করবে, এমনটি কখনো হতে পারে না।

আবার এ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের বিধানসমূহ, তার নৈতিক শিক্ষাবলী, তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে তার প্রণীত নীতি নিয়ম ও আইনসমূহ বুঝতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে বাস্তবে নিজের জীবনে এগুলো কার্যকর করে দেখবে। যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের অনুসৃতি নেই সে তাকে বুঝতে পারবে না। আর যে জাতির সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান কুরআন বিধৃত পথ ও কর্মনীতির বিপরীত দিকে চলে সে জাতির পক্ষেও এর সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নয়।"[২৭]

৪. তাজবিদ

আবিধানিক অর্থে কোনো কাজ সর্বোত্তম পন্থায় সম্পন্ন করার নাম তাজবিদ।

পারিভাষিক অর্থে তাজবিদ ঐ ইল্‌মকে বলা হয়, যার মাধ্যমে তিলাওয়াতে কুরআনে হরফ ও লফ্‌যের উচ্চারণ সর্বোত্তম পন্থা ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয় এবং উচ্চারণে কোনো ত্রুটি না থাকে।

মুস্তাফা ইবনে আবদুল্লাহ হাজি খলিফা তাঁর 'কুশফুয যুনুন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাজবিদ হচ্ছে ঐ ইল্‌ম যার দ্বারা হরফসমূহের মাখরাজ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কুরআন মজিদের সর্বোত্তম ও সুন্দরতম তিলাওয়াতের পন্থা জানা যায় এবং যার মাধ্যমে অস্‌ল, ওয়াক্‌ফ, মদ্দ, কসর, ইদগাম, ইযহার, ইখফা, ইমালা, তাফখিম, তারকিক্‌ তাশদিদ তাখফিফ, ক্বলব এবং তাসহিলের লেহায অনুযায়ী হরফসমূহ উচ্চারণের হক আদায় করে তিলাওয়াতে কুরআনের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ সৃষ্টির কায়দা জানা যায়।'[২৮]

মূলত, তিলাওয়াতে কালামে পাককে নির্ভুল এবং আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করাই ইলমে তাজবিদের উদ্দেশ্য।

কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য তাজবিদ শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি। কারণ সঠিক ধ্বনিতে কুরআন উচ্চারণ করা না হলে আল্লাহর কালামের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে কালামুল্লাহর অর্থের বিপর্যয় এবং বৈপরিত্য পর্যন্ত দেখা দেয়ার আশংকা থাকে। মোটকথা, ইলমে তাজবিদের মাধ্যমেই আল্লাহর কালামের সৌন্দর্য ও শ্রুতি মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। তাই কুরআন তিলাওয়াতকারীকে তাজবিদের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা কর্তব্য।

---

২৭. আবুল আ'লা মওদদী : তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা।

২৮. মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজি খলিফা : কাশফুয যুনূন।

১৭. সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আল কুরআন
২. তফসিরে তাবারি : মুহাম্মদ ইবনে জরির আত তাবারি
৩. তফসিরে ইবনে আতিয়া : আবদুল হক উন্দুলুসি
৪. তফসিরে ইবনে কাসির : ইসমাঈল ইবনে উমর দামেস্কি
৫. ফী যিলালিল কুরআন : শহীদ সাইয়েদ কুতুব
৬. তাফহীমুল কুরআন : সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
৭. মা'আরিফুল কুরআন : মুহাম্মদ শফি
৮. তাদাববুরে কুরআন : আমীন আহসান ইসলাহি
৯. সফওয়াতুত তাফাসির : মুহাম্মদ আলী আস সাবুনি
১০. ফাতহুল বয়ান : সিদ্দিক হাসান খান
১১. আল কাশ্‌শাফ : যমখশরি
১২. যাদুল মা'আদ : ইবনুল কায়্যিম
১৩. আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন : জালালুদ্দীন সূয়ূতি
১৪. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন : বদরুদ্দীন মুহাম্মদ যারকশি
১৫. কাশফুয যুনূন : মুস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজি খলিফা
১৬. মানাহিলুল ইরফান : আবদুল আযিম যারকানি
১৭. আল ফাউযুল কবির : শাহ অলি উল্লাহ দেহলবি
১৮. আত তাফসিরু ওয়াল মুফাসসিরুন : ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবি
১৯. মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন : মান্না আল কাত্তান
২০. আত তিবয়ানু ফী উলূমিল কুরআন : মুহাম্মদ আলি আস সাবূনি
২১. আল মুফরাদাত ফী গারায়িবিল কুরআন : রাগিব ইসফাহানি
২২. আস সাকাফাতুল ইসলামিয়া : রাগিব আত তাবাখ
২৩. সীরাতে সরওয়ারে আলম : আবুল আ'লা মওদূদী
২৪. উলূমুল কুরআন : মুহাম্মদ তকি উসমানি
২৫. দিরাসাতুন ফী উলূমিল কুরআন : ড. আমির আবদুল আযীয
২৬. মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন : ড. সুবহি সালেহ
২৭. গারিবুল কুরআন ওয়া তাফসিরুহু : আবদুল্লাহ আল মুবারক
২৮. রাসায়েল ও মাসায়েল : আবুল আ'লা মওদূদী
২৯. তাযকিয়াতুন নাফস : হাসান আল বান্না
৩০. মা'আলিমুন ফীত্ তরিক : সাইয়েদ কুতুব
৩১. সহীহ আল বুখারি
৩২. সহীহ মুসলিম
৩৩. জামে তিরমিযি
৩৪. কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে : আবদুস শহীদ নাসিম
৩৫. আল মুজামু লিআলফাযিল কুরআনি কারিম : মুহম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচিতি ও লিখিত কয়েকটি বই

লেখক পরিচিতি

আবদুস শহীদ নাসিম এর জন্ম ১৯৪৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জে। তিনি ১৯৭২ সালে ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেন। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে যথাক্রমে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। অবশ্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল পড়া লেখা করেছেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। আবদুস শহীদ নাসিম একজন প্রতিষ্ঠিত সৃজনশীল লেখক। তাঁর মৌলিক রচনা ৪০ -এর অধিক। তাঁর অনূদিত গ্রন্থও ৪০ -এর অধিক। শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও আবদুস শহীদ নাসিম খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি এযাবত অনেক গুলো সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন প্রায় ২ ডজন গ্রন্থ। এযাবত তাঁর লিখিত ও অনূদিত ৮০-এর অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এখনো লিখে যাচ্ছেন।

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআন আত্ তাফসীর
আল কুরআনের দু'আ
আসুন আমরা মুসলিম হই
কুরআন ও পরিবার
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম ও ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ ১ম ও ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এক্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ্

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩১১২৯২